সবুজ তোরণ ছাড়িয়ে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সুপ্রীম পাবলিশার্স
১০/এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬'

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী শতদল জানা
সুপ্রীম পাবলিশার্স
১০/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : গণেশ বসু

মুদ্রাকর :
গোপাল চন্দ্র পাল
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ, রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ডাঃ সুব্রত সেন

ও

রিনি সেনকে

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

হীরামঞ্জিল

দিনকাল

আরো একজন

বাসক শয়ন

পুরুষোত্তম

মেঘের মিনার

দুটি প্রতীক্ষার কারণে

আনন্দরূপ

খনির নতুন মণি

অপরিচিতের মুখ

রূপের হাটে বিকিকিনি

নিষিদ্ধ বই

ফয়সলা

সিক্রেটিকেটিকে

পিণ্ডিদার গপ্পো

জিন্দার বটে পিণ্ডিদা

ঘড়ি দেখিনি। বেলা তখন এগারোটা হবে বোধহয়। কারণ আধ-ঘণ্টা আগে বিলি তার ছ'বছরের কচি শরীরটাকে কোনরকমে টানতে টানতে বারান্দা পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি ধরে নেমে গেল লক্ষ্য করেছি। বিলি আজ স্কুলে যাবে কি যাবে না, যাওয়া সম্ভব কি সম্ভব না—এই চিন্তাটাই আমার মাথায় ঘুর-পাক খাচ্ছিল। আমার ভিতরের যে-মন আজ ওকে এই নির্দয় শাসন করেছে, বিলির স্কুল কামাই করাটা সে এখনো বরদাস্ত করতে রাজি নয়। না গেলে ঘাড় ধরে পাঠানোর কথাও ভেবেছে। কিন্তু ছোট্ট শরীরটার সমস্ত যন্ত্রণা জুতো মোজা হাফপ্যান্ট হাফশার্ট-এ ঢেকে বিবর্ণ মুখে ওকে ও-ভাবে চলে যেতে দেখে আর একটা মন ছুটে যেতে চেয়েছে—ছ'হাতে ওকে বুকে আগলে ঘরে টেনে নিয়ে আসতে চেয়েছে। কিন্তু তা পারেনি। এতবড় শাসনের পর এই মায়ের মনকে প্রশ্রয় দিতে পারিনি।

বিলি কাঠের রেলিং ধরে পায়ে পায়ে নেমে গেছে। আমি ঘরে বসে দেখেছি।

এগারোটায় বিলির স্কুল। ঘড়ি ধরে ঠিক সাড়ে দশটায় বেরোয়। অন্যদিন জামা হাফপ্যান্ট জুতো মোজা পরে কাঁধে স্কুলের বইখাতার ব্যাগ ঝুলিয়ে আমার শোবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাইরের জুতো নিয়ে শোবার ঘরে ঢোকা আমি একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না সেটা ও ছেড়ে ওর বাবাও খুব ভালো জানে। তার ভবিষ্যদ্বাণী, আরো কিছু বয়েস হলে আমাকে শুচিবাই রোগে ধরবেই। অন্যদিন সকালের প্রথম আড়াই তিন ঘণ্টা আমার বিলিকে নিয়েই কাটে। প্রথম কাজ ওকে টেনে হিঁচড়ে বিছানা থেকে নামিয়ে কাঠের মেঝেতে দাঁড় করিয়ে গোটা কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে চোখের ঘুম তাড়ানো। সেটা সকাল ছ'টার মধ্যে। তখন শুধু বিরক্তি নয়, এক-একদিন ওই সাত-সকালে রাগই হয়ে যায়। বাপের মতোই ঘুমকাতুরে।

ওইটুকু ছেলে এক ডাকে কেন নিজের উৎসাহে লাফিয়ে উঠবে না, প্রথম সকালে শালজুড়ির আকাশ পাহাড় জঙ্গলের যে চোখ-মন ভরে দেওয়া রূপ, তা কেন দেখতে শিখবে না!

আমারও গোঁ। ওকে দেখতে হবে, ভালবাসতে হবে। দেখাটা নেশার মতো হলে ওরও ভেতরটা ওমনি সুন্দর আর পরিষ্কার হবে। রিলিকে টেনে বাইরে নিয়ে আসি। আকাশ যেদিন তকতকে পরিষ্কার থাকে, সোনা-মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালি আভা চারদিকে ঠিকরে পড়ে, আমার বুকের তলায় এক অদ্ভুত আনন্দের কাঁপুনি শুরু হয়। মনে হয়, ভিতরের জানা-অজানা যত জঞ্জাল খানিকক্ষণের জন্যে হলেও ধুয়ে মুছে গেল। ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে কোনদিন চুপচাপ দেখি। মুখে কথা সরে না। কোনদিন বা বলি, খুব তো ঘুমোচ্ছিলি, এখন কেমন লাগছে?

ও ঘুম-চোখ রগড়াতে রগড়াতে আমার দিকে না চেয়ে এক কথায় জবাব সারে, ভালো।

এক-একদিন আমিও নাছোড়। এই জবাব শুনে সেদিন প্রায় রাগ করেই বলেছিলাম, স্কুলের ক্লাস পরীক্ষায় কোনো টিচার যদি তোকে জিগ্যেস করে, সকালের পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে কেমন, তুই শুধু বলবি ভালো—একখানা গোল্লা খাবি না তা হলে?

ওর সাদা সাপটা জবাব, স্কুলের পরীক্ষায় টিচার অমন বাজে প্রশ্ন করতে যাবে কেন?

—বাজে প্রশ্ন!

—না তো কি! সকালের এই রূপ মায়ের কত ভালো লাগে ওই পাজি খুব ভালো করেই জানে। ঘুম-তাড়ানোর রাগে তাই আমাকে জব্দ করতে পারার আনন্দ। বলেছিল, কাঞ্চনজঙ্ঘা সোনার পাহাড় নয়, ক্যাটকেটে সাদা বরফে ঢাকা—সকালের লাল সূর্যের আলোয় খানিকক্ষণ ও-রকম দেখায় এ কে না জানে! টিচার ছেড়ে কোনদিন যারা লেখাপড়া করেনি তারাও জানে!

আমার মনে হয়েছিল সকালটাই মাটি।

...কাছে দূরের অন্য পাহাড়গুলোকে দেখিয়ে যদি বলি, এ-সময়ে এগুলোকে দেখতে কেমন লাগছে বল্ তো ?

ওই পাজি জবাব দেবে, কেমন আবার লাগবে, পাতলা কুয়াশার চাদর জড়িয়ে আকাশের গায়ে ঠেস দিয়ে দিব্বি ঘুমোচ্ছে মনে হয়—রোদ চড়ার আগে পর্যন্ত ওদের তো আর তোমার মতো কেউ ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙায় না !

কি কথায় কুয়াশার চাদরের উপমাটা একদিন আমিই দিয়েছিলাম। সেটা মনে রেখে আর সময় বুঝে পরে এই জবাব দিয়ে ও এত সকালে ঘুম ভাঙানোর ক্ষোভ মেটায়।

এই সকালে শুধু পাহাড় নয়, শালজুড়ির জঙ্গলের চেহারাও অন্য রকম। বাড়ি থেকে নেমে মিনিট পনের হাঁটলে ওই জঙ্গল এলাকায় পা ফেলা যায়। কিন্তু শালজুড়ি রিজার্ভ ফরেস্টের রূপ দেখতে হলে এমনি খানিকটা দূর থেকেই দেখতে হয়। অত কাছে গেলে বা ভিতরে ঢুকলে আর রহস্য কিছু থাকে না। দোতলা সমান উঁচু এই কাঠের মেঝের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বা চেয়ার টেনে বসে ওই সবুজের দিকে দু'চোখের দৃষ্টি কাছ থেকে দূরে, দূর থেকে আরো দূরে ছড়িয়ে দিতে থাকলে মনে হবে ওই সবুজের শেষ আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। এখান থেকে ছোট গাছগুলোকে অবশ্য আলাদা করে দেখা বা চেনা যায় না। শালজুড়ি ফরেস্টের আসল বাহার শাল সেগুন, অর্জুন, জারুল, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস আর শিশু গাছ। এদের সকলের মাথা পেল্লায় উঁচু। ওগুলোর তপস্বী-শোভা সকালে যেমন, আর কখনো তেমন নয়।

আমার ছোট্ট একটা সখের বায়নাকুলার আছে। ছোট হলেও জোরালো লেন্স। চোখে লাগালে দু'শ গজ দূরের জিনিস দু'হাতের মধ্যে। বিলিতি জিনিস। গ্র্যাণ্ড জেরির এক বন্ধু তাকে উপহার দিয়েছিল। আমার এই বুড়োর আসল নাম জেরি গ্র্যাণ্ড। শ্রদ্ধা ভালবাসার এমন মানুষ শালজুড়িতে আর দ্বিতীয় নেই বোধহয়। সেই থেকে জেরি গ্র্যাণ্ড সকলের মুখে মুখে গ্র্যাণ্ড জেরি হয়ে গেছে

মনেও পড়ে না। আমার জন্মের আগে থেকেই বোধহয়। আমার আদরের ডাক গ্র্যাণ্ডি। ওই বায়নাকুলার দিয়ে বনজঙ্গল, পাহাড় আকাশ দেখার লোভে আধ-মাইল রাস্তা ভেঙে রোজ একবার করে অন্তত গ্র্যাণ্ডির ডেরায় যেতামই। ছুটির দিনে আরো বেশি। ওটা হাতে পেলে এক দেড় ঘণ্টা কেটে যেত। ফিরে এসে মায়ের বকুনি খেতাম। বছর তেরো বয়েস তখন আমার। বাড়ন্ত গড়ন। এই মেয়ে একটা বায়নাকুলার হাতে পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রকৃতির রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে মা এটা বিশ্বাস করেই বা কি করে। জেরি বললেও বিশ্বাস করত না। ভাবত কোনো বাজে ছেলের সঙ্গে মিশে দেরি করে ফিরে বাড়ি এসে মিথ্যে কথা বলছি। ওই বায়নাকুলার হাতে পেলে এক-একদিন এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে, বাড়ির কথা মনেও পড়ত না। ফলে খোঁজাখুঁজি পড়ে যেত। তারপর মায়ের হাতে মার পর্যন্ত খেতে হত।

…সেবারেই জন্মদিনে সুন্দর কাগজে মোড়া আর গোলাপি ফিতে বাঁধা একটা ছোট্ট প্যাকেট হাতে গ্র্যাণ্ডি বাড়িতে হাজির। আমার জন্মদিনের তারিখটা তার কখনো ভুল হয় না। বরাবরই কিছু না কিছু উপহার নিয়ে সকলের আগে হাজির হয়। প্যাকেটের সঙ্গে রিবনে বাঁধা হাতে আঁকা এক মেয়ের রঙিন ছবি, দু'হাতে চোখে বায়নাকুলার লাগিয়ে নিবিষ্ট মনে দূরের জঙ্গল দেখছে। বায়নাকুলারে দু'চোখ আর দু'হাতে দু'গালের খানিকটা করে ঢাকা পড়া সত্ত্বেও হাতে আঁকা ছবির মেয়েটা যে আমি তা বুঝতে এক সেকেণ্ডও লাগেনি। আজও মনে আছে আমার বুকের তলায় সে কি উত্তেজনা। তার ফলে প্যাকেটটা হাত থেকে পড়েও যেতে পারত। খুলে দেখি যা ভেবেছি তাই। সেই বায়নাকুলার।

দেখেও আর হাতে পেয়েও বিশ্বাস হচ্ছিল না।—গ্র্যাণ্ডি, তুমি এটা আমাকে একেবারে দিয়ে দিলে?

গ্র্যাণ্ডি হেঁড়ে গলা করে জবাব দিয়েছিল, তোর বরের জিনিস, তুই ছাড়া আর কে পাবে?

আমার বয়েস যদি তখন তেরো হয়, গ্র্যাণ্ডির কম করে তিপ্পান্ন হবে। কিন্তু ছ'সাত বছর বয়সে জোর গলায় ঘোষণা করতাম বড় হয়ে গ্র্যাণ্ডিকে বিয়ে করব। মায়ের অনেক বন্ধু ছিল। তার মধ্যে তার ছেলে বন্ধুদের কথাবার্তা বোঝা যেত। তারা আমার গাল টিপে আদর করত, বলত লাভলি গার্ল। কিন্তু মায়ের মেয়ে বন্ধুরা হাসা-হাসি করে কি-যে রসিকতা করত কিচ্ছু বুঝতাম না। বলত, আরো কিছু বড় হলে মেয়েকে চোখে আগলে রেখোপু। ব, যে জায়গা, উঠতি বয়সের ছ'পেয়ে নেকড়ের দঙ্গল ছেঁকে ধরতে চাইবে।

মায়ের সেই বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আমাকেই জিগ্যেস করত, কি রকম বর পছন্দ রে তোর?

আমি বলতাম, আমার বর ঠিক হয়েই আছে, আমি গ্র্যাণ্ডিকে বিয়ে করব।

...তেরো বছর বয়সে ভিতরে ভিতরে আমি অনেক পেকে গেছলাম, তখন আর অমন বোকার মতো কথা বলতাম না। কিন্তু ওই বায়নাকুলার উপহার পেয়ে খুশিতে এমন আত্মহারা আমি যে ছ'হাতে গ্র্যাণ্ডির গলা জড়িয়ে ধরে তার কাঁচা-পাকা দাড়ি-ভরা ছ'গালে তিনটে চারটে করে চুমু খেয়ে বসেছিলাম।

গ্র্যাণ্ডির যেন বিড়ম্বনার একশেষ।—ছাড়্, ছাড়্, শ্বশুর শাশুড়ীর সামনেই এ কি করিস!

শ্বশুর শাশুড়ী বলতে আমার বাবা-মা।

মানুষটা গ্র্যাণ্ড জেরি বলেই বাবা-মাও হাসছিল। মা বলেছিল, এটার আয়ু তো এবারে শেষ দেখছি—আপনি এত ভালো আর দামী জিনিসটা ছেলেমানুষের হাতে দিয়ে ফেললেন?

গ্র্যাণ্ডি বড় মজার কথা বলেছিল। হাসে টাসে না খুব, কথাগুলো মজাদার। মায়ের কথার জবাব না দিয়ে আমাকে বলেছিল, বায়না-কুলারটা তোর মায়ের হাতে দিয়ে তুই বাড়ি থেকে নেমে ওই গেট্টার কাছে গিয়ে দাঁড়া—তোর মা দেখুক আসলে তুই কত বড় ছেলে-মানুষ।

আমার ওপর রাগ করে মা বরং অনেক দিন আছড়ে ভেঙে ওটার আয়ু শেষ করতে চেয়েছে। সেই থেকে উনিশ বছর ধরে ওই বায়না-কুলার আমার কাছে যত্নে আছে। বিলিকে সকালে বিছানা থেকে টেনে এনে যখন এই বারান্দায় এসে দাঁড়াই, ওটাও প্রায় সময় আমার হাতে থাকে। ওটার ভেতর দিয়ে দূরের পাহাড় কাঞ্চনজঙ্ঘা শালজুড়ির জঙ্গল, আকাশের পাখি সব খুব কাছের জিনিস আর আপনার জিনিস মনে হয়। সব থেকে ভালো লাগে জঙ্গলের বিশাল গাছগুলোকে দেখতে। প্রথম ভোরের আলো-আঁধারিতে ওগুলোর শিশির-স্নান শুরু হয়। আর একটু আলো জাগলে মনে হয় বড় বড় পাতার ওপর অসংখ্য মুক্ত ছড়ানো। বায়নাকুলার চোখে লাগালে টুপটুপ করে পাতা থেকে ওগুলো ঝরতেও দেখা যায়।

বিলির বায়নাকুলার নিয়ে কোনো দৃশ্য কাছে বা বড় করে দেখার আগ্রহ তেমন নেই। হতে পাবে ছ'মাস আগেও ভেঙে ফেলার ভয়ে ওটা আমি ওর হাতে দিতাম না বলে কৌতূহলে ভাঁটা পড়েছে। নিজের হাতে রেখে ওর চোখে লাগিয়ে মাথার প্যাঁচ ঘুরিয়ে জিগ্যেস করতাম, ছোট দেখছে কি বড় দেখছে, ঝাপসা দেখছে কি পরিষ্কার দেখছে। এখন ও নিজেই সেটা পারে। আবহাওয়া অনুযায়ী জঙ্গলের গাছগুলো থেকে শিশির ঝরা যখন সত্যি মুক্তো ঝরার মতো দেখাতো, ওকে বলতাম, গ্যাখ্ গ্যাখ্ কি সুন্দর!

...কিন্তু একদিন ও যা বলল, তারপর থেকে বায়নাকুলার আর ওর হাতে দিই নি। বলল, ওই বাইরে থেকে আর দূর থেকেই শালজুড়ি জঙ্গল খুব সুন্দর, ভেতরে গিয়ে ঢোকো, হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবার জন্য বসে আছে সব।

ওর কথা শুনে আমি ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে-ছিলাম। খানিকক্ষণের জন্য স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত ওঠা-নামা করছিল। হাড়ে হাড়ে নিঃশব্দ ঠোকা-ঠুকি শুরু হয়ে গেছল। সাড় ফিরতে বিলিকে ছেড়ে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছলাম।

…ওর কথার সাদা অর্থ ধরলে দূরের সুন্দর আর বাইরের সুন্দরের মোহ আমার অন্তত থাকা উচিত নয়। নেইও। এই বত্রিশ বছরের জীবনে দূরের সুন্দর কাছে এসেছে, আমাকে কাছে টেনেছে। বাইরের সুন্দর আমার অন্দর মহলে আলো ফেলেছে, জায়গা জুড়েছে।… তারপর। তারপর সুন্দরের মুখোসের তলায় কদর্য কুৎসিত বীভৎস লোভের মুখ দেখেছি। শালজুড়ির জঙ্গলের গভীরে অনেক হিংস্র জানোয়ার আছে। সাদা কথায় বিলি সেটাই আমাকে বলতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের খিদের ভাষায় কোনো ছলনা আছে? কপটতা আছে? তাদের কামের ভাষায় কোনো কারচুপি আছে? জঠরের জ্বালা আর জৈবিক যন্ত্রণা ঢেকে রাখার মতো তারা কোনো নামাবলীর সন্ধান জানে—যার নাম প্রেম ভালবাসা মহত্ত্ব উদারতা?

মাথাটা আমার গ্র্যাণ্ড জেরিই খেয়ে দিয়েছে বোধহয়। বার বার আমার সুন্দরের জগৎ অন্ধকারে ডুবে গেছে। বার বার আমার সরল বিশ্বাসের জগৎ খান-খান হয়ে ভেঙে গেছে। কিন্তু অদৃশ্য থেকে কে আবার সেই অন্ধকার থেকে আমাকে টেনে তুলেছে! ভাঙা বিশ্বাস-গুলো কে আবার অদৃশ্য বুনটে জুড়ে-জুড়ে দিয়ে গেছে। …ওই গ্র্যাণ্ডি ছাড়া আর কে? তার সঙ্গে আরো কারো যোগসাজস আছে বোধহয়। সে আমারই ভিতরের অন্য কোনো সত্তা। যাকে আমি কখনো ধরতে ছুঁতে পারি না, হঠাৎ-হঠাৎ তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। সে আমার মতো অর্থাৎ এই রক্ত-মাংসের শীলা ভেটন মেয়েটার মতো অন্ধ নয়। বোকার মতো সরল নয়। যখন অন্ধকারে তলিয়ে যাই, নিঃশ্বাস নেবার মতো বাতাসটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না, তখন আমারই ভিতরের সেই একজন সজাগ হয়, কানে মন্ত্রণা দেয় তুমি ভুল করেছ, ভুলের মাশুল গুনছ শুধু। তার বেশি কিছু না। আলো-বাতাসশূন্য এই অন্ধকার জীবনের শেষ সত্য নয়। হতে পারে না। ওঠো। দেখো। খোঁজো। পাবেই পাবে। সুন্দরের জগৎ, বিশ্বাসের জগৎ কোথাও আছেই।

ভিতরের সেই একজনই আমাকে তখন গ্র্যাণ্ড জেরির কাছে ঠেলে

নিয়ে যায় কিনা জানি না। আমার সেই দশায় গ্র্যাণ্ডি কি তখন উপদেশের ডালি উপুড় করে ঢালে? নীতির কথা বলে? লেকচার ঝাড়ে? একেবারে না। মিটি-মিটি হাসে। সেই হাসি দু'গাল বোঝাই পাকা দাড়ি বেয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে। গ্র্যাণ্ডি একবার দু'বার পিঠ চাপড়ায়। খাপছাড়া একটা দুটো কথা বলে। সরু বা মোটা একটা তুলি টেনে নিয়ে সারি সারি রঙের বাটির কোনো একটাতে চুবিয়ে সাদা কাগজে কিছু আঁকিবুকি করে। আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি। দেখি। অনুভব করি বুকের তলার জগদ্দল পাথরটা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে পারছি। তখন মৃত্যুর সমুদ্রে ডুবতে ডুবতেও পায়ের নিচে জীবনের ডাঙার সন্ধান পাই।

গ্র্যাণ্ডি কি জাদু জানে?

এখন তার বয়েস বাহাত্তর। অনেকে বলে লোকটাকে বাহাত্তুরে ধরেছে। কি বলে কি করে কি আঁকে কারণে-অকারণে কি-যে হাসে—শুধু সেই জানে। কিন্তু আমি তাকে বাহান্নয় যেমন দেখেছি, বাষট্টিতে যেমন দেখেছি, এই বাহাত্তরেও ঠিক তেমনি দেখছি। একশ বাহাত্তর পর্যন্ত বাঁচলেও বাহাত্তুরে ধরবে এ আমি অন্তত বিশ্বাস করি না।

গ্র্যাণ্ডির কথা পরে। তার আগে আমার দৈনন্দিন সকালের যে রুটিনের কথা বলছিলাম।...যে-রুটিনে এই সকালে আমার বুকের তলার কাটা-ছেঁড়ার মতোই ছ'বছরের একটা কচি ছেলের তাজা রক্তের দাগ লেগেছে।

বিলিকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকাল দেখা শেষ হলে ও মুখ হাত ধুয়ে একেবারে চান সেরে নেয়। ঠাণ্ডা পড়লে বা বর্ষা নামলে রঙিলাকে গরম জল দিতে বলি। অন্য সব সময় ওর বা ওর বাবার আপত্তি সত্ত্বেও ওই সকালে ওকে ঠাণ্ডা জলেই চান সারতে হয়। শরীরের নাম যখন মহাশয়, ওটুকু সওয়ানোর ব্যাপারে আমি নির্মম। একেবারে ভরা শীত ছাড়া নিজেও ওই সকালে ঠাণ্ডা জলেই চান সেরে নিই। আমার বা বিলির সর্দি কাসির বালাই নেই, কিন্তু ওর বাবার খুক-খুক লেগেই আছে। চায়ের পর বিলির জন্য হালকা ব্রেক ফাস্ট

সাজাই। এক গেলাসের তিন ভাগ দুধ, এক ভাগ চা আর একটা ডিমের পোচ। নিজে পর পর দু' পেয়ালা চা ছাড়া ইদানীং আর কিছুই খাই না। তারপর ওকে পড়াতে বসি। ঠিক সাড়ে ন'টায় ওকে খেতে বসিয়ে দিয়ে আমার ছুটি।

ছুটি বলতে শুয়ে বসে আরাম করা নয়। প্রথম কাজ ঘর গোছানো। ঝাঁট-পাট রঙিলা সেরে রাখে। তার পরেও যা করি রঙিলা সেটা বাতিক ভাবে। বিলির বাবাও তাই ভাবে। ঘরের খাট আলিমারি ড্রেসিং টেবিল আয়না সব নরম কাপড়ের ঝাড়ন দিয়ে ঘষে ঘষে চকচকে করে তোলাটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ঝুল-কালি চোখের কাঁটা। ঘরের সাজসজ্জা কোনো তিন দিন এক-রকম দেখতে ভালো লাগে না। খাট ড্রেসিং টেবিল আয়না আলমারির নড়ন-চড়ন মাসে এক আধ বার হয়ই। সাহায্যের জন্য তখন রঙিলার ডাক পড়ে। ও রাগ করে না, মনে মনে যে হাসে বুঝতে পারি। শোবার ঘরটা মস্ত বড়, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজানোর সুবিধে। পাশের বসার ঘরের সোফা-সেটিগুলোরও নড়া-চড়ার বিরাম নেই। মোট কথা, আমার মনে নতুন কোনো ছবি ভাসলেই ঘর দুটোর সেই মতো ভোল বদলায়। পিছনের ছোট বাগান থেকে নিজেই রোজ ফুল তুলে আনি। তার মধ্যে রঙ-বেরঙের পাহাড়ী বুনো ফুলও অনেক থাকে। কোনটাই আমার কাছে ফেলনা নয়। রঙের বিপরীত মিলনে ওগুলোর কখন কি রকমের বাহার খোলে সেটা আবিষ্কার করা একটা মজার নেশার মতো। ছুটির দিনে এই নেশায় আমার অনেক সময় কেটে যায়। দু'ঘরের রঙ-বেরঙের ফুলদানীতে নিত্য নতুন ফুলের বাহার দেখতে কি ভালো যে লাগে। অথচ ফুল তো বলতে গেলে সেই একই। কেবল সাজানোর পরিপাটিতে বাহারের রকম-ফের।

বিলির বাবা ডিকি ঠাট্টা করত, সব কিছু নিত্য নতুন হলে তোমার মন ভরে, অথচ কবেকার সেই একটা পুরনো স্বামীকে নিয়েই ঘর করতে হচ্ছে। বলে খুব হাসত।

এ রকম শুনলে গোড়ায় গোড়ায় ধাক্কা খেতাম। কারণ আমার যৌবনে ডিকিই প্রথম বা একমাত্র পুরুষ নয়। কিন্তু তবু নিজেকে আমি ব্যভিচারিণী ভাবি না। মানুষ অনেক সময় অবস্থার খেলনা, আবেগের দাস। নতুন বয়সের কালে একজনকে নিয়ে আমি সুন্দরের জগৎ গড়ে তুলেছিলাম। পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার আগে সেই জগৎ তৃতীয় কারো কৌতূহল বরদাস্ত করে না। তাই তাতে গোপনতা ছিল। ভুলও হয়তো ছিল। তা না হলে ওই জগতের মানুষটা ওভাবে দূরে সরে যাবে কেন। কিন্তু আমার মধ্যে অন্তত এতটুকু পাপবোধ ছিল না, ছলনা ছিল না। ছিল না বলেই সেই একজনের কত কথা কত নিবিড় স্পর্শ স্মৃতির গোপন খুপরিতে কুলুপ আঁটা ছিল। …ছিল। এখন নেই। সেখানেও এখন একটা দগাদগে ঘা কেবল।

…ঘর গোছগাছের পর স্কুলের খাতা নিয়ে বসা। স্কুল যেমন আমার খাতা দেখাও তেমনি। শালজুড়ির এই একমাত্র স্কুলের বয়েস বছর বারো কি তেরো। এখানে এই স্কুলটা করেছিল গ্র্যাণ্ড জেরির 'দ্য বীগ্ লেডি' মেলিণ্ডা জারভিস। বুড়োরা গ্র্যাণ্ডির মতোই তাকে বীগ লেডি বলত, কিন্তু সেই বলার মধ্যে সম্ভ্রমের ঘাটতি ছিল না। সমবয়স্ক বা বয়স্কারা বলত লেডি মেলিণ্ডা বা লেডি জারভিস। আর ছোট থেকে আধ বয়সীরা তাকে ডাকত মাদার জারভিস বা মা জারভিস বলে। আমার মধ্যে বাঙালীর রক্ত তো আছেই, এই বাংলার সব-কিছুর ওপরেই আমার বাড়তি টান। আমি মা জারভিস বলতাম, সামনাসামনি কখনো বা শুধু মা বলে ডাকতাম। মা ডাকের মতো আর কিছু আছে নাকি! এখানকার অনেক বাঙালী ছেলেমেয়েও তাদের মা-কে ডাকে মা-মি মাম্মা মাম্মি কত কি। মুখে বলতে পারি না কিন্তু বিচ্ছিরি লাগে। বিলি মা বলে হাঁক দিলে বুকের ভেতরটা যেমন ভরে যায়—মা-মি মাম্মা মাম্মি শুনলে কি তেমন হয়? জানি না। যাক, মা জারভিস আমার মা ইভা স্মিথের থেকে বয়েসে কম করে চোদ্দ পনের বছরের বড় ছিল, আবার দিদিমা আগনেস ব্যাণ্ডোর থেকে বারো তেরো বছরের ছোট ছিল। কিন্তু মা জারভিস বয়সের

দাঁড়িপাল্লায় বসে কারো মা হয়ে ওঠেনি। অতি বুড়ো বা অতি গুঁড়োর মুখেও তার উদ্দেশে এই মা ডাক বে-মানান লাগত না। শুনেছি আমার দিদিমা আগনেস ব্যাণ্ডো মা জারভিসকে নিজের মেয়ের থেকেও ভালবাসতো। শুনেছি, কারণ দিদিমাকে আমি আর কতটুকু দেখেছি। মনে পড়ে কি পড়ে না। দিদিমা চোখ বোজার কালে আমার বয়েস বড় জোর পাঁচ। বাড়িতে তার কোনো ফোটোও নেই। ঘষা-মোছা একটা ছিল মা জারভিসের কাছে। দিদিমার কথা উঠলে মা জারভিসের সুন্দর চোখে মুখে যেন আরো সুন্দরের মিষ্টি বাতি জ্বলে উঠত। ভক্তিমতী বাঙালী মেয়ের কোনো দেবীর মূর্তি কল্পনায় প্রত্যক্ষ হলে যেমন হয়। ওই ফোটো দেখিয়ে বলত, কি মানুষ ছিল তোর দিদিমা সে জানার ভাগ্য তোর আর হল কই। তার হাতে হাল না থাকলে দাদামশাই তোর কোথায় ভেসে যেত বা কোথায় তলিয়ে যেত ঠিক আছে!

আমার মা ইভা কক্ষনো দিদিমা বা দাদামশাইয়ের গল্প করত না। শুনতে চাইলে ধমক লাগাতো। মায়ের কোনো সময়েই আমার সঙ্গে বাজে কথা বলার বা বাজে গপ্‌প করার সময় হত না। দিদিমা আগনেস বা দাদু ব্যাণ্ডোকে নিয়ে আমার কৌতূহলও মা বাজেই ভাবত কিনা জানি না। টুকটাক যেটুকু শুনতাম মা মেলিণ্ডা জারভিস বা গ্র্যাণ্ডির মুখে। তাই থেকে আমি শুধু জানি দিদিমা আগনেস ছিল যেমন ঠাণ্ডা তেমনি শক্ত মনের মেয়ে। মা জারভিস বলত আমি নাকি খানিকটা তার ধরণ-ধারণ পেয়েছি। সেই জন্যেই কি মা জারভিস আমাকে এত ভাল বাসত?

যাক, সেই দিদিমার শিরায় শিরায় ছিল খাঁটি ইংরেজের রক্ত। অল্প বয়সে বাপ-মা খুইয়ে বড় ভাইয়ের সঙ্গে ভারতে এসেছিল। সেই বড় ভাই ছিল মেটেলির চা-বাগানের ছোট-খাট একজন কর্তা ব্যক্তি। শুধু উত্তর বাংলা কেন, ভারতের সমস্ত চা বাগানেই তখন ইংরেজের প্রতাপ প্রতিপত্তি। নেটিভদের কখনো তারা সমান ওজনের বা সমান স্তরের মানুষ ভাবত না। এটা সাতান্ন সাল। দশ বছর আগে, অর্থাৎ

সাতচল্লিশে ভারত স্বাধীন হবার আগেও ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের কত ফারাক দেখেছি। কেউ কাউকে আপনজন ভাবতে পারত না বা ভাবতে চাইত না। অবশ্য শালজুড়ির কথা আলাদা। গ্র্যাণ্ড জেরির মতো মানুষ বা মেলিণ্ডা জারভিসের মতো মহিলা গণ্ডায় গণ্ডায় হয় না, বা সর্বত্র বাস করে না। তাহলে তো দুনিয়া থেকেই সাদা কালোর তফাৎ ঘুচে যেত। গ্র্যাণ্ড জেরি না হয় মিশনারি হিসেবেই ভারতে এসেছিল। তার ভিতরের শিল্পী তাকে অন্য পথে টেনেছে। সববাইকে সমান চোখেই দেখার কথা তার। কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিস তো ইংরেজের মেয়ে, ইংরেজের বউ। এ-দেশের মানুষকে সে এমন ভাল বেসেছিল কি করে জানি না। কালিম্পং ছেড়ে এই শালজুড়িতে এসে পাকাপোক্ত হয়ে বসার পরে, বিশেষ করে এখানে ছোটদের এই স্কুলটা করার পরে শালজুড়ি থেকে সাদা কালোর তফাৎ সে-ই ঘুচিয়ে ছেড়েছিল দেশ স্বাধীন হবার আগেই।

…কিন্তু সেই দিদিমা দাদামশাইয়ের যুগে এ-দেশে এসে কোনো অভিজাত ইংরেজ কন্যা এক বাঙালী নেটিভকে একেবারে বিয়ে করে বসতে পারে এটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। মেটিলির চা বাগানের দাপটের অফিসারের সেই বোন অর্থাৎ আমার দিদিমা আগনেস তাই করে বসেছিল। আমার দাদামশায় দিলীপ ব্যাণ্ডো ওই চা বাগানের একজন সাধারণ এঞ্জিনিয়ার ছিল। কাজের সুনাম ছিল খুব। কিন্তু মদ খেত, জুয়া খেলত, জলপাইগুড়িতে গিয়ে রেস খেলত। মানুষটা দিলদরিয়া ছিল নাকি। আর চেহারাখানাও ভালো ছিল। তখন ইংরেজের প্রতিপত্তি, তার ওপর মানুষটাও ছিল সাদা চামড়া ঘেঁষা। শুরুতেই নিজের বন্দ্যোপাধ্যায় নাম ছেঁটে ব্যাণ্ডো করেছিল। দিলীপও নয়, শুধু ব্যাণ্ডো বললেই ফ্যাক্টরির মানুষেরা তাকেই চিনত, বুঝত।

দিদিমা আগনেসকে দেখে তার মুণ্ডু ঘুরেছিল। তারই দাপটের ম্যানেজারের বোন, হাত বাড়ালে সেই হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার মতোই মেজাজী মানুষ সেই ভদ্রলোক, ব্যাণ্ডো দাদুর ভয়-ডরটুকুও ডুবে যাচ্ছিল। বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে সভয়ে সতর্ক করেছে। কিন্তু

ভেতর অবুঝ হলে তাকে বোঝায় কে? অবসর সময় ছায়ার মতো সেই মেয়ের পিছনে ঘুরত। তাকে একান্তে পাওয়া একান্তে দেখার লোভে কাজ কামাই করত। তার সঙ্গে কথা বলার ফাঁক খুঁজত। একটা মেয়ে কতদিন আর তা না জেনে না বুঝে থাকতে পারে? বিয়ের আগে দিদিমা আগনেসের পদবী ছিল উড্। আগনেস উড্। সেই মেয়ে কখনো মজা পেত, হাসত। কখনো বা বিরক্ত হত। ভুরু কুঁচকে তাকে তফাতে হটাতে চেষ্টা করত।

একদিন সে তাকে স্পষ্ট করে বলল, তোমার প্রাণে ভয়-ডর নেই?

জবাবে ব্যাঙো বলল, আমার প্রাণটাই তো তোমার হাতের মুঠোয়, তাই বাঁচা মরাও তোমারই হাতে।

এই জবাবের পর আগনেস উড্ তার ওপর সদয় হয়েছিল কিনা বা কতটা সদয় হয়েছিল মা জারভিস আমাকে বলেনি। কিন্তু ব্যাঙোকে একেবারে বিয়েই করে বসত কিনা মা জারভিসের সন্দেহ আছে। সেই দিকে তাকে এগিয়ে দিয়েছিল নাকি তার দাদা জন উড্। ব্যাঙোর অভিলাষ বা দুঃসাহসের খবর তার কানে দেবার মতো স্তাবকের অভাব ছিল না। জন উড গোড়ায় খুব একটা কানে নেয়নি। কোনো নেটিভের প্রতি বোনের দুর্বলতা থাকতে পারে এ শুধু বিশ্বাস কেন, কল্পনারও বাইরে। কিন্তু নেটিভের সাহসের কথা ভেবে তার রক্ত গরম হয়েছিল। ফ্যাক্টরির কাজে তার এতটুকু ত্রুটি দেখলে বাঘের মতো হুংকার ছেড়েছে। অত বড় ফ্যাক্টরিতে ত্রুটি দেখতে চাইলে সেটা পেতে কতক্ষণ? ম্যানেজারকে ব্যাঙো কি আর বলবে। আগনেসকে বলত, তোমার দাদা আমার ওপর নির্দয় হয়ে উঠছে।

আগনেস সাফ জবাব দিত, হবে জানা কথাই, তুমি সাবধান হচ্ছ না কেন, নিজেকে পাগলামির জালে জড়াচ্ছ কেন?

দিলীপ ব্যাঙো হাসত। বলত, তোমার দাদা বোকার মতো হাতির জোর ফলাচ্ছে, জোর খাটিয়ে কেউ কোনদিন প্রেমের জাল ছিঁড়তে পারে? বড় জোর প্রাণটা নিতে পারে।

সেই প্রাণ দেবারই দাখিল একদিন। ছুটির দিনের এক মেঘলা

শীতের দুপুরে জন উড্ ঘোড়ায় চেপে কোথায় যাচ্ছিল। দূর থেকে দেখে আগনেস আর ব্যাঙো নিরিবিলি জঙ্গলের দিকে চলেছে। ব্যাঙো বারবার বোনের হাত ধরতে চেষ্টা করছে আর বোন হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে।

একটু বাদে দু'জনেই সচকিত। জন উড্ ব্যাঙোর প্রায় গায়ের ওপর এসে ঘোড়া থেকে নামল। ভাঁজ করা চামড়ার হাণ্টার তার কোমরের বেল্ট-এ গোঁজাই থাকে। সেই হাণ্টারের ঘায়ে চা বাগানের অনেক কুলি মজুরকে মাটিতে শুইয়ে দেয়। সেদিন মুখ থুবড়ে পড়ল দিলীপ ব্যাঙো। গায়ের শার্ট রক্তে ভিজে উঠল। মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে অজ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত জন উডের হাতের হাণ্টার থামল না।

প্রায় দশদিন জলপাইগুড়ি হাসপাতালে থাকার পর ব্যাঙো সুস্থ হল। আগনেস বলল, দাদার নামে তুমি কোর্টে নালিশ করো, আমি সাক্ষি দেব।

ব্যাঙো হেসে বলল, তোমার দাদার থেকে বেশি উপকার আমার কে করেছে, আর নালিশের দরকার কি?

না, দিদিমা আগনেস দাদামশাইকে আর মেটিলির চা কারখানায় চাকরি করতে দেয়নি। শালজুড়ির চা বাগানের এই কারখানা তখন নতুন। দাদামশাইয়ের ভালো কাজ পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি। তাছাড়া বাঙালী ছেলের খাঁটি মেমসাহেব বউ, তখনকার সায়েব সুবোদের কাছে এটা কম ব্যাপার নয়। ফলে এখানকার মনিবদের চোখে দাদামশাইয়ের বাড়তি কদর হয়েছিল।

...মা মেলিণ্ডা জারভিস বলত, বিয়ের পরেও তোর দাদামশায়ের স্বভাবের দোষ যাবে কোথায়। মদের নেশা আর জুয়ার নেশা তার রক্তে। অন্য মেয়ে হলে বিয়ে ভেঙে যেত। টিকে গেছে কেবল দু'জনার ভালবাসার জোরে। তাতে কোনো খাদ ছিল না।

আর একটা মজার ব্যাপার। মেম বিয়ে করে দাদামশাই যতো বেশি সাহেবীয়ানার দিকে ঝুঁকেছে, দিদিমা আগনেস নাকি ততো

বাঙালীয়ানার দিকে এগিয়েছে। অনেক সময়ই শাড়ি পরত, কপালে সিঁদুরের টকটকে লাল টিপ নাকি তার ভারী পছন্দ ছিল। বাঙলা শেখা, বাঙালী সংস্কৃতি জানার ব্যাপারেও তার কম আগ্রহ ছিল না। এখানকার এক ফরেস্ট অফিসারের বাবা রিটায়ার করে ছেলের কাছে থাকত। ভদ্রলোক কলকাতার স্কুলের শিক্ষক ছিল। তার সঙ্গে ভাব করে দিদিমা আগনেস অনেক শিখেছিল। বেশি বয়সে গীতার ব্যাখ্যা পর্যন্ত শুনত। মেলিণ্ডা জারভিস আর গ্র্যাণ্ড জেরিকে বলত, কি আশ্চর্য দেখো, দিলীপ পর্যন্ত জানে না তাদের কাব্যে সাহিত্যে ধর্মে কত বড় জিনিস আছে!

দিদিমা আগনেস আস্তে আস্তে দাদামশাইয়ের জুয়ার নেশা ছাড়াতে পেরেছিল, কিন্তু মদের নেশা থেকেই গেছল। এ ছাড়া ভদ্রলোকের সাহেবায়ানার খরচও কম ছিল না। ফলে দিদিমাকে রোজগারের রাস্তাও ধরতে হয়েছিল। আমাদের এই কাঠের বাংলো (এখানকার সব বাড়ি বা বাংলোই কাঠের) দিদিমার চেষ্টাতেই হয়েছিল। এখানে সে খুব ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের মতো করেছিল। বাচ্চাদের নিয়ে তখন এখানকার চা বাগানের বা জঙ্গলের পদস্থ অফিসারদের আর তাদের গিন্নিদের খুব মুশকিল। তিন চার পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েদের শিলিগুড়ি দার্জিলিং কার্সিয়ঙ বা কালিম্পঙের স্কুল বোর্ডিং-এ রেখে পড়াতে পারে না, আবার বাড়ির শিক্ষা-দীক্ষার ওপর নিজেদেরই তেমন আস্থা নেই। তাই দিদিমা আগনেসের বাড়ির স্কুলের আসর জমে উঠতে সময় লাগেনি।

বেশি মদ গেলার জন্যে হোক বা যে জন্যেই হোক একান্ন না বাহান্ন বছর বয়সে দাদামশাইয়ের প্যারালিটিক স্ট্রোক হয়ে বসল। সেই অচল অবস্থায় সাত বছর বেঁচে ছিল। দিদিমা আগনেস তখন নাকি মেলিণ্ডা জারভিসকে বলত, হিন্দুর বউরা বিধবা হতে চায় না, তারা স্বামীর আগে মরতে চায়—কিন্তু এই লোককে রেখে মরার কথা ভাবতেও আমার কাঁপুনি ধরে। কে দেখবে? ইভা? হুঁ—সে তো ওর বাপের মেয়ে, তার থেকেও এক কাঠি ওপরে যায়।

ইভা বলতে আমার মা ইভা ব্যাঙো, বিয়ের পরে ইভা স্মিথ।

তা দিদিমার ইচ্ছে বরবাদ হয়নি। দাদামশাই তার বেশ আগেই চোখ বুজেছে।

...দিদিমা আগনেসের সঙ্গে মেলিণ্ডা জারভিস আর গ্র্যাণ্ডির হৃদ্যতা বা একাত্মতা আমার জন্মের ঢের আগের থেকে। এদের সে-সময়ের অনেক গল্প আমি এখানকার বুড়ো বুড়ীদের মুখে শুনেছি, কিছু আমার 'জেণ্টল্‌ম্যান' বাবার মুখে শুনেছি, খেয়ালখুশি মতো গ্র্যাণ্ডিও অনেক সময় অনেক কথা বলেছে, কিছু বা আবার আমার বাংলার গুরু মীনা ডাকুয়া বলেছে।

ভাবতে গেলে মেলিণ্ডা জারভিসের জীবনটা দুঃখের। যদিও জ্ঞান বয়েস থেকে কোনো দুঃখ কষ্ট আমি তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেখিনি। বরং চলাফেরা কথাবার্তায় ভারী একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য সর্বদা যেন তাকে ছুঁয়ে থাকত। একই সঙ্গে তেমনি তার ব্যক্তিত্ব। নিজের চোখে দেখেছি, কোনো মেয়ে দোষ করলে (আমিও বাদ নই) বকাঝকা কিছু করত না। চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে থাকলেই সেই মেয়ের হয়ে গেল। তাছাড়া কালিম্পং স্কুলের প্রিন্সিপালশিপ ছেড়ে এখানে এসে এই বাচ্চাদের স্কুল ফেঁদে বসার সময়ও তার ব্যক্তিত্বের নানা দিক দেখেছি। সোজা নিজে গিয়ে আরজি নিয়ে দাঁড়ালে কেউ তাকে বিমুখ করা বা ফেরানোর কথা ভাবতেও পারত না। তখনকার সেই ইংরেজ শাসনের যুগেও মোটা সরকারি গ্র্যাণ্ট অনায়াসে আদায় করেছে। দার্জিলিং ভ্রমণে আসা ইংরেজ গভর্নরের সঙ্গে মা জারভিস সরাসরি গিয়ে দেখা করেছে। তার পরেই ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

তবু মা জারভিসের সবদিক ভাবতে বসলে আমার দুঃখের জীবনই মনে হয়। পিঠোপিঠি এক ভাই আর এক বোন তারা। ভাই দেড় বছরের বড়। বিলেতে থাকতে বিদুষী বোন নিজে পছন্দ করে এক নাটক লিখিয়েকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পরেই তার বাবা এই শালজুড়ি চা কোম্পানির একজন ডাইরেক্টর হিসেবে সস্ত্রীক এখানে চলে এসেছিল।

কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিসের কপালে সংসার জীবনের সুখ লেখা ছিল না। লণ্ডনের থিয়েটারে তার স্বামীর নাটক মাঝে-সাজে অভিনয় হত। অল্প বয়সে একটু নামও হয়েছিল। কিন্তু ভিতরে লোকটা কত বড় লম্পট আর অসৎ সেটা তার পরেই বোঝা গেছে। অপেরার ঠুনকো মেয়েগুলোর সঙ্গে কুৎসিত সম্পর্ক আগেই ছিল। এরপর নাটকের মেয়েদের সঙ্গে। বিদুষী বউয়ের থেকে তাদের সংসর্গে ঢের বেশি ফুর্তি। স্বামীর স্বভাব চরিত্র বোঝার পর মেলিণ্ডা নির্দ্বিধায় বিয়ে ভেঙে দিয়ে এই শালজুড়িতে বাবা মায়ের কাছে চলে এসেছে। ভাই বোনের মধ্যে দারুণ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ভাই তাকে ধরে রাখতেই চেষ্টা করেছিল। মেলিণ্ডারও তাকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে। কিন্তু অতবড় ঘা খাবার পরে মায়ের কাছে ভারতেই চলে এলো।

কালিম্পংএ মেয়েদের সব থেকে নামী স্কুলে চাকরি পেতে সময় লাগেনি তার। ওই স্কুলটাই যেন তার সাধনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। কালে দিনে ওই স্কুলের সর্বেসর্বা অর্থাৎ প্রিন্সিপাল পর্যন্ত হয়েছিল মেলিণ্ডা জারভিস। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

বাবা মায়ের ইচ্ছে ছিল মেয়ে মেলিণ্ডা আবার বিয়ে করুক। কিন্তু মেয়ে গোড়া থেকেই সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ওদিকে আর নয়, সে তার পথ পেয়ে গেছে। মেলিণ্ডা জারভিসের বাবা মা এখানকার বিশাল বাংলোয় থাকত। মেয়ে ছুটি-ছাঁটায় বা ভেকেশনে তাদের কাছে আসত। শালজুড়ি থেকে কালিম্পং বাসে মাত্র তো তিন সাড়ে-তিন ঘণ্টার পথ। বাবা যখন বুঝল মেয়ে এখানেই থেকে যাবে, অথচ নিজের তার এখানকার মিয়াদের পাঁচ বছরের তিন বছর শেষ, ভেবে-চিন্তে মেয়ের জন্যে এখানেই ছোট-খাট একটা বাংলো করল। কারণ, যতকাল স্কুলে চাকরি করবে, কালিম্পং স্কুল বোর্ডিংএ তার থাকার চমৎকার আলাদা ঘর আছেই। তখন অবশ্য ভাবেনি, ভবিষ্যতে মেয়ে একদিন ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল হয়ে বিশাল কোয়ারটারস দখল করে নেবে।

এই পরিবারের সঙ্গে তখন আর যে লোকটি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

সে জেরি গ্র্যাণ্ড। স্থানীয় লোকের কাছে তখনো অবশ্য সে গ্র্যাণ্ড জেরি নয়। মিশনের মানুষ হিসেবে কালিম্পঙের গীর্জেয় থাকত। কিন্তু সেখানকার কাজকর্ম তার একটুও ভালো লাগত না। নিজের মনে বসে ছবি আঁকত। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো। কোনো দৃশ্য পছন্দ হলে সেখানেই কোনো পাথরের ওপর রঙ তুলি নিয়ে বসে যেত। কবে তাকে বাঘ ভালুকে খাবে বা সাপে কামড়াবে সকলের মনে এই ভয়। নিষেধের জবাবে তার মুখে কেবল হাসি ওই নামী মেয়ে-স্কুলের সে-সময়ের প্রিন্সিপাল এই পাগলাটে মানুষটার মধ্যে এক অনন্য শিল্পীর সম্ভাবনা দেখেছিল। অনেক চেষ্টায় সে তাকে তার স্কুলে টানতে পেরেছিল। মেয়েদের আঁকা শেখাতো। কিন্তু স্কুলের রুটিন কাজও তার একটুও ভালো লাগত না। খুশি মতো আসত। মন অন্যত্র উধাও হলে আসত না। কেবল এই এক মানুষই স্কুলের কড়া ডিসিপ্লিনের আওতায় পড়ত না। এই লোক কোনো নিয়মে বাঁধা পড়লেই বরং সেটা অবাক হবার মতো ব্যাপার হত।

স্কুলে গেলেও জেরি গ্র্যাণ্ড মেয়েদের নিয়ে কখনো স্কুল বিলডিংএ থাকত না। বাইরে কোথাও চলে যেত। প্রকৃতির পরিবেশে বসে আঁকার মহড়া দিত। একই ক্লাসের মেয়ে হয়তো সব, কিন্তু আঁকার ছকে বাঁধা কোনো বিষয় নেই। যে-যার খুশি মতো আঁকো, যার যেমন চোখ তেমনি আঁকো। মেয়েরা বোধহয় সব থেকে খুশি হত সপ্তাহের পাঁচ দিনের পাঁচ ঘণ্টা ধরেই যদি শুধু জেরি গ্র্যাণ্ডের ক্লাস থাকত।

মানুষটা দেখতে সুন্দর তো নয়ই, বরং নাক মুখ চোখ আলাদা করে দেখলে কুৎসিতই বলবে সকলে। গায়ের ফর্সা রঙ পর্যন্ত তামাটে মেরে গেছে। এক গাল দাড়ি, থ্যাবড়া মোটা নাক, ছোট চোখ, চোখের নিচেই চামড়ায় গোটা দুই ভাঁজ। বেঢপ পোশাক-আশাক। এমন লোকের মধ্যে কোনো গুণের ছিটে-ফোঁটা থাকতে পারে কারো মনে হবে না। চেহারা দেখে বাচ্চাদের অন্তত তার কাছ থেকে সভয়ে দূরে থাকার কথা। কিন্তু ভিতরে লোকটা কত সুন্দর সেটা অনুভব ক

সময় লাগত না। তাছাড়া এই মানুষের মুখের হাসি অদ্ভুত সুন্দর আর অদ্ভুত মিষ্টি। আমার অন্তত তাই মনে হত। ছেলেবেলায় তাকে বিয়ে করব বলতাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, জ্ঞান বয়সেও মনে হত, বয়েস-টয়েসে মিললে আমি সত্যি সত্যি ওই মানুষের প্রেমে হাবুডুবু খেতাম।

সে কত বছর আগে জানি না, কোনো এক উইক এনড্-এর ছুটিতে মেলিণ্ডা জারভিস নাকি তাকে কালিম্পং থেকে এই শালজুড়িতে বেড়াতে নিয়ে এসেছিল। ঘুরে ফিরে এখানকার বন জঙ্গল পাহাড় পাহাড়ী নদী দেখে সে আর এখান থেকে নড়তে চায় না। আঁকার এমন পরিবেশ, এমন প্রকৃতি আর কোথায় আছে? মেলিণ্ডা জারভিসের বাবা মায়ের অতিথি এ-জ্ঞানও লোকটার নেই। মেলিণ্ডা কালিম্পঙে ফিরে গেল, কিন্তু ওই লোক ছ' ছ-টা দিন এখানেই থেকে গেল। পরের সপ্তাহে এসে মেলিণ্ডা তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেছে।

এরপর মেলিণ্ডা আর তাকে উইক-এনড্-এর ছুটির দিনে এখানে নিয়ে আসতে সাহস করেনি। কিন্তু সে আসার জন্য ভারী ব্যস্ত। এলে সেই একই ব্যাপার। মেলিণ্ডা একলা ফিরে যেত। জেরি এখানে তার বাবা মায়ের কাছে থেকে যেত। ফলে শুধু ভেকেশনের বড় ছুটি ছাড়া মেলিণ্ডা জারভিস তাকে এখানে আনতেই চাইত না। ওদিকে ভদ্রলোক এরই মধ্যে মেলিণ্ডার বাবা-মায়ের ভারী আদরের মানুষ হয়ে উঠেছিল। তারাও এই লোকের গুণের সমজদার।

সেই সময় থেকেই আমার দিদিমা আগনেস ব্যাণ্ডোর সঙ্গে জেরির আলাপ-পরিচয়-খাতির। দিদিমার তখন বাচ্চা ছেলে মেয়েদের নিয়ে সমস্যা। মেলিণ্ডা জারভিস বা জেরি গ্র্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা হলেই বলত, বড় স্কুলে চাকরি করছ, কি আর বলব—কিন্তু সকলে যদি বড় স্কুলের দিকে ছোটে এখানকার বাচ্চাগুলো যায় কোথায় বলো তো? তিন-চার-পাঁচ বছর বয়সে তারা মা-ছাড়া হয়ে দূরের বোর্ডিং-এ গিয়ে থাকতে পারে না, আর এদিকে একলা আমি কত সামলাই! অথচ, এই বাচ্চা বয়েসটাই ওদের ভিত্ গড়ার সময়, সে-কথা কে ভাববে?

মেলিণ্ডা জারভিস সমস্যা হলেও চুপ করে থাকত। কিন্তু জেরি গ্র্যাণ্ড মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিত। বলত, ইউ আর পা-ফেক্টলি রাইট ম্যাডাম, তুমি তোমার বাড়িতে আমার শুধু একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দাও—আমি এসে তোমার সঙ্গে লেগে যাচ্ছি। যদিও তোমার ছেলে মেয়েগুলোর তাতে ভিত্ গড়া হবে না, আমার মতোই বাউণ্ডুলে অপদার্থ হবে, বাট্ লেট্ মি ট্রাই টু টিচ্ দেম লাইকস ফার্স্ট কন্‌ডিশান—অনেস্টি—আমার নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সততার অভাব, তাই তার যন্ত্রণা আমি জানি, বুঝি। দেখো না, স্কুল থেকে মোটা মাইনে ওরা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দেয়, অথচ আমি আমার কাজে মন দিতে পারি না, ডিউটি করতে পারি না—তবু কেউ এর যন্ত্রণা বুঝতেই পারে না। ক্যান ইউ ট্রাই এ ডিজ্-অনেস্ট ম্যান ম্যাডাম ?

দিদিমা আগনেস জবাব দেবে কি, হেসে সারা। তারপর বলেছিল নাকি, তুমি তোমার সব থেকে বড় কোয়ালিফিকেশন অর্থাৎ ডিজ্-অনেস্টির কথা লিখে একটা দরখাস্ত করো, আমি বিবেচনা করার জন্য হাঁ করে আছি।

মেলিণ্ডা জারভিসের নাকি ভয়ই ধরত, কবে না লোকটা কালিম্পঙের স্কুল ছেড়ে এখানেই পাকা ডেরা নিয়ে বসে যায়। সে বাধা না দিলে দিদিমা আগনেস তাকে ঠিক হাত করে ফেলত।

মেলিণ্ডা জারভিসের বাবা সস্ত্রীক আর ইংলণ্ডে ফিরতে পারেনি। কয়েক দিনের ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় ভুগে স্ত্রী এখানেই দেহ রেখেছে। এটাই তখন এখানকার সব থেকে ভয়াবহ ব্যাধি। স্ত্রী মারা যাবার ফলে মেলিণ্ডার বাবা এখানকার চাকরির মিয়াদ ফুরোবার এক বছর আগেই লণ্ডনে ফিরে গেছে। আর ছ'মাসের মধ্যে তারও মৃত্যু সংবাদ এসেছে। মেলিণ্ডা জারভিস তখনো দেশে ছোটেনি। আর বন্ধন কি আছে যে সেখানে যাবার জন্য ব্যস্ত হবে। শুনেছি অসাধারণ নিষ্ঠায় মেলিণ্ডা জারভিস তারপর ওই স্কুলের কাজে মন ঢেলেছে।

কিন্তু তাকে দেশে ছুটতে হল আরো সাত-আট মাস বাদে। নিজের ভাই বিপদে পড়ে তাকে ডেকেছে, তার ডাক উপেক্ষা করতে পারল না। স্কুল থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়ে লণ্ডনে চলে গেল। কিন্তু ফিরল তিন বছর বাদে। সঙ্গে সেই ভাইয়ের তিন বছরের ছেলে রয় জারভিস। মেলিণ্ডা ফেরার পর জানা গেল এই ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তার মা অর্থাৎ ভাইয়ের স্ত্রী মারা গেছে।

এই তিন বছরে এক মাত্র স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে তার চিঠিপত্রে যোগযোগ ছিল। প্রত্যেক চিঠিতে তাকে অনুরোধ করত, বিনা বেতনে অন্তত তার চাকরিটা যেন থাকে। খোলাখুলি শুধু তাকেই সব লিখত। শুধু নবজাত শিশুর সমস্যা নয়, সংসারের দুর্বিপাক ছাড়াও কতগুলো বৈষয়িক কারণে সে আসতে পারছে না, কিন্তু দেরিতে হলেও ভারতে সে ফিরবেই।

একে একে তিন বছর কেটে যেতে তার আশা প্রিন্সিপালও ছেড়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে সানন্দে তাকে আবার বহাল করেছে। শুধু ওই মহিলা কেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের সকলেই মেলিণ্ডা জারভিসকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। বিশেষ করে ছেলেটার জন্যেই আটকে গেছল মেলিণ্ডা। এক বছরের মধ্যে দাদা আবার বিয়ে করতে সে-ই তার ছেলে আগলে ছিল। ভারতের জল বাতাস সহ্য হবার মতো একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত নিয়ে আসতে সাহস করেনি। তিন বছর বয়েসের তুলনায় তখনো ছেলেটাকে কম জোরি মনে হয়েছে। ভারতে আসতে তার জলবাতাস সহ্য তো হয়েইছে, দেখতে দেখতে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। এ-সব আমার মীনা মাসি অর্থাৎ মীনা ডাকুয়ার কাছে শোনা। সে মা জারভিসের ছাত্রী ছিল। আমার তো তখন জন্মই হয়নি।

মা জারভিসের ছাত্রী আমিও ছিলাম। শুধু ছাত্রী নয়, বোধহয় সব থেকে প্রিয় ছাত্রী। সেটা আমার স্বভাব গুণে ঠিক নয়, তার থেকে বেশি বোধহয় আমি আগনেস ব্যাণ্ডোর নাতনি বলে। অথচ আমার মা ইভা স্মিথকে মেলিণ্ডা জারভিস আদৌ সুনজরে দেখত না।

মা-কে বকা-ঝকা একমাত্র সে-ই করত। মুখের ওপর বলত, অমন মায়ের মেয়ে তুই, এ কি মতি গতি তোর!

যাক, মায়ের কথা এখন থাক। তার কথা মনে হলে ভিতরটা এখনো অস্থির হয়ে ওঠে। সব থেকে লজ্জা আর পরিতাপের কথা, মা অসময়ে অল্প বয়সে মরে গেল বলে আমার তেমন শোক পর্যন্ত হয়নি। অথচ স্পষ্ট মনে আছে, মেলিণ্ডা জারভিসের দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেছল।

মা জারভিসই আমাকে তার কালিম্পঙের স্কুলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। নইলে আমার মায়ের ইচ্ছে ছিল কার্শিয়ংএ থেকে পড়ি, কার্শিয়ং অনেক কাছে। আমাদের পরিবারে তখন মায়ের ইচ্ছেটাই সব। মায়ের কাছে আমার জেণ্টলম্যান বাবার কোনো কথা বা কোনো মতামতের এতটুকু দাম ছিল না। তার ভালো কথার মধ্যেও মা উল্টো মতলব খুঁজে বার করত। কিন্তু ওই মেলিণ্ডা জারভিসের সঙ্গেই শুধু মা এঁটে উঠতে পারত না। তাছাড়া মা যত পাগলামিই করুক, আর ওই মহিলার ওপর তার যত রাগই থাকুক—তার থেকে আমার বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী যে এই শালজুড়িতে দ্বিতীয় কেউ নেই, এটুকু বুঝত।

সাধারণত, ছ'বছর বয়সের আগে কোনো মেয়েকে বোর্ডিংএ নেওয়া হয় না। আমার তখন মাত্র চার বছর বয়েস। মেলিণ্ডা জারভিস তখন স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল, তার আলাদা কোয়ার-টারস। আমি তার কাছে তার বাড়িতে থেকে পড়তাম। আর, তখন দিনরাত তার ভাইপো রয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াঝাঁটি মারামারি লেগেই থাকত। আমি একটুও ঝগড়ুটে মেয়ে নই। কিন্তু রয় জারভিস সেই ছেলেবেলা থেকেই যেমন দুরন্ত তেমনি দুষ্টু। আমার থেকে চার সাড়ে চার বছরের বড়। কিন্তু ওর দাপট আর বজ্জাতি এক-একসময় অসহ্য লাগত। আচমকা আমার চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলত, যখন তখন চিমটি কেটে গায়ের চামড়া ফুলিয়ে দিত। একেবারে অসহ্য হলে আমিও দুমদাম বসিয়ে দিতাম। আঁচড়ে

কামড়ে রক্ত বার করে ছাড়তাম। তখনই লপটা-লপটি কাণ্ড। ওর আন্টি মানে মা জারভিস কিন্তু সর্বদা আমার পক্ষ নিত। ভাইপোকে ধরে মারত পর্যন্ত। আমাকে কিচ্ছু বলত না। এতকাল মাস্টারি করছে, মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারত কার দোষ।

সাত বছর বয়সে মা জারভিস আমাকে বোর্ডিংএ দিয়ে দিল। তার কোয়ারটারস ছেড়ে বোর্ডিংএ এসে থাকার ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। কিন্তু তার ব্যবস্থার ওপর আর কথা কি। যতই ঝগড়া বা মারামারি করুক, বাড়ি ছেড়ে আমাকে বোর্ডিংএ সরিয়ে দেওয়া হবে রয় ভাবতেও পারেনি, চায়ও নি। আন্টিকে বলেছে শীলা বোর্ডিংএ যাবে কেন—এখানে থাকবে না কেন?

আন্টির সোজা জবাব, যাবে না তো কি করবে, তুই পিছনে লাগিস, ভালো মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করিস।

রয় প্রতিজ্ঞা করেছে, আর কক্ষনো পিছনে লাগবে না, ঝগড়া মারামারি করবে না। কিন্তু তার আন্টির এক কথা, না, এখন থেকে ওকে বোর্ডিং-এই থাকতে হবে।

দু'জনার যতই ঝগড়াঝাঁটি মারামারি হোক, ভাবও কম ছিল না। অনেকদিন পর্যন্ত আমার কি-যে বিচ্ছিরি লেগেছে। আমাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবার জন্য মা জারভিসের ওপরেই আমার সব থেকে বেশি রাগ হয়েছিল। সাধ্য থাকলে তার মুখ পর্যন্ত দেখব না ভাবতাম। রাগের থেকে আসলে আমার অভিমানই বেশি হয়েছিল। ওদের কোয়ারটারস ছাড়ার ফলে রয়ের সঙ্গে ভাবটাই দারুণ বেড়ে গেল। কথাবার্তা ইংরেজিতে হত। আমি তখন থেকেই মোটামুটি বাংলা বলতে কইতে পারি, ওর ভরসা কেবল ইংরেজি। আমাকে বলত, আন্টি আমার থেকে তোমাকে ঢের বেশি ভালবাসে, তুমি জোর করে বলতে পারো না বোর্ডিংএ থাকবে না—কান্নাকাটি করে গোঁ ধরে থাকতে পারো না?

না, যত রাগ আর অভিমানই হোক, মেলিণ্ডা জারভিসের অবাধ্য হবার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আর ছেলেবেলা থেকে কান্না-

টান্না আমার আসেই না। আমি পারিনি। কিন্তু রয় অনেকদিন পর্যন্ত তার আন্টির ওপর ক্ষেপেই ছিল।

উনিশ বছরে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করেছি। সে বছরই মেলিণ্ডা জারভিস স্বেচ্ছায় কালিম্পঙের ওই স্কুল ছেড়েছে। তখন সে ওখানকার নামী প্রিন্সিপাল। সে-পদ ছেড়ে শালজুড়িতে এসে থাকার কারণ, দিদিমা আগনেসকে নাকি কথা দিয়েছিল, সময় আর সুযোগ এলে এখানে বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল করবে। মেলিণ্ডা জারভিস তখনই সেই সময় বেছে নিয়েছিল কেন জানি না। নিজের সর্বস্ব ঢেলে শালজুড়িতে সেই স্কুল করেছে। পয়সাঅলা লোকদের দরজায় দরজায় ঘুরেছে। পয়সা যাদের নেই তাদের কাছে গিয়েও দাঁড়িয়েছে। যা পারো দাও, আর কিছু না পারো আমার সঙ্গে কাজে এসে লাগো, গতর খাটো। স্কুল তোমাদের সক্কলের ছেলে মেয়েদের। শুধু বড় লোকের ছেলে মেয়ের নয়, শুধু গরিবের ছেলে মেয়ের নয়—তিন থেকে সাত বছর বয়েস পর্যন্ত সক্কলের ছেলে মেয়েদের। স্কুলে মাইনে বলে কিছু থাকবে না, বড় লোকের ছেলেরও না গরিবের ছেলেরও না। এই স্কুল চত্বরে পা দিলে বড় লোকের ছেলে গরিবের ছেলে সব এক হয়ে যাবে।

স্কুল হল। দিদিমা আগনেসের নামে নাম স্কুলের। আগনেস কটেজ। টিচারদের বেশির ভাগ মেলিণ্ডা জারভিসের ছাত্রী। যাকে ডেকেছে সে-ই এসেছে। মীনা মাসি—মীনা ডাকুয়া তো সবার আগে এসেছে। বিনে মাইনের চাকরি নয়। চা বাগানের মালিকদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা এসেছে, বাৎসরিক ডোনেশনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে অনেকে। স্কুল শুরু হতে না হতে মোটা সরকারি গ্র্যাণ্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছে স্বয়ং গভর্নর—অন্যদিকে কালিম্পঙের মিশনও কম টাকা ঢালেনি—পরেও লাগাতর সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে সেই মিশন।

মেলিণ্ডা জারভিসের ডাক পেয়েও দিদিমার নামের স্কুলে এসে লাগিনি শুধু আমি।

কারণ, আমার সেই উনিশ বছরের জীবনে মেলিণ্ডা জারভিস তখন

সব থেকে বড় শত্রু হিসেবে চিহ্নিত। দুর্জয় রাগে আর অভিমানে মেলিণ্ডা জারভিসের মুখ দেখতেও সত্যি আপত্তি তখন। সেই রাগ আর অভিমানের কিছুটা খবর রাখত শুধু গ্র্যাণ্ড জেরি। গ্র্যাণ্ডিকে কালিম্পঙের স্কুলে মেলিণ্ডা জারভিস বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। সে ওই স্কুলে প্রিন্সিপাল হবার পর সকলের ডিসিপ্লিন বোধটাই সব থেকে বড় করে তুলতে চেয়েছিল। তুলেও ছিল। কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিসের সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গ্র্যাণ্ড জেরিকে নিয়ে। কারণ, গ্র্যাণ্ডিরও খামখেয়ালিপনা বেড়েই চলেছিল। একদিন তো বোর্ডে ডিসিপ্লিন বায়ুগ্রস্থ প্রিন্সিপালের একখানা মজাদার কার্টুন এঁকে মেয়েদের বলেছিল, আঁকো।

আমি তখন সেই ক্লাসের ছাত্রী। শুধু মেয়েদের কেন, সেই কার্টুন দেখে আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা। কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ড থেকে সেটা মোছা হয়নি। স্কুলসুদ্ধু ওই কার্টুনের কথা রটে গেছল। অন্য ক্লাসের মেয়েরা ছোটাছুটি করে এসে সেই কার্টুন দেখে গেছে। তারপর একে একে দেখেছে টিচাররা। হাসি পেলেও সাহস করে কেউ হাসতে পারেনি। কিন্তু সকলের হাসির বান ডেকেছিল প্রিন্সিপাল মেলিণ্ডা জারভিস স্বয়ং এসে সেই কার্টুন দেখে হেসে ফেলার পর। সকলের কাছে সে কার্টুনটার খুব প্রশংসা করেছিল। কিন্তু আমার ধারণা সেই হাসি বা প্রশংসা দুইই ডিপ্লোম্যাটিক।

গ্র্যাণ্ড জেরিকে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আনার কম চেষ্টা করেনি মেলিণ্ডা জারভিস। অনেক বলেছে, অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু নিয়মানুবর্তী হওয়া যার কোষ্ঠীতে নেই, তার গলায় নিয়মের শেকল পরানো যাবে কি করে? শেষে একদিন সোজা বলেছে, এ-ভাবে চলতে পারে?

গ্র্যাণ্ড জেরি হেসে জবাব দিয়েছে, চলতে পারে না এটা যে এত-দিনে বুঝেছ সে-জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

এ-সব খুঁটিনাটি খবর আমাকে বলত মেলিণ্ডা জারভিসের ভাইপো রয় জারভিস।

গোড়ায় গোড়ায় কলিম্পঙের সকলে ভেবেছে গ্র্যাণ্ড জেরির মতো মানুষের ওপরেও নির্দয় হয়ে ডিসিপ্লিন-বায়ুগ্রস্ত প্রিন্সিপাল তার চাকরিটা খেয়ে দিলে। সকলের বেলায়ই কি ছকে-বাঁধা ডিসিপ্লিন খাটে? সে কত বড় শিল্পী আর কত বড হৃদয়ের মানুষ জেনেই তো এতকাল সকলে তাকে বরদাস্ত করেছে! কিন্তু না, এর পরেও মেলিণ্ডা জারভিস সত্যিই গ্র্যাণ্ডির ওপর নির্দয় হতে পারেনি। সে শালজুড়িতে এসে থাকতে চায় শুনে নিজের এখানকার বাংলোর গোটা এক তলাটাই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই একতলার সব থেকে বড় ঘরটাকেই তার স্টুডিও করে দিয়েছে। তার খাওয়া-দাওয়া আর অন্য সব ব্যবস্থার জন্য একটা কমবাইন্‌ড্ হ্যাণ্ড পর্যন্ত রেখেছে। তার পরের দশ বছর ধরে গ্র্যাণ্ডি এই শালজুড়িতেই আছে।

গ্র্যাণ্ড জেরিকে স্কুল থেকে সরিয়ে দেবার ফলে স্কুলসুদ্ধু মেয়ের মুখেই শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। কিন্তু শেষ বিদায়ের দিনেও সকলকে সে হাসিয়ে গেছে। সম্বর্ধনা সভায় একখানা ব্ল্যাক বোর্ড আনিয়ে রঙ-বেরঙের খড়ি দিয়ে নিজের এক অদ্ভুত সুন্দর কার্টুন এঁকেছে। তলায় লিখেছে, গ্র্যাণ্ড লিবারেশন অফ জেরি গ্র্যাণ্ড!

···কার্টুনের বিষয়, অদ্ভুত-দর্শন গ্র্যাণ্ড জেরি চলে যাচ্ছে। পিছনে দু'হাতে নিয়মের শেকল পরে তার দিকে করুণ চোখে চেয়ে আছে আমাদের ডাকসাইটে প্রিন্সিপাল মেলিণ্ডা জারভিস!

আমার তখন দারুণ মন খারাপ হলেও একমাত্র সান্ত্বনা, গ্র্যাণ্ডি শালজুড়িতে থাকবে। উইক এণ্ড-এ এলেই তাকে দেখতে পাব। পরে বুঝেছি, আমার পক্ষে অন্তত সেটা শাপে বর হয়েছিল। কারণ, আমার আঁকার আসল শিক্ষাটাই তখন থেকে শুরু। মেলিণ্ডা জারভিস উইক-এণ্ড-এ আসত না, কেবল ভেকেশনে আসত। ওদিকে আমি তো প্রতি সপ্তাহে বাবা মায়ের কাছে আসতুমই। কিন্তু তাদের কাছে আর থাকতাম কতক্ষণ? সকাল দুপুরের বেশির ভাগ কাটত মেলিণ্ডা জারভিসের বাংলোয় অর্থাৎ গ্র্যাণ্ডির একতলার স্টুডিও ঘরে। তার সঙ্গে অথবা সে না থাকলে একাই আমি রঙ তুলি বা খাতা

পেন্সিল নিয়ে বসে যেতাম। গ্র্যাণ্ডিকে শেখাতে বললে ধমক খেতাম। বলত, শেখার কি আছে, শুধু এঁকে যাওয়াটাই শেখা। লিখতে লিখতে লেখা, পড়তে পড়তে পড়া, আর আঁকতে আঁকতে আঁকা—ব্যস।

কিন্তু মুখে যা-ই বলুক, আমার খাতার বা ড্রইং পেপারের আঁকার ওপর কখনো-সখনো পেন্সিল বা তুলির একটু আধটু খোঁচা যা দিত তাতেই আমার চোখের সামনে থেকে এক-একটা পর্দা সরে যেত। কিন্তু তারিফ করার বেলায় লোকজনের সামনেই গ্র্যাণ্ডি মুখখানা এমন করে তাকাতো যেন আমার মতো বড় আর্টিস্ট সে আর জীবনে দেখেনি।

কিন্তু সেই উনিশে আমি আর এক মেয়ে। ভেতরে কেবল জ্বলছি জ্বলছি আর জ্বলছি। ফুঁসছি ফুঁসছি আর ফুঁসছি। সিনিয়র কেমব্রিজের পরে মেলিণ্ডা জারভিসের কাছ থেকে আগনেস কটেজে এসে কাজে লাগার আমন্ত্রণে আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। হাঁ বা না জবাব পর্যন্ত না দিয়ে আমি তলায় তলায় নিজের ব্যবস্থা করলাম। অনেক মানসিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ বেশ ভালোভাবেই পাশ করেছিলাম। মেলিণ্ডা জারভিসকে একটা খবর পর্যন্ত না দিয়ে কলকাতায় এসে সেণ্টজিভিয়ার্স কলেজে ফিলসফি অনার্স নিয়ে বি, এ পড়া শুরু করে দিলাম।

মনের যা অবস্থা তখন, মেলিণ্ডা জারভিসের মুখ দেখতে হবে বলে আমার আর শালজুড়িতেই যাবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু ভেকেশনে তো বোর্ডিংসুদ্ধু বন্ধ, না গিয়ে উপায় কি। নিজের মা আমার কোনদিনই আপনার একাত্ম জন হয়ে উঠতে পারেনি। কেবল যা একটু টান বাবার ওপর। আর দারুণ টান গ্র্যাণ্ডির ওপর। ভেকেশনে গেলেও মেলিণ্ডা জারভিসকে এড়িয়ে চলতাম। সে আগনেস কটেজে এলে আমি যেতাম গ্র্যাণ্ডির সঙ্গে দেখা করতে। আমার আচরণে মেলিণ্ডা জারভিস খুব ভালো করেই বুঝত আমি তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছি। সে-ও ভাবখানা এমন দেখাতো যেন আমি ভেকেশনে এলাম কি এলাম না খবরই রাখে না। গ্র্যাণ্ডির মুখে খবর যে পায় জানা কথাই। অথচ

গ্র্যাণ্ডির কাছে শুনি, তার 'দ্য বীগ্ লেডি'র আমার জন্য নাকি ভাবনার অন্ত নেই। তাকে নাকি বলে, মেয়েটা ভিতরে ভিতরে এত গোঁয়ার জানতাম না—অনেকটা ওর দিদিমা আগনেসের মতো…। তার ভয়, এ-ভাবে নিজের মর্জিতে চলে আমি না শেষে আমার মায়ের মতো হয়ে যাই।

শুনে আমার মনে হয়েছিল, আ-হা, এমন যদি হত মেলিণ্ডা জারভিস কোনো সন্ধ্যায় আমার খোঁজে আমাদের বাড়ি এসেছে, আর আগে থাকতে আমি সেটা টের পেয়ে মায়ের হুইস্কির বোতল থেকে বেশ খানিকটা ঢেলে নিয়ে চুকচুক করে খাচ্ছি (যা আমি ঘৃণায় কখনো স্পর্শও করি না—ঘৃণাটা মায়ের জন্যে), আর মেলিণ্ডা জারভিস ঘরে ঢুকেই সেই দৃশ্য দেখে থ' মেরে দাঁড়িয়ে গেছে…তাহলে? তাহলে আমি একটু অপ্রস্তুত হবার অভিনয় করে উঠে দাঁড়াতাম, কিন্তু বুঝিয়ে দিতাম যে দু'পায়ের ওপর ভর করে আমার দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে---আর লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলতাম, একটু রিল্যাক্স করছি। …আ-হা, সত্যি যদি এমন হত, সে চলে যাওয়ার পর আমি আনন্দে নাচতাম। কারণ, মদ মেলিণ্ডা জারভিসের দু'চক্ষের বিষ। আর মেয়েদের মদ খেতে দেখলে তার ফর্সা মিষ্টি মুখখানা (এই বয়সেও মিষ্টি) কঠিন পাথর হয়ে যায়। মা যদি মদ না খেতো তার অনেক দোষ ত্রুটি হয়তো সে ক্ষমার চোখে দেখত।

…বি, এ অনার্স পড়ার তৃতীয় বছরের বা শেষ বছরের ভেকেশনে শালজুড়িতে এসে আমি বড় রকমের একটা ধাক্কা খেলাম। আর সেই ধাক্কাটা খেলাম আমার গ্র্যাণ্ডির কাছ থেকে।

মেলিণ্ডা জারভিসের অনুপস্থিতিতে এক দুপুরে জেরির স্টুডিওতে গেছি। গ্র্যাণ্ডির গোঁপ দাড়ির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উচ্ছ্বাস বোঝা যায় না। যেটুকু উচ্ছ্বাস তা কেবল চোখে। আমাকে দেখে বলল, আয়, তুই এসেছিস আমি খবর পেয়েছি।

সবে আগের সন্ধ্যায় এসেছি। বলতে গেলে কেউই তখনো জানে না। জিগ্যেস করলাম কে খবর দিলে?

—কেন, দ্য বীগ্ লেডিই তো বলল···।

এবারে আমি যথার্থ অবাক। পরে ভাবলাম রাতে ক্লাব থেকে ফেরার পথে হয়তো বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। মা তো মেলিণ্ডা জারভিসের সঙ্গে কথাই বলে না। কিন্তু পরে বাবাকে জিগ্যেস করে জেনেছি তার সঙ্গেও দেখা হয়নি। তারপর অবশ্য খেয়াল হয়েছে, মীনা মাসির কাছ থেকে জেনে থাকতে পারে আমি কবে আসব। কারণ, বাংলায় চিঠি লেখার তাগিদে একমাত্র ওই মহিলাকে আমি মাসে একটা-দুটো লম্বা চিঠি লিখি। শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম, কবে পর্যন্ত আসতে পারি। কিন্তু মীনা ডাকুয়া নিজে থেকে যেচে ওই জাঁদরেল মহিলাকে আমার আসার খবর দিয়েছে এমন মনে হল না। কারণ, আমার ক্ষোভের ব্যাপারটা ততদিনে মীনা মাসিও অনেকটাই আঁচ করেছে। মেলিণ্ডা জারভিস যদি জেনে থাকে নিজের আগ্রহেই জেনেছে।

যাক, ধাক্কার ব্যাপার সেটা নয়। গ্র্যাণ্ডি আমাকে ঘটা করে খানিক দেখে নিল, তারপর চুকচুক করে গলা দিয়ে দুই-একটা লোভের শব্দ বার করল।

আমি হেসেই জিগ্যেস করলাম, কি হল ?

তেমনি চেয়ে থেকে গ্র্যাণ্ডি সখেদে ফিরে জিগ্যেস করল, কলকাতায় কি পুরুষ মানুষ নেই ?

আমি বললাম, লাখে লাখে আছে—কেন ?

—থাকলে তুই এমন আস্তটি আছিস কি করে ?

এমন ঠাট্টা গ্র্যাণ্ডির মুখেই মানায়।

এ-কথা সে-কথার পর আমি জিগ্যেস করলাম, ভালো কি আঁকলে বার করো।

সোৎসাহে গ্র্যাণ্ডি বলল, এবারে একটা দারুণ ছবি এঁকেছি, দাঁড়া, দেখাই—

কাঁচের আলমারি খুলে দেড়-হাত প্রমাণ একটা গোটানো মোড়ক বার করল। তারপর ওটা খুলে মস্ত একটা ছবি টান করে ইজেলে

আটকে দিল। সেটা দেখেই ধাক্কা।

…ছবির বিষয়, একটা মেয়ের চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জ্বলন্ত আগুন বেরুচ্ছে। সত্যিকারের আগুন। আর সেই আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে একটা মেয়ে।

…যে মেয়েটার চোখ নাক দিয়ে অমন জ্বলন্ত আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে সেই মেয়েটা আমি।

আর, যে মেয়েটা সেই আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, সেই মেয়েটাও আমিই।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার মুখে কোনো কথা নেই। আর জেরির লম্বা পাকা দাঁড়ি গোঁপ বেয়ে হাসি চুঁয়ে পড়ছে।

আমার সমস্ত মুখ কঠিন।

—কেমন? দারুণ না?

—দারুণ। আইডিয়াটা বোধহয় ম্যাডাম জারভিসের কাছ থেকে পেয়েছ? আমার গলার স্বরও কঠিন।

—সে কি রে! চোখে মুখে বিস্ময় উপছে পড়ল।—মাথা খাটিয়ে এমন একখানা আঁকলাম, আর তুই কিনা সে-ক্রেডিট ঢ্য বাগ্ লেডিকে দিয়ে ফেললি, সে তো এটার খবর এখন পর্যন্ত জানে না!

এ-কথায় ভেতরটা একটুও ঠাণ্ডা হল না। মেলিণ্ডা জারভিসের ওপর আমার ক্রোধ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। দশ বছর যাবত গ্র্যাণ্ডি এখানে পড়ে আছে। কালিম্পঙের কোনো ঘটনাই তার জানার কথা নয়। অবশ্য আমার ভিতরের উষ্মা আর প্রচণ্ড ক্ষোভ গোপন ছিল না। মেলিণ্ডা জারভিস আমার ওপর কত অন্যায় আর অবিচার করেছে সে-আভাস গ্র্যাণ্ডিকে আমিই দিয়েছি। চেয়েছি তার মুখ থেকে ওই মহিলা শুনুক। আমার আর কি করবে, সিনিয়র কেমব্রিজ হয়ে গেলেই আমি তার নাগালের বাইরে। কিন্তু গ্র্যাণ্ডি এ কি ছবি এঁকেছে!…একটা মেয়ে তার নিজের তৈরি আগুনে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছে! নিজের তৈরি আগুন? মেলিণ্ডা জারভিস তাকে তাই না বোঝালে সে এমন ছবি আঁকবে কেন?

আমি দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে এসেছি। কিন্তু কিছুটা ঠাণ্ডা হবার পর ভিতরে একটু খটকা লেগেছে। গ্র্যাণ্ডিকে আমি তুখোড় বুদ্ধিমান ভাবি। এই ভাবনায় কোনো ভুল নেই তা-ও বিশ্বাস করি। অন্যদিকে গ্র্যাণ্ডি আমাকে কত ভালবাসে তা-ও অনুভব করি। আমার মনোভাব তার কাছে ব্যক্ত করার পরেও এমন ছবি আঁকল কেন? মেলিণ্ডা জারভিস যা-ই বোঝাক, সে তো কারো কথায় অন্ধ হয়ে কিছু করার লোক নয়! সে মেলিণ্ডা জারভিস হোক আর যে-ই হোক।...তাহলে গ্র্যাণ্ডি নিজের তৈরি আগুনে জ্বলছি এটা বিশ্বাস করল কি করে? ওই ছবি দেখে আমি ধাক্কা খাব, ঘা খাব জেনেও ওটা আঁকল কি করে?...ঘা খেয়ে ধাক্কা খেয়ে আমি সচেতন হব এটাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু কেন? মেলিণ্ডা জারভিস সম্পর্কে আমার ধারণায় বা বিবেচনায় কোথাও ভুল থেকে গেছে?

বাইশ বছর বয়সে বি, এ পাশ করার পর এম, এ পড়ার ইচ্ছে ছিল। সেটা হল না মায়ের জন্য। তার তখন মাথায় বিকৃতি দেখা দিয়েছে। তাকে আগলে রাখা আমার জেণ্টলম্যান বাবার কর্ম নয়। বন্ধু-বান্ধবারা সকলেই তখন মাকে ছেড়েছে। এক মেলিণ্ডা জারভিস আর মীনা ডাকুয়া ছাড়া। মায়ের তখন দুর্নামের টি-টি, আর সকলের মুখে কেবল ছি-ছি। তাকে নিয়মিত দেখতে আসত শুধু মেলিণ্ডা জারভিস। তখনো আমার ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়নি। কিন্তু অস্বীকার করতে পারব না, অমন প্রশান্ত স্নিগ্ধ মূর্তি আমি জীবনে আর দেখিনি। মনে আছে, তাকে দেখলেই আমার মা যাচ্ছেতাই গালাগাল করত, বাড়ি থেকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাইত। কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিস কান দিত না। গোপনে বাবার হাতে টাকা গুঁজে দিত। শিলিগুড়ি বা দার্জিলিঙে কোনো ভালো ডাক্তার এসেছে খবর পেলে নিজে গিয়ে তাকে ধরে এনে মা-কে দেখাতো। এই সময় থেকে আমার নিজের ভিতরের সংশয় বাড়ছিল। এমন কি হতে পারে তার সম্পর্কে আমার বিচার বিবেচনায় সত্যি বড় রকমের কিছু ভুল থেকে যাচ্ছে?

আমার বয়স তখন তেইশে গড়িয়েছে। ছেলেদের মধ্যে বাড়িতে যারা মা-কে দেখতে আসে তারা কোন্ টানে আসে বুঝতে পারি। মায়ের সমবয়সী বা প্রৌঢ় বন্ধু-বান্ধবের আনা-গোনা যেমন কমেছে, চা-বাগানের বা ফরেস্ট অফিসের চাকুরে-ছেলে ছোকরাদের ভিড় ততো বাড়ছে। তাদের মধ্যে চালচলনে যারা খাঁটি সাহেব, মায়ের কেবল তাদেরই পছন্দ। প্রায়ই বলে, ওমুক ছেলেটার সঙ্গে একটু মেলামেশা করে ভ্যাখ্ না, ভালো লাগতেও তো পারে। আমার তক্ষুনি সন্দেহ হয়, ওমুক ছেলে চুপি চুপি মা-কে বিলিতি মদের যোগান দিচ্ছে কিনা। জীবনে কেবল একজন ছাড়া আর কোনো পুরুষের জায়গা হবে এমন বিশ্বাস আমার তখন ছিলই না।

তখনো নিয়মিত না হোক, ফাক পেলে আমি দুপুরের দিকে গ্র্যাণ্ডির কাছে চলে আসতাম। মায়ের তখন একটু বাড়াবাড়ি চলছিল বলে দুপুরে কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আর রাতে ঘুমের ইন-জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত। রঙিলাকে মায়ের ঘরে বসিয়ে দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়তাম। বাবার অফিস থেকে ফিরতে বিকেল, কোনদিন বা সন্ধ্যা। আমি বিকেলে বাবা আসার অনেক আগেই ফিরে আসতাম।

কথায় কথায় সেদিন গ্র্যাণ্ডি বলল, তোর মায়ের ভোগ ঠেকাবে কে, মানুষের সকলের বড় শত্রু সে নিজেই।

আমি জবাব দিলাম, মানুষের যদি বলো তাহলে শুধু মায়ের কেন, তোমারও তো বড় শত্রু তুমি নিজে।

—একেবারে খাঁটি কথা বলেছিস। দাড়ি চুঁয়ে হাসি উছলে পড়ছে। কত রকম ভাবি জানিস, ধর আমার বয়েসটা যদি হঠাৎ তিরিশের মধ্যেও হত, তুই পার পেতিস? চুলের ঝুঁটি ধরে তোকে আমার খাস দখলের মধ্যে নিয়ে আসতাম।

মায়ের জন্য সর্বদাই মন মেজাজ খারাপ থাকে। গ্র্যাণ্ডির কাছে দু'দণ্ড বসলে আর এমন কথা শুনলে ভেতরটা আপনি তাজা হয়ে

যায়। হেসে বললাম, চুলের ঝুঁটি ধরে খাস দখলে আনার মতো জোরের লোক দেখলে আমি অন্তত তাকে শত্রু ভাবতাম না।

—তা ভাববি কেন, তোরও সব থেকে বড় শত্রু যে তুই নিজেই।

কি মতি হল আমার কে জানে। ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মেলিণ্ডা জারভিস নয় কেন?

মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু চোখের তারায় কৌতুক। তার পরেই খাপছাড়া একটা প্রশ্ন, হ্যাঁ রে শেইলা, স্বর্গ নরকের হদিস তো তুই পেয়েই গেছিস, তাই না?

একটা কথা বলতে ভুলেছি। এখানকার সব অবাঙালীর মুখে আমি শেইলা শীলা নয়। নামের বানান, অর্থাৎ এস্ এইচ ই আই এল এ কে সকলে শেইলা করে নিয়েছে। আমার মা ইভা স্মিথ পর্যন্ত। কেবল বাবা আর মেলিণ্ডা ডাকে শেলু। বাবার মুখে ওই ডাক ভালোই লাগে, কিন্তু অন্য জনের মুখে ওই নাম শুনলে পিত্তি জ্বলে। না, আর একজনও আছে, বাবার দেখাদেখি তার বন্ধু মানা ডাকুয়ার স্বামীও দেখা হলে শেলু শেলু করে।

গ্র্যাণ্ডির কথার জবাবে ফিরে জিগ্যেস করলাম, কি রকম?

হাতের পেন্সিলটা নিজের অগোচরে একটা সাদা কাগজে কি রকম হিজিবিজি আঁচড় ফেলছে। জবাব দিল, সীনিয়র কেমব্রিজের আগে কালিম্পঙে যখন খুব ফুর্তি করে বেড়াতিস, ভাবতিস স্বর্গ একেই বলে, আর এখন যে-মন নিয়ে আছিস ভাবছিস নরক একেই বলে—এই রকম আর কি।

একটা চাপা ক্ষতর ওপর যেন খোঁচা লাগল একপ্রস্থ। ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলাম, ভাবাভাবির কি আছে, যা ঠিক সব সময় তা-ই ঠিক। ওই মহিলার ওপর তোমার বরাবর পক্ষপাতিত্ব তাই সত্যি কথা শুনলে বরদাস্ত করতে চাও না।

…মেলিণ্ডা জারভিসকে নিয়েও এই মানুষ কম রসিকতা করত না, খোঁচা দিয়ে কম কার্টুন আঁকত না। এমন সাহস কালিম্পঙে বা

শালজুড়িতে এই একজনেরই। তবু এই ব্যঙ্গোক্তি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

গ্র্যাণ্ডির গোঁপ দাড়ির জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে আবার সেই হাসি। জবাব দিল, সেই জন্যেই বলছিলাম সকলের সব থেকে বড় শত্রু সে নিজেই। যে তোর সব থেকে আপনার জন আর ভালবাসার জন তাকেই আজ তুই শত্রু ভাবছিস—তোর ওপর তার কত মমতা এ যেদিন টের পাবি সেদিন কেঁদে ভাসাবি।

হ্যাঁ, আমাকে থমকাতে হল বইকি। যদিও জানি, আমার কত বড় ক্ষতি মেলিণ্ডা জারভিস করে দিয়ে গেছে গ্র্যাণ্ডির সেটা সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। এক আমি ছাড়া কারোরই ধারণা করা সম্ভব নয়। এমন কি মেলিণ্ডা জারভিসেরও নয় ...তবু এই রকম অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে গ্র্যাণ্ড জারভিস এ-কথা বলল কি করে! এ-রকম কথা তো তার মুখে আর কখনো শুনিনি।

ঘরে ফিরতে সেদিন একটু দেরিই হয়ে গেল। আসতে আসতে অন্যমনস্কের মতো গ্র্যাণ্ডির কথাগুলোই-ভাবছিলাম।...আমার ভিতরে ক্ষত চাপা পড়ে আছে। কিন্তু তার ওপর সম্প্রতি একটু নতুন প্রলেপ পড়ছে। আমার এই জীবনের আঙিনায় আর একজনের ছায়া পড়ছে। তার পদক্ষেপ ঘটবে কি ঘটবে না সেটা অবশ্য আমার ওপরেই নির্ভর করছে। আগের মতোই স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটেই যাব, না এই নতুন স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দেব সেটা এখনো একেবারে স্থির করে উঠতে পারিনি। তবু যে কারণেই হোক, বা, গ্র্যাণ্ডির আকা নিজের তৈরি আগুনে নিজে জ্বলতে থাকার ছবি দেখে হোক, অথবা আজ এই রকম শুনে হোক মেলিণ্ডা জারভিসের ওপর ভিতরটা আর অত অকরুণ ক্ষিপ্ত হয়ে নেই সেটুকু অনুভব করছিলাম।

দোর গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। এই দৃশ্য দেখব ভাবিনি। মা তখনো খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। পাশে একটা মোড়ার ওপর বসে মেলিণ্ডা জারভিস। স্থির নিশ্চল প্রার্থনারত মূর্তি—ছ'হাত কোলের ওপর জড়ো করা।

মেলিণ্ডা জারভিসের এই প্রার্থনার ভঙ্গি আমার খুব চেনা। ঘরে আর তৃতীয় কেউ নেই। জুতো বাইরে খুলে পা-টিপে ভিতরে এলাম। মেলিণ্ডা জারভিস টের পেল না। দু'চোখ বোজা।

আমি বোবার মতো দাঁড়িয়ে। অনেকদিন বাদে এই প্রথম মনে হল, মহিলার বড় রকমের একটা ভুল হতে পারে, যে ভুলের কারণে আমার বুকের তলায় অনেক রক্ত নিশ্চয় ঝরেছে—কিন্তু এই মহিলা স্বেচ্ছাচারিণীর মতো অকরুণ নির্মম নিষ্ঠুর হয়তো সত্যিই হতে পারে না।

খানিক বাদে চোখ মেলে তাকালো। আমাকে দেখল। একটুও শব্দ না করে উঠে দাঁড়ালো। খুব সন্তর্পণে পা-টিপে বাইরে এলো। আজ নিজের অগোচরে আমিও এলাম।

মৃদু গলায় মেলিণ্ডা জারভিস বলল, এখন তো একটু ভালোই মনে হচ্ছে··· ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। আগের থেকে একটু ভালো। না জিগ্যেস করে পারলাম না।—আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

—তা কিছুক্ষণ। দেখলাম রঙিলা একলা বসে আছে, তাকে সরিয়ে একটু বসলাম।

কাঠের সিঁড়ি ধরে নিচে নামছে। পিছনে আমিও।—বললাম, গ্র্যাণ্ডির কাছে গিয়ে খানিক বসেছিলাম।

—জানি। ঘুরে দাঁড়ালো। একটু মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখল। ঠাণ্ডা মৃদু গলায় বলল, রোগী নিয়ে দিন-রাত এ-রকম ঘরে বসে কাটালে শরীর থাকবে?

আমি হেসেই বললাম, কেন, শরীর খারাপ দেখছেন?

জবাব দিল না। চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। আমার ভুল কিনা জানি না, মনে হল তার নীলাভ চোখের গভীরে কি এক অব্যক্ত আকুতি দেখলাম। ঠাণ্ডা সুরে বলল, আমি খুব ভালো এ নিজে কখনো বলিনি, তোরাই ভাবতিস। তোর সে ভুল ভেঙেছে দেখতে পাচ্ছি।···তা আমি যেমনই হই, তোর দিদিমা আগনেস কি দোষ

করল, তার নামে তার আদর্শের স্কুল, আমি এটা করার উপলক্ষ মাত্র—তোর দিদিমার স্কুল তোকে পাবে না ?

ভিতরে নাড়াচাড়া খেলাম একপ্রস্থ। ভুল ভেঙেছে না একটা ভুল নিয়ে বসে আছি সে-সম্বন্ধে আমি কেন যেন নিশ্চিত হওয়া গেল না। হেসেই বললাম, আপনার স্কুল তো এগারোটা থেকে চারটে··· মা'কে সামলে আমি সময় পাব কি করে ?

দু'চোখে আগ্রহ উপছে উঠল। বলল, দুপুরের দিকে তো সময় হয়, আমি যদি সে-রকম ব্যবস্থা করে দিই ?···এত ভালো আঁকিস তুই, অথচ স্কুলে আমার একটা আঁকার টিচার নেই বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা আঁকার ভেতর দিয়েই সব থেকে বেশি শিখতে পারে আর তাতে মজাও পায়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কি দরকার, আমি যদি টিফিন টাইমের পর থেকে চারটে পর্যন্ত তোর ক্লাস করে দিই ? তাহলে তো আর কোনদিক থেকে অসুবিধে থাকে না ?

আমার বিষয় ফিলসফি। তিন থেকে সাত বছরের ছেলে মেয়েদের শুধু ইংরেজি পড়াতে পারি। বাংলাও পারি, কিন্তু বাংলা হিন্দী দুইয়েরই ভার মীনা ডাকুয়া নিয়েছে। মেলিণ্ডা জারভিস এই প্রস্তাব দিল সত্যি কোনো ড্রইং টিচার নেই বলে, নাকি ওই একটি বিষয় আমার সব থেকে পছন্দ হবে সেটা বুঝেই ?

মেলিণ্ডা জারভিস এমনভাবে চেয়ে আছে যেন আমার একটা হাঁ বা না-এর ওপর বিরাট কিছু নির্ভর করছে। সম্মতি দিয়ে ফেললাম, বললাম, আপনি দয়া করে এই ব্যবস্থা করলে আমার আর আপত্তি কি···।

সেই থেকে আগনেস কটেজের আমি ড্রইং টিচার। সাড়ে বারোটায় যাই, চারটেয় ছুটি। মেলিণ্ডা জারভিস আজ আর এ জগতে নেই। কিন্তু তার ব্যবস্থার রদবদল আজও হয়নি। অন্য টিচারদের মতোই ভালো মাইনে পাই, অথচ আমার কাজ কর্ম, হাজিরা দেরিতে- এ নিয়ে কারো কোনরকম অভিযোগ নেই। কত

দিন হয়ে গেল, আমার মা-ও এই দুনিয়ায় নেই আর। তবু কেউ আমাকে কখনো বলেনি, স্কুলের সময় ধরে এসো, ড্রইং-এর সঙ্গে ছেলে মেয়েদের অন্য কিছু বিষয় পড়াও। আমিই বরং মীনা ডাকুয়ার কাছে সে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সে এখন ওই স্কুলের কর্ত্রীস্থানীয়াদের একজন। মীনা ডাকুয়া জিগ্যেস করেছিল, তোমার তাই ভালো লাগবে?

আমি অকপটে সত্যি কথাই বলেছিলাম। একটুও ভালো লাগবে না—যেমন আছি তার থেকে ভালো আর আমার কিছুই লাগবে না।

···সকলেই জানে, গ্র্যাণ্ড জেরির স্টুডিও এখন আমারও স্টুডিও। সময় পেলেই বুড়োর সঙ্গে বসে আঁকার কত রকমের প্ল্যান করি। মেলিণ্ডা জারভিসের ওই বাংলো এখনো গ্র্যাণ্ড জেরির—এরপর ওটা আমারই হবে জানা কথাই। আর মনে মনে ঠিক করেছি, গ্র্যাণ্ড জেরির পরে স্কুলের সমস্ত আঁকার ক্লাসটাই ওই বাংলোর দোতলায় তুলে আনব। যাক, গ্র্যাণ্ডি একশ বছর বাঁচুক। আমার কথা শুনে মীনা ডাকুয়া সদয় হয়ে বলেছিল, তোমার দিদিমার নামে স্কুল, মেলিণ্ডা জারভিসের ব্যবস্থা—তোমাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না, ঘামালেও স্কুল কমিটি সেটা বরদাস্ত করবে না তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

ঘর গেরস্থালী গোছগাছ করার পর আমি যে স্কুলের খাতা নিয়ে বসি তা ছেলেমেয়েদের ওই আঁকার খাতা। ক্লাসের টাস্ক ছাড়াও ওদের বলি খেয়াল খুশিমতো যা-হোক বাড়ি থেকে এঁকে নিয়ে আসতে। ওরা মনের আনন্দে কত কি আঁকে। ওদের উৎসাহ দেবার জন্যেই সে-সব যত্ন করে দেখি। নতুন কিছু এঁকেও দিই।

এই দেখার ফাঁকে স্কুলের জন্য একেবারে তৈরি হয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বিলি জুতোর মচ-মচ শব্দ তুলে রোজ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। বাইরের জুতো নিয়ে শোবার ঘরে ঢোকা পছন্দ করি না আগেই বলেছি। ওর সাড়া পেলে খাতা ফেলে আমি বেরিয়ে আসি। হাঁটু মুড়ে সামনে বসে দু'হাত ওর কাঁধে রাখি। নইলে ও আমার গালের নাগাল পাবে কি করে। আমি প্রথমে আলতো করে ওর এক

গালে একটা চুমু খাই। জবাবে বিলিও আমার এক গালে নামমাত্র ঠোঁট ছোঁয়ায়। আমি তখন দ্বিতীয় গালে চেপে চুমু খাই। বিলিও তাই করে—চেপে চুমু খায়। এমনি খানিক চুমোচুমি চলে। তারপর গা ঝেড়ে আমাকেই আগে উঠতে হয়। যা, ভাগ্ এখন,-স্কুলের সময় হয়ে গেছে।

ও ছুট লাগায়।

...কিন্তু আজ? আজ আমি কি করলাম। বত্রিশ বছরের শীলা ডেটন পাগলের মতো আজ এ কি করে বসল!... ছ' বছরের ছেলেটা-ধপধপে সাদা শার্ট শর্টস পরে জুতো মোজা চাপিয়ে দেহের সব আঘাত ঢাকতে পেরেছে। ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে ওকে ধরি, বুকে-জড়িয়ে ওকে ঘরে নিয়ে আসি, বলি আজ আর তোকে স্কুলে যেতে হবে না।

...কিন্তু সামনে খাতা রেখে আমি স্থাণুর মতো বসে রইলাম। ওকে চলে যেতে দেখলাম। ওর সমস্ত শরীরের যন্ত্রণা আমি বুক দিয়ে অনুভব করেছি। ও করুণ চোখে আমাব দিকে একবার তাকিয়ে টলতে টলতে কাঠের সিঁড়ির রেলিং ধরে নেমে গেল। আমি নড়তে পারলাম না। ডাকতে পারলাম না।

শুধু আজ নয়, গত ছ'মাস ধরেই আমার ভিতর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে চলেছে এই ছোট্ট ছেলেটাও টের পেয়েছে। চুমু খাওয়া-খাওয়ি ব্যাপারটা ইদানীং নিছকই আনুষ্ঠানিক গোছের হচ্ছিল। বিলি চেষ্টা করেছে আগের মতো মজাদার কিছু করতে। এক-একদিন শক্ত করে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, কিন্তু তার জবাবেও আমার রাজ্যের বিরক্তি। ও জানে না চোখের সামনে আমার গোটা জগৎ গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, ধুলো হয়ে যাচ্ছে। আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে বলতাম, যা এখন, ভালো লাগে না।

আমি জানি ওর ছোট্ট বুকের তলায় রাজ্যের বিস্ময় জমাট বাঁধছে। ও ভেবে পায় না মায়ের হঠাৎ কি হল। অথচ মাত্র ছ'মাস আগে কি আনন্দের মধ্যে না দিন কাটছিল। কত হৈ-চৈ কত ফুর্তি। তারপর মায়ের সঙ্গে বাবার কি গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। ওইটুকু ছেলে হাঁ

করে দু'জনের দিকে চেয়ে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করত হঠাৎ এমন কেন হল। তারপর মা হঠাৎ গুম, একেবারে গুম কেন! আর বাবার মুখে শেলাই।...তার ঢের আগে আংকল কাউল এসেছিল। কি সুন্দর বিরাট গাড়ি তার। সেই গাড়িতে কত বেড়ালো তারা। আংকল কাউল ওকে কত কি জিনিস দিল। তারপর হঠাৎ কি হল যে মায়ের একেবারে পাথর মূর্তি। আর বাবা কি-রকম যেন ভয়ানক অশান্ত। অবশ্য একমাত্র ওর বাবাই কোনো সময় কোনো আনন্দের মধ্যে যোগ দিতে পারেনি। তাই দেখে বিলি একদিন আমাকে জিগ্যেস করেছিল, বাবা কথা বলে না কেন, হাসে না কেন? বাবার কি হয়েছে?

জবাবে আমি ওকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে দিয়েছি। বলেছি, দু'বেলা পড়া আর বিকেলে খেলার বাইরে অন্য কোনদিকে মন দিবি তো আস্ত রাখব না।

কত যে অন্যায় করছিলাম ওইটুকু ছেলের ওপর, বুঝতাম। কিন্তু আমি কি করব। আমার ধৈর্যের পুঁজি তখন শেষ। মাথারও ঠিক ছিল না।...তারপর যে অঘটন ঘটে গেল, যার ফলে ওর আংকল কাউলের অতবড় শরীরটা থেঁতলে দুমড়ে চিরদিনের জন্য মাটি নিল, আর ওর বাবা শিলিগুড়ির হাসপাতালে যমের সঙ্গে যুঝে চলল, অথচ ওর মা আজও একটা দিনের জন্য তাকে দেখতে গেল না—সেটাই বোধহয় বিলির কাছে সব থেকে বড় বিস্ময়। কিন্তু আমার মধ্যে ও বোধহয় এমন এক নির্মম মা কে দেখে চলেছিল যে সাহস করে একটা কথাও জিগ্যেস করেনি।

...আর সেই নির্মম মা কত নিষ্ঠুর হতে পারে ও আজও বোধহয় শুধু তাই দেখে গেল।

কিন্তু আমি তো জানি বিলি আমার বুকের হাড়-পাঁজর, আমার চোখের মণি, আমার প্রাণ। আমি কি সত্যি অমন মারটা ওকে মেরেছি না মারতে পারি? আমার বিকৃতি হতে পারে, কিন্তু আমি সত্যি ওকে মারিনি। ওর মধ্যে, ওই সুন্দর ছেলের মধ্যে আমি বীভৎস কীট দেখেছি একটা, যেটাকে মেরে শেষ না করে দিলে ওকেই

কুরে কুরে খাবে একদিন, খাবেই। কিন্তু যত মারছি, আমি দেখছি ওটা কিছুতে মরে না, মরছে না। বিলি যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আমাব হুঁস নেই, আর্ত চোখে ওর নিষ্ঠুর মা-কে দেখছে আমার সেটা দেখার সম্বিত নেই, আমি পাগলের মতো সেই কীটটাকে মেরে চলেছি। শেষে আর থাকতে না পেরে আর বিষম সাহসে ভর করে রঞ্জিলা (আমাকে বাধা দিতে হলে ওর সাহসের দরকার) আমার হাত থেকে ডিকি-র সখের বেতের লাঠিটা কেড়ে নিতে চেতনা ফিরল। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম বিলি নিষ্প্রাণের মতো মাটিতে শুয়ে আছে। ওর কচি শরীবের চামড়া ফেটে ফেটে গেছে। পিঠের বুকের কোমরের হাতের পায়ের কোনো কোনো জায়গা এমন ফেটেছে যে রক্ত চুঁয়ে পড়ছে।

চোখে অন্ধকাব দেখলাম, মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। কাঠের ঘর বাড়ি সব দুলছে। বেশিক্ষণ শুয়েও থাকা গেল না। উঠে বসলাম। বিলিব কাছে ছুটে যাবার জন্য ভিতরটা ছটফট কবতে লাগল। কিন্তু নড়াচড়াব ক্ষমতাও নেই আমার। আধঘণ্টা বাদে দেখলাম বঞ্জিলা এসে আয়োডিনের শিশি আর তুলো নিয়ে গেল। আমি বোবা। ওকেও একটা কথা জিগ্যেস করতে পারলাম না।

কেন এমন হল একটু আগের থেকে বলি।...আমার সুন্দরের জগৎ আবার অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছল। বিশ্বাসের জগৎ ভেঙে খান খান হয়ে গেছল। খুব কাছেব মানুষের বা কাছের হতে পারত এমন মানুষের মধ্যে চরম কুৎসিত কদর্য বীভৎস লোভের মুখ দেখেছি। তাবা আমাকে গ্রামের আওতায় টেনে এনেছিল। আগেই বলেছি, এমন হলে আমারই ভিতরের আর একটা সত্তা জেগে ওঠে, যে কানে আশ্বাসের মন্ত্রণা দেয়। বলে সুন্দবের জগৎ বিশ্বাসের জগৎ কোথাও আছেই—সে আমাকে তখন গ্র্যাণ্ডির কাছে ঠেলে দেয়। কিন্তু এবারে একটু রকম ফের হয়েছিল। গ্র্যাণ্ড জেরি জানেও না, কোনো অঘটন বা মানসিক বিপর্যয়ের আগেই সে আমাকে কোন্ সংকল্পের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। গ্র্যাণ্ডি জানেও না সে আমাকে কোন্ আলোর

উৎসের সন্ধান দিয়েছে। সেদিকে এগোতে হলে সত্য আর সততার সিংহ দরজা দিয়ে ঢোকা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

রয় জারভিস ধূমকেতুর মতো একবার এসে আবার অদৃশ্য হবার পরে সতীশ কাউল আর ডিকির হাত ধরে সংকল্পের সেই পথেই এগিয়ে চলেছিলাম। তারপর আবার বিপর্যয় আবার অঘটন। আবার আমি সেই আলো-বাতাসশূন্য অন্ধকারের অতলে। কিন্তু এরই মধ্যে একটা আশ্চর্য শক্তি আমার ভিতরে কাজ করে চলেছিল। গ্র্যাণ্ডির পথের হদিস নির্ভুল না হলে সব-কিছু এমন তছনছ হয়ে যাবার পরেও এই শক্তির লেশমাত্র থাকত না।

খুব নিঃশব্দে সংকল্পে মন বেঁধে চলেছিলাম। দু'দিন আগে হাসপাতাল থেকে ডিকির চিঠিটা পেয়ে আমি একটা স্থির মীমাংসার দিকে এগোচ্ছিলাম। তার মধ্যে বিলি এই কাণ্ড করে বসল।

গত সন্ধ্যা থেকেই ভেতরটা একটু তিক্ত হয়েছিল। ব্যাপার আর কিছুই না, গ্র্যাণ্ডিব স্টুডিও থেকে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেছল। একটু দূর থেকে দেখি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিলির সঙ্গে আপুর কি নিয়ে কথা কাটাকাটি চলেছে। আপু সোরেন বিলিব থেকে বছর খানেকের বড় হবে, চা বাগানের এক পাহাড়ী মেশিন ম্যানের ছেলে। বিলির সঙ্গে আগনেস কটেজে পড়ে। ওই বিনে মাইনের স্কুলে নেপালী, সিকিমী, লেপচা, ভুটানী, ডুকপা, তিব্বতী, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, পাঞ্জাবী, বাঙালী, মারোয়াড়ী সব জাতি উপজাতির ছেলে মেয়েরাই পড়ে। দেশ স্বাধীন হবার এই দশ বছরের মধ্যে ইংরেজরা সকলেই চলে যায়নি— তাদের ছেলেমেয়েরাও আসে।

আমাকে কাঠের সিঁড়ি ধরে উঠতে দেখে ওরা দু'জনেই হকচকিয়ে গেল একটু। তারপর বিলিই রাগতমুখে বলল, মা আপু আমাকে চোর বলছে, আমি নাকি ওর ব্যাগ থেকে ছ' আনা দামের মাউথ অরগ্যান চুরি করেছি—ওটা বাঁশী না ছাই, আমার তার থেকে ঢের ভালো জিনিস আছে।

চোর বলেছে আর চুরি করেছে শুনেই আমার মাথা গরম হয়ে

গেল। বিলির সত্যিই দু'তিন রকমের ভালো বাঁশী আছে। এ বয়সেই ছেলে কিছুটা বাপের নেশা পেয়েছে, তার বাঁশী বাজানোর হাতে খড়ি বাপের কাছে।

আমি উষ্ণ স্বরে আপুকে বললাম, ও নেয়নি বলছে, তুই নিয়েছে বলছিস কেন ?

—ও আমার কাছ থেকে বাজাতে নিয়েছিল, তারপর ছ' আনা দিয়ে আমার কাছ থেকে ওটা কিনতে চেয়েছিল···

বিলি ভেঙচে উঠল, তারপর তোর হাতেই ওটা আমি ফেরত দিলাম না ?

আপু বলে বসল, তারপর তুই ওটা আমার ব্যাগ থেকে চুরি করেছিস—

ফের চুরি শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। শক্ত হাতে ওর বাহু ধরে জিগ্যেস করলাম, তুই নিতে দেখেছিস ?

আপু এবার শুকনো মুখে মাথা নাড়ল। দেখেনি।

তবু বিলিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই নিয়েছিস ?

—যীশুর দিব্বি বলছি মা—

—ফের ! এই দিব্বি টিব্বিগুলো ও কোথা থেকে শিখেছে জানি না। এদিকে ফিরে ঠাস করে আপুর গালে আমি একটা চড় বসিয়ে দিলাম।

ও চোখের জল সামলে ছুটে পালালো।

সেদিন মনে ছিল না, পরেরদিন চা খাবার পর একটা কথা আমার মনে পড়ল। আগের দিন স্কুলের অঙ্কের টিচার পার্বতী রাই আমাকে হেসেই বলেছিল, তোমার ছেলেটা কি দুষ্টুই না হয়েছে, নিজের সব অঙ্ক রাইট করে পাশের ছেলে মেয়েগুলোর যাতে ভুল হয় সেই রকম করে বলে বলে দিচ্ছিল। স্মিতা ঘোষ মেয়েটা একেবারে গোল্লা খেতে, রাগ করে আমাকে বলে দিল কেন অঙ্ক ভুল হয়েছে। ধরা পড়তে রাগ দেখিয়ে ওর অঙ্ক খাতায় তোমার কাছে নালিশ করে আমি নোট দিয়েছি, তুমি সেটা পড়ে একটু কড়া ভয় দেখিও তো !

রাতে মনে ছিল না, সকালে ব্রেক ফাস্টের সময় উঠে ওর পড়ার ঘরে গিয়ে ব্যাগ হাতড়ে অঙ্কের খাতাটা করলাম। কিন্তু সব ক'টা অঙ্কের 'রাইট' চিহ্ন শুধু আছে, কোনো নোট নেই। একটু পরেই বুঝলাম, বিলি সেই পাতাটাই ছিঁড়ে নিয়েছে কিন্তু শেষের দিকে সেই পৃষ্ঠার ভাঁজের দ্বিতীয় অংশ বুদ্ধি করে আর খুলে রাখেনি। এদিকের পাতা ছোঁড়ার ফলে ওদিকের সাদা পাতাটা টানতেই আমার হাতে উঠে এলো। তখনই জানি আজ ওর অদৃষ্টে মার আছে। খাতাটা আবার ব্যাগে ফিরে রাখতে গিয়ে বইয়ের ফাঁকে শক্ত মতো কি হাতে ঠেকল। টেনে দেখি আপুর সেই শস্তার মাউথ অর্গ্যান।

ব্যস, আমার মাথায় দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠল। এটা সরানোর পরেও ও যীশুর দিব্বি কেটেছিল। কান ধরে হিড় হিড় করে ওকে ব্রেক ফাস্টের টেবিল থেকে টেনে নিয়ে এলাম। প্রথমে অঙ্কের খাতাটা খুলে জিগ্যেস করলাম, মিসেস পার্বতী রাইরের নোট কোথায়?

ও মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এবারে শাড়ির আঁচলের আড়াল থেকে (আমি শেইলা বা শীলা ডেটন শাড়িই সব থেকে বেশি পছন্দ করি। আমার মতো লম্বা হৃষ্ট পুষ্ট মেয়েকে শাড়ি পরলেই যে সব থেকে বেশি মানাতো এই জ্ঞানও আমার টনটনে ছিল।) সেই মাউথ অর্গ্যান বার করে বললাম, তোর ব্যাগে এটা কি?

মুহূর্তে ওর মুখ ভয়ে আমসি একেবারে। তবু মরিয়া হয়ে ও বলে উঠল, নিশ্চয় আপুই ওটা আমার ব্যাগে রেখে দিয়েছিল।

ওর চমকানো আর ভয়ার্ত মুখ দেখেই সত্যি মিথ্যে বুঝতে পেরেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে সেই বীভৎস কীটটা আমি দেখতে পেয়েছি, যে ভবিষ্যতে ওকে কুরে কুরে খাবে। তারপর আর আমার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। কখন পাশের ঘরে গিয়ে ওর বাবার মাউন্ট আবু থেকে কেনা শৌখিন মোটা বেতের লাঠিটা নিয়ে এসেছি, আর কতক্ষণ ধরে মেরে মেরে ওর ভিতরের সেই কীটটাকে ধ্বংস করতে চেয়েছি, আমি জানি না।

॥ দুই ॥

নিস্পন্দ বসে আছি। ভিতরটা আগনেস কটেজে ছুটে যাবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। বিলিকে বুকে করে এনে আমার এই বিছানায় শুইয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। ও কি স্থির হয়ে ক্লাসে বসে থাকতে পারছে। গেঞ্জির ভিতর দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে সাদা শার্টে লাগছে?

পাছে থাকতে না পারি, পাছে সত্যি ছুটে যাই এই জন্যেই কে যেন আমাকে ঠেলে তুলে দিল। টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসালো। হাতে কলম গুঁজে দিল। প্যাডে একটা চিঠি লিখল। আমি না। আমার ভিতরের আর কেউ। দরকার হলে এ-সময়ে যে আমাকেও শাসনের শেকল পরিয়ে রাখতে পারে।

চিঠি লেখা হল। পড়লাম। আগনেস কটেজের বর্তমান হেড মিসট্রেস মিসেস ডায়না কালভার্টকে লেখা। দু'চার কথা। শরীর অসুস্থ, আজ স্কুলে যেতে পারছি না। সহকারী হেড মিসট্রেস মীনা ডাকুয়াকে লিখতে পারতাম। কারণ ডায়না কালভার্ট প্রায়ই একেবারে লাঞ্চ সেরে স্কুলে আসে। কিন্তু ভিতরের যার তাগিদে এই চিঠি লেখা, এ-সময়ে কোনো দরদের মানুষের কৌতূহল তার কাম্য নয়। আরো একটা কারণে আজ স্কুলে না যাওয়াটা আমার অনুচিত। কাল শনি আর পরশু রবিবার। স্কুল ছুটি। তিন তিনটে ক্লাসের এক গাদা আঁকার খাতা আমার কাছে। সেগুলো পেলে ছুটির দিনে ছেলে মেয়ে-গুলো অনেক কিছু আঁকার মক্স করতে পারত। আর কিছু না হোক গ্র্যাণ্ডির রাস্তা ধরে বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের আঁকার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছি।

চিঠি নিয়ে রঙিলা চলে গেল। তার হাতে আঁকার খাতাগুলোও দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু একটাও দেখা হয়নি। এ-রকম ব্যতিক্রম দেখলে বাচ্চাগুলো অবাক হবে।

চিঠি পাঠিয়েই আফসোস। কেন পাঠালাম। ···বিলিটা কি ক্লাসে? না ওর যন্ত্রণা আর ছটফটানি লক্ষ্য করে ওকে সিক্-রুমে নিয়ে গিযে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে? আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সিক্ রুমে শুয়ে বিলি ছটফট করছে। তার ধুম জ্বর এসেছে। বিকারে কি বিড়বিড় করছে। রঙিলা পৌঁছুবার আগেই স্কুল থেকে কেউ বুঝি আমার কাছে ছুটে আসবে। বলবে, শিগগীর যেতে হবে, বিলি বিষম অসুস্থ।

আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠল। দু'কান খাড়া। সত্যি কাঠের সিঁড়িতে কারো পায়ের শব্দ। কেউ আসছে। দৌড়ে বেরিযে আসতে চাইছে। কিন্তু পারা গেল না। ভিতরে ওই একজন আমাকে স্থাণুর মতো বসিযেই রাখল।

দরজার সামনে যে, তাকে দেখে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। স্কুলের কেউ নয়। গ্র্যাণ্ড জেরির কমবাইনড হ্যাণ্ড রিখিয়া। তার হাতে বিশাল একটা ফুলের স্তবক। সঙ্গে আটকানো একটা কার্ড ঝুলছে। গ্র্যাণ্ডির আবার কি হল আজ! হঠাৎ এমন বাহারের ফুলের স্তবক কেন? কিন্তু লোকটাকে আর তার হাতের ফুলের স্তবক দেখেও আমি বসেই আছি, নড়তে চড়তে পারছি না।

মাথা নেড়ে ওকে ভিতরে আসতে বলেছি বোধহয়। রিখিয়া ঘরে ঢুকে আমার সামনে ফুলের স্তবকটা এগিয়ে দিল। কলের পুতুলের মতো হাত বাড়িয়ে নিলাম। কার্ডটা দেখলাম। তার পরেই ছোট খাট ঝাঁকুনি একটা।

লেখা আছে, হ্যাপি বার্থ ডে।—গ্র্যাণ্ডি।

কি কাণ্ড! আজ আমার জন্মদিন! বিমূঢ় মুখে ঘরের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালাম। সঠিক দিন আর তারিখ দেখেও দু'চোখে অবিশ্বাস। জ্ঞান হবার পর থেকে এ-রকম ভুল আমার কখনো হয়নি। অবশ্য গত দু'মাস ধরে যা গেল, এত বড় বিপর্যয়ের মুখোমুখিও জীবনে আর কখনো হইনি। নইলে মনে থাকত। কোনো বার ভুল হয়নি, এবারও হত না।

…একমাত্র গ্র্যাণ্ড জেরিরই ঠিক ঠিক মনে আছে। তার এই এক ব্যাপারে অন্তত ভুল হয় না।

…বত্রিশটা বছর তাহলে আজ পার হয়ে গেল। এই দিনে ডিকি আমাকে অনেক কিছু দিত। আর এই দিনে আমি বিলিকে কিছু না কিছু দিতাম। আজ খুব দিয়েছি। অনেক দিয়েছি। কচি শরীরটা আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছি। আমার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ভিতরের সেই নিষ্ঠুর একজন গলায় কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

নাড়া চাড়া খেয়ে সজাগ হলাম। রিখিয়াও বোধহয় বুঝেছে এই দিন বা তারিখটার কথা আমার মনে ছিল না। তা ছাড়াও কেন যেন একটু অবাক চোখে দেখছে আমাকে।

উঠলাম। স্তবকটা টেবিলে রেখে ব্যাগ থেকে দুটো টাকা বার করে ওকে দিলাম। বললাম, মিষ্টি খেও।…আর গ্র্যাণ্ডিকে বোলো, যখন হোক তার কাছে যাব' খন।

ও চলে গেল। গ্র্যাণ্ডিও কি ভিতরে ভিতরে বেশ অবাক হচ্ছে? কারণ, অনেক বছর হয়ে গেল, এই দিনে প্রত্যেক বার আমার বাংলোয় তার বিশেষ নেমন্তন্ন থাকে। রাতে খাওয়া দাওয়া হৈ-চৈ হয়। ডিকির দুই একজন বন্ধু আসে। আমার বাবা আসে। আর আসে মীনা ডাকুয়া আর তার স্বামী মনোহর ডাকুয়া। গেল বারে অবশ্য আরো ছিল। সতীশ কাউল আর তার স্ত্রী মলি কাউল ছিল। এরা সকলেই খুব দামী দামী উপহার এনেছিল। কিন্তু এই দিনে আমার কাছে সব থেকে দামী মানুষ গ্র্যাণ্ডি।…আজ সে কি ভাবছে!

…আমার ধারণা কিছুই ভাবছে না। সে নিজে থেকেই বোঝে। নিজে থেকেই অনুভব করতে পারে আমার মনের অবস্থা কি। দিন কি করে কাটছে।…এখনো কি তোড়জোড় করব? আর কাউকে না হোক, শুধু তাকে রাতের ডিনারে ডাকব? মনে হতেই মনে মনে নিজের দু'গালে ঠাস ঠাস করে চড় বসালাম দুটো। বত্রিশটা বছর পার হল বটে, কিন্তু এখনো কি আমি ঠিক-ঠিক সাবালিকা হইনি?

এই দিনেও এই চিন্তা মনে আসে কি করে? উৎসব করব? জন্মদিনের উৎসব? এই পৃথিবীতে আমার মতো মেয়ে না জন্মালে কি ক্ষতি হত?

দু'কান খাড়া হয়ে উঠল আবার। না, এই পায়ের শব্দটা আমি চিনি। রঙিলা ফিরল। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। ও এসে কি বলবে? বিলির সম্পর্কে কি খবর দেবে?

ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালো। গম্ভীর। বলল, হেড মিসট্রেস ছিল না, কেরাণিবাবু তোমার চিঠি তার টেবিলে রেখেছে।

চলে গেল।

—ওরে শোন্ শোন্। বিলির কথা কিছু বলছিস না কেন? বিলি কেমন আছে? একবার শুধু বলে যা, বিলি সিক্ রুমে শুয়ে ছটফট করছে না—জ্বরে ধুঁকছে না—

না, রঙিলাকে আমি ডাকিনি। তাকে কিছুই বলিনি। বলতে পারিনি। আমার ভিতরে শুধু একথাগুলো গুমরে গুমরে কান্না হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। রঙিলা স্কুলে গিয়ে বিলির খবর যদি নিয়েও থাকে আমাকে কিছু বলবে না জানা কথাই। সাদা সিধে-ভাবে জিগ্যেস করলেও রাগ দেখিয়ে চলে যেত। যে মা একটা দুধের শিশুকে অমন নৃশংস মার মারতে পারে তার মুখ দেখারও ইচ্ছে নেই রঙিলা এই ভাব দেখিয়ে চলে গেল।

কতক্ষণ বসেই ছিলাম জানি না। ভিতরটা আবার ধড়ফড় করে উঠল। কাঠের সিঁড়িতে স্যাণ্ডেলের এই ফটফট শব্দ চেনা-চেনা। মীনা মাসি···মীনা ডাকুয়া নাকি! তাই যদি হয়, তাহলে নিশ্চয় খারাপ খবর···বিলির খবর।

হ্যাঁ মীনা মাসি। পরদা সরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক দেখল আমাকে। তারপর স্যাণ্ডেল বাইরে খুলে রেখে ভিতরে এলো।—এ ভাবে বসে আছিস, চিঠি লিখে খবর পাঠিয়েছিস অসুস্থ, স্কুলে যাবি না—কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

—কিছু না। বোসো।

আমি প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে একটু সরে বসলাম।

মীনা মাসি এই এক-কথায় নিশ্চিন্ত হবার মেয়ে নয়। আমার ওপর তার স্নেহে এতটুকু ভেজাল নেই।—কিছু না মানে? কিছু না হলে স্কুলে যাবি না লিখেছিস কেন?…আর তোকে এ-রকমই বা দেখাচ্ছে কেন? চিঠিটা দেখে বিলিকে ক্লাস থেকে ডেকে পাঠিয়ে জিগ্যেস করলাম মায়ের কি হয়েছে—তা তারও দেখি চোখ মুখ বেজায় লাল, আমার তো ওকেই অসুস্থ মনে হচ্ছিল। ও বলল জানে না, অথচ চোখ মুখ দেখে মনে হল কান্নাকাটি করেছে—তাইতে কি হল না হল ভেবে আরো ঘাবড়ে গেলাম—ভাবলাম, না জানলেও এমন কিছু হয়েছে যার জন্যে ওইটুকু ছেলেরও অমন মুখ। তাই ছুটে এলাম… কিন্তু কি হয়েছে? কিছু বলছিস না কেন?

পাশে বসে হাত বাড়িয়ে আমার কপাল পরীক্ষা করল।—গা তো দেখি পাথরের মতো ঠাণ্ডা।

মীনা মাসির ওই এক দোষ। এলে মুখ চলতেই থাকে, এক নিঃশ্বাসে শতেক কথা বলে।

—কিন্তু হয়নি, এমনি ভালো লাগছিল না।।

এবারে আরো নিরীক্ষণ করে দেখল। আমার মানসিক অবস্থাটা এই একজন মোটামুটি জানে। মোটামুটি কেন, গ্র্যাণ্ডির থেকেও বেশি জানে। গ্র্যাণ্ডি নিজে থেকে কিছু খুঁচিয়ে জিগ্যেস করে না, অনেকটাই অনুভব করতে পারে। কিন্তু আমার যা হয়েছিল তাতে ভিতরটা হালকা করার জন্য একজনকে অন্তত কিছু না বলতে পারলে মনে হত বুকটা ফেটেই যাবে। আর বলার মতো এই একজনই আছে। যে অনেক বড় দিদির মতো আর অনেকটা মায়ের মতো (নিজের মা নয়) আপনার জনের ভিতরের খবর জানতে চায়। এর মধ্যে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, ডিকি ডেটন শিলিগুড়ির হাসপাতালে যমের সঙ্গে লড়াই করছে জেনেও আমি একবার তাকে দেখতে গেলাম না—মীনা মাসির কৌতূহল আমি চাপা দেব কি করে?

ব্যাকুল হয়ে বার বার আমাকে জিগ্যেস করেছে, কি হয়ে গেল তোদের মধ্যে, মানুষটা বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই—তুই একটা বার

দেখতেও যাচ্ছিস না কেন তাকে ?

ঠাণ্ডা জবাব দিয়েছি, বেঁচে গেলেও আমার সঙ্গে আর দেখাদেখির সম্পর্ক থাকবে না, তাই যাচ্ছি না।

—তার মানে? মীনা মাসির আকাশ থেকে পড়া মুখ।—তার মানে? তুই কি তাকে ডিভোর্স করবি নাকি?

—বেঁচে থাকলে করব। না থাকলে তার দরকার হবে না।

মীনা মাসি সত্যি আমাকে ভালবাসে বলে ব্যথায় আর দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ হয়ে গেছল। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে! কি এমন হয়েছে তোদের মধ্যে যার জন্য এতবড় একটা ব্যাপারের জন্য তৈরি হচ্ছিস?

আমি বলেছি, মাথা আমার একটুও খারাপ হয়নি, এত বড় ব্যাপারের জন্য তৈরি হচ্ছি কারণ ততো বড় ব্যাপারই হয়েছে।...মীনা মাসি সময়ে সব জানবে, তোমাকে সব বলব আমি, কিন্তু এখন আমাকে যতো জেরা করছ আমার ততো কষ্ট হচ্ছে।

তারপর মীনা মাসি স্তব্ধ। আর কিছু জিগ্যেস করেনি।

আজও মীনা মাসি সেদিককারই কোনো ব্যাপার ভাবল। চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে সশঙ্কে জিগ্যেস করল, ডিকির কিছু হয়ে-টয়ে যায়নি তো?

—না। সে ভালো আছে।

—তুই জানলি কি করে?

আমার কথা বলতে ভালই লাগছে না। জবাব দিলাম, জানলে বলছি?

এবারে মীনা মাসি অপ্রস্তুত একটু। ফলে স্বভাবতই ধরে নিল, আমি ডিভোর্সের সংকল্পের দিকে এগুচ্ছি বলেই মনের এই অবস্থা। কি বলতে গিয়ে টেবিলের ওপর মস্ত ফুলের স্তবকটার দিকে চোখ পড়ল তার।

—বাঃ!

উঠে ভালো করে দেখতে গিয়ে কার্ডটা নজরে পড়তে সেটা উল্টে

দেখল। তারপরেই উচ্ছ্বাস।—অ্যাঁ! আজ তোর জন্মদিন! কি হল রে তোর···আমরা কেউ কিছু জানিই না! এমন দিনে এই মুখ করে বসে আছিস তুই? আমরা ছাড়ব ভেবেছিস—তুই না করলে আমরা তোর জন্মদিন করব। আজ তোর আমার বাড়িতে ডিনার; যদি বলিস তোর গ্র্যাণ্ডিকেও চিঠি পাঠাতে পারি···আজ দেখছি আমাকেও হাফ-ডে করে স্কুল থেকে পালাতে হবে—কত ব্যবস্থা করতে হবে খেয়াল আছে—রাত পোহালেই তোড়জোড় করে আবার দার্জিলিং রওনা হওয়া আছে না?

আগামী কাল মীনা মাসি আর মনোহর ডাকুয়ার সঙ্গে বিলিকে নিয়ে মোটরে আমার দার্জিলিং যাবার প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে আছে তাও মনে ছিল না। এখন মনে পড়তে সত্যিকারের বিরক্তিতে ভিতরটা ছেয়ে গেল। এ নিয়েও আবার ঝকাঝকি করতে হবে। প্রথমে ডিনার নাকচ করার দিকে এগোলাম। বললাম, মীনা মাসি, আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তুমি সত্যি আমাকে ভালবাসো কি না।

—সে-কি রে! কেন?

—যদি ভালবাসো তো জন্মদিন বা খাওয়া-টাওয়ার নামও করবে না। আজ সব থেকে বেশি ভাবছি আমি আদৌ না জন্মালে কি ক্ষতি হত।···এর মধ্যে তুমি আমাকে টানা হেঁচড়া করলে আমার মাথাই খারাপ হয়ে যাবে।

কি বুঝল সে-ই জানে। সামনে দাঁড়িয়ে খানিক দেখল। বলল, ঠিক আছে, কিন্তু কাল দার্জিলিং যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা মনে থাকে যেন।

এবারে আর এক প্রস্থ যুঝতে হবে জানি। কাল দার্জিলিং যাওয়ার উপলক্ষ্য একটা আছে। মীনা মাসি পলিটিক্স-এ আমার থেকে অন্তত বেশি ইণ্টারেস্টেড। ন'দিন আগে সাতান্ন সালের তৃতীয় নির্বাচন শেষ হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস প্রত্যাশিতভাবেই জিতেছে। আগামী কাল ডাক্তার বিধান রায় আসছে দার্জিলিঙে—এখানে বিশজন এম এল-এর সঙ্গে বসে পরদিন তৃতীয় মন্ত্রিসভা স্থির হবে। মীনা মাসি

বিধান রায়কে কখনো দেখেনি। খুব ইচ্ছে তাকে দেখবে। আমারও দেখার ইচ্ছে শুনে সোৎসাহে স্বামীকে বলে সব ব্যবস্থা করেছে। মনোহর ডাকুয়া চেষ্টা করে চা বাগানের একটা গাড়ি পেয়েছে।

...হ্যাঁ, ডাক্তার বিধান রায়কে এই মুহূর্তে আমার আরো বেশি দেখতে ইচ্ছে করছে। তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এত বড় ডাক্তার আর নাকি হয় না। রোগীর সামনে এসে দাঁড়ালে রোগের গন্ধ পায় নাকি। তাই তাকে গলা ফাটিয়ে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছে, তুমি তো মস্ত ডাক্তার, কারো ভিতরের অসততার বীজাণু কি করে নির্মূল করতে হয় আমাকে বলে দিতে পারো? বলে দিতে পারো, কেমন করে মানুষের ভেতরের বীভৎস ভয়াল বিকৃতি সারিয়ে তোলা যায়? এই রোগে যে কত মানুষের ভেতরে খেয়ে গেল এত বড় ডাক্তার হয়েও তুমি কি জানতে পাও না—দেখতে পাও না?

মীনা মাসির দিকে চেয়ে আমি দু'হাত জোড় করলাম।—আমাকে ক্ষমা করো। তোমরা যাও!

মীনা মাসি রেগেই গেল।—ক্ষমা করব! আমরা যাব? আর তুই এই চার দেয়ালের মধ্যে বসে নিজের মনে মাথা খুঁড়বি?

আমার ধারণা, বিধান রায়কে দেখতে যাওয়াটা একটা উপলক্ষ মাত্র। মীনা মাসির আসল ইচ্ছে দু'দিনের জন্য হলেও আমাকে নিয়ে কোথাও চলে যাওয়া, হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে আমাকে খানিকটা হালকা করা। মীনা মাসি আমার মা নয়, কিন্তু বরাবরই মায়ের থেকে ঢের বেশি। ছেলেবেলা থেকে যখন বাড়ি এসে আমাকে বাংলা পড়াতো তখন থেকেই। আমাকে বাংলা শেখানোর ঝোঁকটা নিজের তো ছিলই, বাবারও সায় ছিল নইলে মায়ের জন্য পারা যেত না। যাক, মীনা মাসির এই মূর্তি ধরাই স্বাভাবিক।

আরো নরম করে বললাম, মীনা মাসি, অসহ্য যন্ত্রণার সময় এভাবে টানা-হেঁচড়া করলে আমার কোথায় লাগবে তুমি জানো না বলেই আমার ভালো চেয়ে এই প্রোগ্রাম করেছ—

বাধা দিয়ে মীনা মাসি বলল, কিন্তু দু'দিন আগেও তো ঠিক ছিলি, হঠাৎ তোর হল কি?

—কিছু হয়েছে। তেমন কিছুই হয়েছে। এখন দু'চার দিন আমার জীবনের সব থেকে বড় ডিসিশন নেবার সময়। এ-সময় একটা ডানা-ভাঙা পাখিকে নিয়ে তুমি আদর করেও নাড়াচাড়া কোরো না—তাতে আমার কত লাগবে তুমি বুঝতে পারছ না।

আমার দিকে খানিক স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকে মীনা মাসি উঠে চলে গেল।

...মীনা মাসির ঋণ কি করে শোধ করব জানি না। অবশ্য খানিকটা সেই কোন্ ছোট বেলায় নিজের অজ্ঞাতে আগের ভাগে শোধ করে বসে আছি মীনা মাসি জানেও না। থাক সে-কথা।

আস্তে আস্তে মনের তলায় সেই আতঙ্কটাই আবার এগিয়ে আসতে লাগল—মীনা মাসি বিলির চোখ মুখ অস্বাভাবিক লাল দেখেছে। এতক্ষণে ও কি জ্বরে বেহুঁস হয়ে আছে? জ্বরের ঘোরে মা মা করে ডাকছে? এই মা কত নির্মম হতে পারে এই যন্ত্রণার মধ্যেও ওর কি মনে পড়ছে?

মুখ তুলে তাকালাম। পরদা সরল খানিকটা। দরজায় রঙিলা। আগের মতোই গম্ভীর।—আজ খাওয়া-দাওয়া আছে না নেই?

এ-রকম বলার সাহস রঙিলার সাধারণত নেই। আজ ওর মেজাজ বড় বেশি বিগড়েছে বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার একটুও রাগ হচ্ছে না। জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, বিলি খেতে পেরেছে, না, না-খেয়েই স্কুলে চলে গেছে? কিন্তু আশ্চর্য, আমার ভিতরের সেই নির্মম কেউ একজন যেন গলা টিপে ধরল। জিগ্যেস করতে পারা গেল না।

খাব না বললে রঙিলাও উপোস দেবে। তাই ঠাণ্ডা মুখেই বললাম, তুমি খেয়ে নাও...আমি আর একবার চান করব, আমার দেরি হবে।

কি জন্যে ও ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো জানিনা। ফুলের স্তবকটা রঙিলাও এই প্রথম দেখল। কয়েক পলকের বিস্ময়, তারপর আবার

আমার দিকে ফিরল। আমার আর বিলির জন্মদিনের অনেক ঘটা ও দেখেছে। মুখে কিছু বলল না। শুধু চোখ দিয়ে বলতে চাইল, এই দিনে তুমি এই করলে? কচি ছেলেটার এই হাল করলে?

আমার মুখে আবার কঠিন আঁচড় পড়তে দেখেই হয়তো পরদা সরিয়ে চলে গেল।

দু'মিনিটের মধ্যে গাড়ির শব্দ। একটা মোটর সিঁড়ির কাছে থামল টের পেলাম। আমি আঁতকেই উঠলাম। বেহুঁস বিলিকে নিশ্চয় কোনো গাড়ি যোগাড় করে স্কুল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। নইলে এ সময়ে কার গাড়ি! সতীশ কাউল চলে যাবার পর আর কারো বা কোনো গাড়ি এই বাংলোয় এসে দাঁড়ায়নি!

কাঠের সিঁড়িতে ভারী পায়ের মশ মশ শব্দ। ঘরের পরদাটা একটু উড়ছেও না যে তার ফাঁক দিয়ে দেখব। জুতোর শব্দ সামনের বারান্দা ধরে পাশের বসার ঘরেব দিকে চলে গেল। আর একটু পরে রঙিলা এসে খবর দিল, মনোহর সাহেব—

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিরক্তি। মীনা মাসি নিশ্চয় স্কুলে গিয়ে ফোনে তাকে খবর দিয়েছে, আর মনোহর ডাকুয়া তক্ষুণি অফিসের গাড়ি যোগাড় করে চলে এসেছে। কাল দার্জিলিঙে যাবার জন্য জোর জুলুম করা ছাড়া এ-সময়ে আর কি জন্যে আসতে পারে? ইচ্ছে হল রঙিলাকে বলি, বলে দাও এখন দেখা হবে না। কিন্তু তা বলা যায় না। সকলে জানে শীলা ডেটন ভারি ভব্য মেয়ে। উঠলাম।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালে আজও আমার মায়া হয়। মীনা মাসির বয়স যদি এখন তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ হয়, মনোহর ডাকুয়ার বয়েস ছেচল্লিশ-সাত চল্লিশ হবে। আমার বাবার থেকে সাত আট বছরের ছোট। কিন্তু এই ফারাক সত্ত্বেও বাবার সঙ্গেই সব থেকে বেশি ভাব। সেই সুবাতে ছেলে বেলা থেকে তাকে আংকল মনোহর বা আংকল ডাকুয়া বলে ডেকে আসছি। বাবা গত বছর রিটায়ার করেছে, কিন্তু এখনো আংকল মনোহর ডাকুয়া রাতে ক্লাব থেকে বেরিয়ে বাবার সঙ্গে

খানিক আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরে। বাবা যখন মদ খেত তখন সন্ধ্যা থেকে তার ওখানেই আসর বসত। মায়ের মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই বাবা মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য কোনো দিনই বেশি খেত না। মায়ের দৌরাত্ম্যে তা-ও ছেড়ে দিয়েছিল। হয়তো ঘেন্নায়ও। কিন্তু মনোহর ডাকুয়ার সন্ধ্যার পর একটু আধটু না হলে চলে না। আগে বেশি মাত্রায় খেত। দিনে তুপুরেও চলত। মীনা মাসি শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরতে মাত্রা জ্ঞান হয়েছে নাকি। আর দিনের বেলায় মদ ছোঁয়ই না।···দিনের বেলায় মদ ছাড়ার বা অমন মাত্রা জ্ঞান হওয়াটার কারণ মীনা মাসি কিনা আমার তাতে একটু সন্দেহ আছে। যদিও মীনা মাসি সগর্বে তাই বলে। যাক সে কথা।

আংকল মনোহরকে দেখলে মায়া হয় বলেছি তার কারণ, আমার সেই চৌদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত কোনো বাঙালী পুরুষের এত রূপ আমার আর চোখে পড়েনি। কুচবিহারের লোক। লম্বা দোহারা চেহারা। গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, এত ফর্সা যে চামড়া ফুটে লালচে আভা ঠিকরোয়। তেমনি সুন্দর নাক মুখ চোখ। মীনা মাসিও দেখতে খারাপ নয়, ফর্সাও। কিন্তু ভদ্রলোকের তুলনায় কিছুই না, আর পাশাপাশি হলে কালো দেখায়। আমাকে সকলে বেশ ফর্সা বলে, কিন্তু আংকল ডাকুয়ার তুলনায় আমার রংও কিছুই না। সেই ছেলেবেলায় মনে আছে মীনা মাসি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা বললে মা ঠাট্টা করত, বলত, বাড়ি ফেরার জন্য ছোঁক ছোঁক করবিই তো, যে রূপ তোর বরের, পলকে চোখে হারাস।

আর মীনা মাসি বলত, সকলে চোখ দিচ্ছে দিক, তুমি আর দিও না—

মায়ের জিভের লাগাম ছিল না। তরল কথা শুনতে ভালো লাগত। এমন ঠাট্টার কথাও কানে এসেছে, কত বড় বড় ঘরের রূপসী মেয়ে তো তোর বরকে ঘিরে থাকত, তার মধ্যে সকলের ওপরে টেক্কা দিয়ে তুই কি করে পারমানেন্ট দখল নিয়ে বসলি খুলে বল্‌তো?

মীনা মাসি হাসত। জবাব দিত না।

আশ্চর্য, এদের ঘরে ঘর আলো করা ছেলে মেয়ে আসতে পারত, কিন্তু ছেলে পুলে আর হলই না। যাক, অপঘাতে মনোহর ডাকুয়ার মতো এমন রূপের মানুষের মুখের কি হাল না হয়েছে। মুখের ডান দিকটা ভুরু থেকে চোখের কোন ঘেঁষে নাকের পাশের হাড় পর্যন্ত পাথরের ঘায়ে বরাবরকার মতো থেঁতলে ছেঁচে গেছে। গোড়ায় কি কদর্য আর বীভৎসই না দেখাতো। তারপর শুকিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আর এতকাল পরেও মুখের ওই দিকটা দেখলে কুৎসিত লাগে।···

···ভদ্রলোকের মাছ ধরার ঝোঁক ছিল খুব, ছুটির দিনের সকালে দুপুরে হুইল ছিপ নিয়ে পাহাড়ী নদী কালজানির নির্জনের ওই নদীটা আমারও খুব প্রিয়। কোনো পাহাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। নদীর দু'দিকে জঙ্গল, পাহাড়। ও-রকম পাহাড়ী নদীতে স্রোতে মাছ ধরা খুব সহজ নয়, কিন্তু আংকল ডাকুয়া কি করে যেন টপটপ মাছ তুলে ফেলত। কোন দিন বা দূরে তিস্তা নদীতে চলে যেত মাছ ধরতে।

মনোহর ডাকুয়ার দুর্ঘটনা কালজানি নদীর ধারেই ঘটেছে। খরগোশ আর বুনো মুরগীর লোভে আদিবাসী ছোকরারা বড় বড় পাথর হাতে সর্বদাই জঙ্গলে ঢুঁড়ে বেড়ায়। অনেক সময় অব্যর্থ নিশানা ওদের। খরগোশ বুনো মুরগী ছাড়া কত সময়ে ওই পাথরের ঘায়ে বড় বড় ময়ুর বা বাচ্চা হরিণকেও ঘায়েল হতে দেখেছি। শুনেছি, আচমকা ওমনি দুটো এবড়ো খেবড়ো বড় পাথরের ঘায়ে আংকল মনোহরের ওই দশা। পনের দিন তাকে মাতলাহাটির ছোট হাস-পাতালে গিয়ে থাকতে হয়েছিল। মা বাবা দু'জনেই তাকে দেখতে যেত। বাবার মুখে শুনেছি জঙ্গলের একটা বাচ্চা হরিণ মারতে গিয়ে একটা আদিবাসী ছেলে পাথর ছুঁড়ে ওই কাণ্ড ঘটিয়েছে। আর মায়ের সে কি রাগ। সেই আদিবাসী ছেলেকে সনাক্ত করা গেলে বা তাকে হাতের কাছে পেলে বঁটি দিয়ে তার গলা কাটত। আর দিনকতক মীনা মাসির সেই কান্না দেখে আমার মনটা এত খারাপ হয়ে গেছল যে কি বলব।

কিন্তু পরে ওই মীনা মাসির মুখে বেশ অবাক হওয়ার মতো কথাই শুনেছি। আমার মা-কে বলেছে, ভগবানের মারের মধ্যেও কি দয়া বুঝি না দিদি, এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষটার ভেতরটাও একেবারে বদলে গেছে। এখন একেবারে ঠাণ্ডা। যা বলি তাই শোনে। সন্ধ্যার পর একটু আধটু যা ড্রিংক করে। তা সমস্ত দিনের কাজ কর্মের ক্লান্তির পর ওটুকুর জন্য আমি কিচ্ছু মনে করি না। মদ তো একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল, এত কালের অভ্যেস, শরীর খারাপ হতে ডাক্তার বলল, একেবারে ছাড়লে খুব ক্ষতি হবে, প্রেসার ফ্লাকচুয়েট করবে, ঘুম হবে না, পেটের গণ্ডগোল দেখা দেবে। তাই হচ্ছিল, আমিই জোর কবে ধরালাম আবার…এমন কি সঙ্গ দেবার জন্য আমাকেও একটু নিয়ে বসতে হয়েছে।

এ কথার উত্তরে মাকে রেগে যেতে দেখেছি। আব বলতে শুনেছি, তবে আর কি, তোর তো একেবারে দু' কুল গেছে। মদ খাওয়া কমিয়েছে তাই আনন্দে আটখানা হয়ে নাচছিস!

কারো মদ খাওয়া কমানো মা বরদাস্ত করবে কি করে। মা-কে তো তখন মদে খাচ্ছে। আমার ধারণা, এই এক কারণেই আংকল ডাকুয়াকে মা সুনজরে দেখত। ছুটি ছাটায় দিনের বেলাতেও ওই দু'জনকে একসঙ্গে বসে মদ খেতে দেখেছি। আর আমার আরও একটা বিচ্ছিরি ধারণা ছিল।…আমার মাও দেখতে খারাপ ছিল না। মা অকালে মারা গেছে। আংকল ডাকুয়ার ওই অঘটনের সময় মায়ের বয়েস চৌত্রিশ আর মনোহর ডাকুয়ার বড় জোর উনত্রিশ কি তিরিশ। কিন্তু তখন দু'জনের অত হৃদ্যতার মধ্যে বয়সের ফারাকটা আমার চোখে পড়ত না। আর মায়েরও তখন অত বয়েস একটুও মনে হত না। তাই আমার ধারণা ছিল, শুধু মদের লোভেই আংকল ডাকুয়া অত ঘন ঘন আমাদের বাড়িতে আসত না, বাবার বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়। তাছাড়া মদ তো তখন বেশির ভাগ সময় আংকলই কিনে নিয়ে আসত। এখন ভাবতেও লজ্জা করে, কিন্তু তখন, সেই চৌদ্দ বছর বয়সে ভাবতাম, আমার মায়ের সঙ্গ পাওয়ার আগ্রহটাই

আংকলের বেশি। আর সেই জন্যেই বাবার অনুপস্থিতিতেও যখন তখন আসে। আমার দিকে থেকে এ-রকম ভাবার অবশ্য একটু কারণ আছে। সেই চৌদ্দ বছর বয়সেও পুরুষ সম্পর্কে আমার অপার কৌতূহল। সেই কৌতূহলের ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে রয় জারভিস আরো ছ'মাস আগে থেকে।…তখন কালিম্পঙের বোর্ডিংএ থাকলেও মেলিণ্ডা জারভিসের কোয়ারটারসএ আমার অবাধ যাতায়াত। অতবড় বাংলোর বা বাগানের কোন অদৃশ্য কোণে বসে আমরা ছুটিতে কি কাণ্ড শুরু করেছি মেলিণ্ডা বা আর কেউ জানছে কি করে?…রয় জারভিস তখন ফাঁক পেলেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরত (এত জোরে যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসত), আর ঠোঁট দুটোর ওপর ভীষণ হামলা করত। তাতেও যন্ত্রণা হয়, কিন্তু খারাপ লাগত না।

…ছোট ছুটি ছাটায় এলে কালিম্পঙে ফেরার দিন গুণতাম আমি। আর ভেকেশনে তো রয়ও তার আন্টির সঙ্গে এখানেই আসত। অবশ্য রয়েব সঙ্গে আমার এই ব্যাপারটা শুরু হবার পর থেকে সেই পর্যন্ত বড় ভেকেশন ওই একটাই পড়েছে, আর কে জানে কেন সেবারের ছুটিতে রয় বা মেলিণ্ডা জারভিস কেউই শালজুড়িতে আসে নি।

মোট কথা পুরুষ সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে আমি তখন দারুণ সজাগ। মদ বেশি পেটে পড়লে মা একটু বে-সামাল হয়ে পড়ে। তার উচ্ছলতা বা ক্ষোভ বাড়তে থাকে। ক্ষোভটা সব সময় আমার 'জেণ্টলম্যান' বাবার ওপর। সকলের চোখে বাবা 'পারফেক্ট জেণ্টলম্যান' আর ওই শব্দটা শুনলেই মায়ের গা রি-রি করে। আমি অনেক সময় আড়াল থেকে লক্ষ্য করতাম, মায়ের বে-সামাল অবস্থার সময় আংকল ডাকুয়া কোনরকম সুযোগ নেয় কিনা, মায়ের গায়ে হাত দেয় কিনা। সে-রকম কিছু চোখে কখনো পড়েনি অবশ্য। অনেক উচ্ছলতার মুহূর্তে মা-কেই বরং ছদ্ম রাগে আংকলের চুলের মুঠি ধরে তাকে কাছে টানতে দেখেছি। কিন্তু মাও তাবলে এমন কিছু করত না, অন্তত চোখে কাঁটা বেঁধার মতো তেমন কিছু আমি কখনো দেখিনি। কিন্তু আমার মনের তলায় সন্দেহ ছিলই।

অবশ্য আংকল ডাকুয়া আমাকেও খুব পছন্দ করত। আমার জন্য ভালো ভালো প্রেজেনটেশন কিনে আনত (যদিও আমার বিশ্বাস সেটা মা-কে খুশি করার জন্যেই—আর মা তো খুশি হতই)। বাবার অন্য বয়স্ক বন্ধুরা আমার গায়ে হাত দিয়ে আদর করলে মা বাবার ওপর তিরিক্ষি হয়ে উঠত, কিন্তু আংকল ডাকুয়ার বেলায় মা সবই ভিন্ন চোখে দেখত। মায়ের সামনেই আংকল আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করত, গাল টিপে দিত। মা তার ওপর স্নেহের বকুনি ঝাড়ত, অত বড় মেয়েকে প্রেজেনটেশন দিয়ে আর আদর দিয়ে মাথায় তুলছ, এরপর আমার সামলানে দায় হবে।

আংকল বলত, ওর মতো ভালো মেয়ে ক'টা হয়।

তাকে আমি কোনদিনই অপছন্দ করতাম না। কিন্তু আংকলের ভিতরে ঢুকে আমার দেখতে ইচ্ছে করত, তার ভিতরে কি আছে—এক সঙ্গে সে আমার বাবাকে আর মানা মাসিকে পথে বসাবে কিনা। সময় সময় এ-ও মনে হত, আংকলকে ভালবাসে বলেই কি বাবার ওপর মায়ের সর্বদা এত রাগ এত ক্ষোভ? এই ভদ্রলোকের সম্পর্কে কেন যে আমি এ-রকম ভাবতাম কে জানে।

পাথরের ঘায়ে অমন সুন্দর মুখের এই হাল হবার পর মানুষটা সত্যি সত্যি কত যে বদলেছে ঠিক নেই। প্রথম ছ'মাসের মধ্যে আমাদের বাড়িতে তো আসেই নি—এক অফিস আর বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাতায়াত ছিল না। মা বা বাবা দু'জনে একসঙ্গে গিয়েও তাকে আমাদের ডেরায় ধরে আনতে পারেনি। বাবাকে মা হুকুম করেছিল, হরিণ মারার লোভে যে আদিবাসী ছোকরা এ-কাজ করেছে লোক লাগিয়ে তাকে খুঁজে বার করো যেমন করে হোক, তাকে পুলিশের হাতে দাও।

কিন্তু বাবা চেষ্টা করেও তার হদিস পায়নি। বাবা নিজে ফরেস্ট অফিসার ছিল। সে যথার্থই লোক লাগিয়েছিল। কিন্তু আংকল ডাকুয়া যার মুখ পর্যন্ত দেখেনি, বাবা তার টিকির নাগাল পাবে কি করে, তবু মা-কে কি সে-কথা বোঝানো যায়! মদের ঝোঁকে গাল-

মন্দ করে বাবাকে, এমন কথাও বলতে শুনেছি, মায়ের সন্দেহ হিংসেয় বাবাই লোক লাগিয়ে ডাকুয়ার এই হাল করেছে কি না—নইলে হরিণ মারতে গিয়ে কেউ মানুষ মেরে বসে।

শুনে আমার মনে সেই সন্দেহটাই চাড়া দিয়ে উঠেছিল।—হিংসে! বাবা কেন আংকল ডাকুয়াকে হিংসে করতে যাবে!

পাশের ঘরে এসে দাঁড়াতেই আংকল মনোহর ডাকুয়া সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দেখে দেখে এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে মুখের ওই শুকনো ক্ষত এখন আর চোখে ধাক্কা দেয় না। ভালো করে কয়েক পলক দেখে নিয়ে জিগ্যেস করল, তোমার হঠাৎ কি হয়েছে বলো তো?

আমি চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে ফিরে জিগ্যেস করলাম, আমার হঠাৎ বিষম কিছু হয়েছে শুনে তুমি অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে এ-ভাবে ছুটে চলে এলে?

সেই ছেলেবেলা থেকেই মীনা মাসি আর আংকলএর সঙ্গে বাংলা বলি আর তুমি করে বলি।

আমার এমন ঠাণ্ডা মুখ দেখে আর ঠাণ্ডা গলা শুনেই বোধহয় মনোহর ডাকুয়ার বিব্রত মুখ।—না, তোমার মাসি ফোনে বলল, তুমি কাল যাচ্ছ না বলে দার্জিলিং যাওয়া ক্যানসেল করে দিতে। পরে কথা হবে বলে ফোন রেখে দিলে। কি ব্যাপার ভেবে পেলাম না তাই তক্ষুণি আবার তাকে ফোন করলাম, কিন্তু সে তখন ক্লাসে···তাই জানতে এলাম কি হল।

···জীবনে এমন জন্মদিন কি কারো কেটেছে। কচি ছেলেকে চাবুকের ঘায়ে আধমরা করলাম, গ্র্যাণ্ড জেরিকে ডাকলাম না, বলা সত্ত্বেও রঙিলা এখন পর্যন্ত উপোস করে আছে, মীনা মাসির এত তোড়-জোড়ের দার্জিলিং যাওয়া পণ্ড। এই দিনের আরো অনেক বাকি। বিলি ফিরলে তাকে কি অবস্থায় দেখব কে জানে।

দুই এক পা এগিয়ে মনোহর ডাকুয়ার সামনে দু'হাতের মধ্যে দাঁড়ালাম। বললাম, আংকল, একবার তোমার একটা মস্ত অনুরোধ

আমি রেখেছি ভোলোনি বোধ হয়, আজ তুমি আমার একটা কথা রাখবে ?

মনোহর ডাকুয়া হকচকিয়ে গেল। তার যে অনুরোধ আমি সত্যি রেখেছিলাম মনে পড়লে ভদ্রলোকের আজও ধড়ফড় করে ওঠারই কথা। এখন আর সুন্দর নয় আদৌ কিন্তু অত ফর্সা মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জিগ্যেস করল, কি কথা··· ?

—যেমন করে হোক মানা মাসিকে বুঝিয়ে কাল তুমি নিয়ে যাও, আমার জন্য তোমাদের যাওয়া বন্ধ হলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। কথা রাখতে পারবে ?

আমার এই মধ্যে মিনতির সুরই স্পষ্ট লক্ষি। আংকল ডাকুয়া জবাব দিল, তা পাবব।···কিন্তু তুমি কেন যেতে পারছ না ?

এই সময় জবাবদিহি করার মেজাজ নয় ভেতরটা অসহিষ্ণু তক্ষুণি। বললাম, জেরা কোরো না, শুধু জেনে রাখো এই দু'দিনের মধ্যে আমাকে জীবনের একটা মস্ত মীমাংসার মধ্যে পৌঁছুতে হবে। তুমি কথা দিয়েছ মানা মাসিকে কাল নিয়ে যাবে।

আমতা-আমতা করে বলল, তাতো হল, কিন্তু আমি বলছিলাম, এ সপ্তাহটা অপেক্ষা করে না-হয় পরের সপ্তাহে সকলে মিলে যাওয়া যাবে—

আমি রাগত স্বরে বলে উঠলাম, বিধান রায় তোমাদের জন্য এক সপ্তাহ ধরে দার্জিলিঙে বসে থাকবে ?

জবাবে মনোহর ডাকুয়া হাসল। —শোনো, আসলে তোমাকে বাড়ি থেকে বার করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, ডক্টর রায়ের আসাটা উপলক্ষ শুধু···।

আমার গলার স্বর অভব্য হল না বটে কিন্তু ভিতরের অসহিষ্ণুতার আঁচ টের না পাওয়ার কথা নয়।—আংকল, যা বললাম মনে রেখে তুমি এসো এখন, আমার এখনো খাওয়া হয়নি, আমার জন্যে রঞ্জিলাও অপেক্ষা করছে।

আর কথা না দাঁড়িয়ে মনোহর ডাকুয়া চলে গেল। আমার

ভিতরের মেজাজের সঙ্গে মীনা মাসির থেকেও আংকল্ বেশি পরিচিত। আধ মিনিটের মধ্যে তার গাড়ির শব্দ মিলিয়ে গেল।

এরপর ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসতেই হল। নইলে রঙিলাকে বকে ঝকেও খাওয়ানো যাবে না। আজকের তো নয়, মায়ের বয়সী মায়ের আমলের মানুষ।

খেতে বসে বারবারই ছেলেটার কথা মনে পড়ছে। টেবিলের কোণের দিকে বসে রঙিলাও খাচ্ছে। এটুকু সময়ের মধ্যে একটা প্রশ্ন অনেক বার আমার ঠোঁট পর্যন্ত এসেছে। সকালে স্কুলে যাবার সময় বিলি যা হোক কিছু মুখে দিয়ে যেতে পেরেছে কিনা, ওটুকু শক্তিও ওর ছিল কিনা। আবার এ-ও ভাবছি, হয়তো খেয়েছে, যে করে হোক আধ মাইল দূরেব স্কুল পর্যন্ত হেঁটে যেতে পেরেছে যখন খেতেও পেরেছে। আবার মনে হচ্ছে এই মায়েরই তো ছেলে বিলি, তার গোঁ কিছু কম হবে কেন। পড়ে পড়ে অমন মারটা খেল যখন উঠে ছুটে পালিয়েও তো যেতে পারত। তার বদলে মাটিতে গড়াগড়ি খেল। গলা দিয়ে আর্তনাদ করলেও হয়ত আমি ওর ভিতরের সেই ভীষণ কীটটাকে ছেড়ে ওর দিকে সচেতন হতাম, থেমে যেতাম। কিন্তু গায়ের চামড়া ফেটে ফেটে গেল তবু মুখ দিয়ে উঃ-আঃ ছাড়া আর কোনো বড় শব্দ বার করল না।...রঙিলার টানাটানিতে খেতে বসেছে হয়তো, ব্যথা-বেদনা ছাড়া শুধু গোঁ ধরেও ও-ছেলে না খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, বিলি খেতে পেরেছে কিনা এখনো আমি রঙিলাকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। নিজেরই ভিতরের সেই এক জনের নিষেধ, বাইরের এই আমি'র থেকে যে ঢের বেশি শক্তি ধরে।

এবারে বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। বারান্দা থেকে একটা ডাক ভেসে এলো, মেমসাব্—

ডাক্‌টা কানে যেতেই খাওয়া ফেলে চমকে দাঁড়িয়ে উঠলাম। স্কুলের দারোয়ানের গলা। ওই রকম তুই একজন ছাড়া আমাকে কেউ মেমসাব বলে ডাকে না। পরের মুহূর্তে সংযত করলাম নিজেকে। রঙিলা বড় বড় চোখ করে আমার দিকে চেয়ে আছে। বেসিনে হাতটা

ধুয়ে বেরিয়ে এলাম। চিরকুট হাতে দরোয়ান বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সেলাম ঠুকল।

বুকের তলার ধুপ ধুপ শব্দ নিজেই কানে শুনছি। ওই চিরকুটে বিলির খবর ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। কি দেখব…। জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে আছে? এমন কিছু ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে?

ওর কাছ থেকে চিরকুটটা হাতে নিয়ে খুললাম। তারপর বুকের তলার জগদ্দল পাথরটা গলে গলে হালকা হতে লাগল।

চিরকুট মীনা মাসির। তোর আংকলকে যাওয়া ক্যানসেল করার জন্য ফোন করেছিলাম। এই মাত্র তার পাল্টা ফোন পেলাম। বলছে, এই শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল করা সম্ভব হল না, অন্য লোককে বাতিল করে গাড়ি অ্যালটমেণ্ট হয়ে গেছে, তেল স্যাংশন হয়ে গেছে, ড্রাইভারের অন্ ডিউটি ছুটির ব্যবস্থা হয়েছে—এ অবস্থায় যাওয়া বন্ধ করলে ভবিষ্যতে আর গাড়ি চাওয়াব মুখ থাকবে না। তাই যেতেই হবে। কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে শীলা, তুই না গেলে আমাদের সব আনন্দ মাটি, তাই বিশেষ অনুরোধ আর একবারটি চেষ্টা করে দেখ্ কাল আমাদের সঙ্গে যেতে পারিস কিনা। আমি খুব খু-উ-ব আশা করছি।—মীনা মাসি।

শোবার ঘরে এসে প্যাড টেনে নিয়ে লিখলাম, লক্ষ্মী মেয়ে মীনা মাসি, না জেনে আবার তুমি সেই ডানাভাঙা পাখিকে আদর করতে গিয়ে ব্যথা দিচ্ছ। তোমাকে বলেছি, সামনের দুটো দিন আমার একটা বিশেষ মীমাংসার দিন—তাই, ভবিষ্যতে যদি আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ না করতে চাও, তাহলে অবশ্য কাল তুমি আংকলের সঙ্গে দার্জিলিং যাচ্ছ।—শীলা।

চিঠিটা দরোয়ানের কাছে দিতে সে সেলাম বাজিয়ে চলে গেল। ভিতরের তাড়না সত্ত্বেও ওকে জিজ্ঞাসা করা গেল না, কোনো ছেলে স্কুলের সিক্ রুমে শুয়ে আছে কি না।

…আংকল ডাকুয়া খুব কৌশলে আমার কথা রেখেছে। মানুষটা বুদ্ধিমান সন্দেহ কি।

রঙিলা হাত তুলে বসেছিল। আমি ফিরতে উদগ্রীব চাউনি। সে-ও বিলির অসুস্থতার খবরই আশা করছিল তাতে কোন ভুল নেই। বললাম, কিছু না, মীনা মাসির চিঠি।

খেতে বসে গেলাম। খাওয়া বলতে নাম মাত্র কিছু মুখে তুলে উঠে গেলাম।

মনে হচ্ছিল কত বেলা না জানি হয়ে গেল। ভিতরে সেই থেকে দুঃসহ একটা উৎকণ্ঠা বয়ে বেড়াচ্ছি বলেই হয়তো ও-রকম মনে হচ্ছিল। ঘরে এসে ঘড়ি দেখলাম। মাত্র একটা কুড়ি। সময়ে ফিরলে বিলির আসতে এখনো তিন ঘণ্টা। এই ছটফটানি থেকে রেহাই পাব কি করে?

॥ তিন ॥

সামনের কাঠের বারান্দায় ডেক চেয়ারটা এনে পেতে বসলাম কিন্তু একভাবে দশটা মিনিটও বসে থাকতে পারছি না। খানিক বসি। উঠি। পায়চারি করি। আবার এসে বসি। কেন মরতে স্কুলটা কামাই করলাম। স্কুলে থাকলে ছেলেটার কি হল না হল চোখ রাখতে পারতাম। কিন্তু বরাবরই দেখে আসছি, যা করি তার মধ্যে সব সময় আমার নিজের খুব একটা হাত থাকে না।

দিনটা মেঘলা। উঠে পায়ে পায়ে সিঁড়ির সামনে দাঁড়ালাম। হাওয়া নেই বললেই চলে। শালজুড়ির বড় গাছগুলো সব মাথা উঁচিয়ে নিথর দাঁড়িয়ে আছে। শালজুড়ির জঙ্গলে ঢুকতে হলে হাঁটা পথে মিনিট বারো লাগে। ছেলেবেলায় ছুটির দিনে ওখানে গিয়ে কত হুটোপুটি করতাম। জঙ্গলের রোমাঞ্চ একটা ভিন্ন জিনিস। বেশি ভিতরে ঢুকলে বাঘ ভালুক বুনো জানোয়ারের অভাব নেই। বাবার সঙ্গে হাতিতে চেপে তা-ও ঢুকেছি। মায়ের ভীষণ আপত্তি সত্ত্বেও।

এখানকার এই জল-বাতাসেই মায়ের জন্ম-কর্ম। কিন্তু এই শালজুড়িকে মা কখনো ভাল বাসতে পারেনি। জঙ্গল তার কাছে বিভীষিকা। জীবনে কখনো বিশ-তিরিশ গজ ভিতরে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ। মা তার ছেলে-বেলায় শুনেছিল, জঙ্গলের ভিতরে শিশু গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পেঁচানো তিরিশ হাত লম্বা আর এক-গজ বেড়-এর এক বিরাট ময়াল সাপ কবে কাঠ-কুড়ুনি এক জংলি মেয়েকে নিঃশ্বাসে টেনে নিয়ে আধখানার ওপর গিলে ফেলেছিল—মেয়েটার মাথা থেকে পেট পর্যন্ত যখন ওটার পেটে, তখন জনাকতক হাটুরে জঙ্গলের সেই হাঁটা পথ ধরে ঘরে ফিরছিল। ওই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে তাদের সোরগোল চেঁচামিচিতে বীটম্যান আর জঙ্গল পাহারাদাররা ছুটে এসেছে। অনেক কসরত করে সেই ময়ালটাকে মারা হয়েছে। তারপর দু'পা ধরে টেনে সেই জংলি মেয়েটাকে বার করে আনা হয়েছে। কিন্তু তার ঢের আগেই মেয়েটা মরে ওই ময়ালের পেটের মধ্যে আধ-সেদ্ধ।

মায়ের মুখে সেই বিভীষিকার গল্প যে কত বার শুনেছি ঠিক নেই। মায়ের ধারণা আমার স্বভাবটাও সেই ছেলেবেলা থেকে জংলি গোছের। নইলে জঙ্গলের ওপর এত টান হয় কি করে? তাই ওই ভয়ানক গল্পটা বলে বলে জঙ্গল সম্বন্ধে মা আমার মনে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাইত। এমন করে বলত যেন সমস্ত ব্যাপারটা তার স্বচক্ষে দেখা। কিন্তু দিনের বেলায় আমার মনে ভয়-ডর থাকত না। গ্র্যাণ্ডির বায়নাকুলার নিয়েই তো জঙ্গলের দশ-বিশ গজ অন্তত একাই কত টহল দিয়েছি। একা থাকলে তার বেশি ভিতরে যাবার সাহস অবশ্য হত না। কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে অনেক সময় মায়ের ওই ময়াল সাপের বাচ্চা জংলি মেয়েটাকে টেনে নেওয়ার গল্প মনে পড়লে সত্যি গা ছমছম করত।

জঙ্গলে যাবার জন্য মায়ের হাতে মার তো খেতামই, এই অপরাধে বাবাকেও কম কটু কথা শুনতে হত না। এমন অদৃষ্ট না হলে কি মা-কে আর জঙ্গলের অফিসারের হাতে পড়তে হয়! জঙ্গলের অফিসার আর জংলির মধ্যে মা খুব একটা তফাৎ দেখে না। একটু বড় হয়ে মায়ের

ওই ক্রুদ্ধ খেদের কথা শুনলে আমার হাসি পেত। মা বাবার হাতে পড়েছে না আমার গোবেচারা বাবা মায়ের হাতে পড়েছে!

প্রায়ই মায়ের ভবিষ্যত বাণী শোনা যেত, আমাকে কোন্‌দিন সাপের পেটে বা বাঘের পেটে বা ভালুকের পেটে যেতে হবে। ভালুকের ভয়ও মায়ের কাছে আর এক বিভীষিকা। জঙ্গলের পাশের রাস্তা ধরে আসতে যেতে হলে আমার হাত ধরে মা জঙ্গলের দিকটা ছেড়ে রাস্তার উল্টো দিক ধরে যেত তার ভয়, রাস্তা থেকেই ময়াল সাপ নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারে। আর ভালুক একটা তো যে-কোনো সময়ে রাস্তা আগলে বসে থাকতে পারে। প্রাণে যদি কোন দৈবের করুণায় বাঁচাও যায়—মা-মেয়ের কারো নাক আস্ত থাকবে!

ভালুকের খপ্পরে পড়লে নাক আস্ত না থাকার ব্যাপারটা মায়ের মাথায় কে ঢুকিয়েছে জানি না। মায়ের ওই ভালুকাতঙ্কের পিছনে যে কারণ, তার সঙ্গে নাক না থাকার ঘটনাটা বিশেষ কোনো যোগ নয়। এই শালজুড়ি জঙ্গলেরই এক ছোকরা বীটম্যান ভালুকে ধরেছিল। আমার বয়েস তখন ছয়-সাত হবে। কালিম্পঙ স্কুলের ভেকেশনের সময় সেটা, তাই আমি তখন এখানে। আহত আধ-মরা লোকটাকে অন্য সকলের সঙ্গে আমিও দেখেছি। গা ঘুলিয়ে ওঠার মতোই বীভৎস ব্যাপার। লোকটার সমস্ত মুখই আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিয়েছিল ভালুকটা। হাসপাতালে নেবার কিছু দিনের মধ্যে মরেই গেছল। ছোট ভালুক সাধারণত মানুষ দেখলে পালিয়েই যায়। দুই একটা বড় জাতের হিংস্র ভালুকের মুখোমুখি হলে বিপদ বটেই কিন্তু তারাও তা বলে রাস্তার দিকে আসে না বড়। কেবল, যখন মহুয়া ফোটে তখন জঙ্গলে একটু সাবধানেই চলা ফেরা করতে হয়। মহুয়ার গন্ধ সে সময় আমাদের বাংলোয় বসে বাতাস টানলে নাকে আসে। শুধু এই জন্যেই জঙ্গলের এত কাছে বাংলো তৈরি করাটা দিদিমা আগনেসের নির্বুদ্ধিতার কাজ ভাবে মা। যা-ই হোক, মা কবে কোথায় শুনেছে, ভালুকের সব থেকে বেশি পছন্দ মানুষের নাক।

বাগে পেলে দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষকে জাপটে ধরে ভালুক নাকি প্রথমেই ধারালো জিভ দিয়ে তার নাক চাটতে থাকে। চেটে চেটেই নাক উড়িয়ে দেয়। তেমন খিদে না থাকলে শুধু নাকটা খেয়েই ছেড়েও দিতে পারে। আমাকে মা কত দিন ভয় দেখিয়েছে, ধর, শুধু নাকটা খেয়েই ভালুক তোকে ছেড়ে দিল, তখন দেখতে কেমন হবে?

আমি ভেবে পেতাম না, মানুষের শরীরের মধ্যে নাকটা এমন কি জিনিস যে ভালুকের ওটা অত প্রিয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নাকটা নেই কল্পনা করতে গিয়ে সত্যি বিতিকিচ্ছিরি লাগত।

জঙ্গল সম্পর্কে আমার যা-কিছু অভিজ্ঞতা আর জানার ব্যাপার তা সবটুক বিরজু পলিয়ার কাছ থেকে শোনা। পলিয়া বাবার জিপের ড্রাইভার। যেমন পালোয়ান তেমনি সাহস। বাচ্চা বয়েস থেকে তার সঙ্গে আমার ভারী ভাব। যখন সে ড্রাইভার হয়নি তখন থেকেই। এদের সঙ্গে মেলামেশাটা মায়ের আবার দু'চক্ষের বিষ। তার ধারণা, এই সব আদিবাসী নেটিভরা জাদু জানে। শুধু আদিবাসী কেন, ভদ্রলোক নেটিভদের ওপরেও বিশ্বাস নেই। তার আসল মেমসায়েব মা আগনেস দিলীপ ব্যাণ্ডোর মতো একজন নেটিভকে বিয়ে করে বসেছিল কোন্ বিবেচনায়? মাথা ঠিক থাকলে কেউ এমন কাজ করে! তাছাড়া এর থেকেও কত তাজ্জব কেলেংকারির খবর মা রাখে। কোন্ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে নাকি এখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা হাতীর মাহুতের সঙ্গে পালিয়ে গেছল। কালো পাথরের একটা দৈত্যের মতো ছিল নাকি সেই আদিবাসী মাহুতটা। পরে কিছু বড় হয়ে বাবার মুখে শুনেছি, সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে আসলে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের একজন ভারতীয়কে বিয়ে করার জন্য ওই মাহুতের সাহায্যে পালিয়েছিল। কিন্তু মায়ের মাথায় একবার যা ঢুকবে জগতে সেটাই একমাত্র সত্য। যাক, আমার জন্যেই ওই পলিয়াকে মা বিষ চোখে দেখত। আমি ফাঁক পেলেই পলিয়ার জিপে উঠি, বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য বায়না করি। কতদিন মা বাবাকে শাসিয়েছে, ওই

পলিয়াই একদিন মেয়েকে নিয়ে শালজুড়ি থেকে উধাও হবে দেখে নিও

আমার বয়েস তখন বড় জোর বারো, কালিম্পঙে মা জারভিসের স্কুলে ক্লাস সেভেনএ পড়ি, আর পলিয়ার কম হলে তিরিশ। ঘরে বউ আছে, ছেলে-মেয়ে আছে। তাই মায়ের ওই সব কথা বাবা বা আমি কেউ গায়ে মাখতাম না। ভালুক মানুষের নাক সব থেকে বেশি পছন্দ করে কিনা, আর খিদে না থাকলে শুধু নাক খেয়ে ছেড়ে দেয় কিনা পলিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মা এই কথা বলেছে শুনে পলিয়া হেসে বাঁচে না। কিন্তু মুখে বলেছে, মেমসাহেব যখন ওইরকম বলেছে তখন নিশ্চয় তাই —অন্যরকম বলে আমি কি চাকরি খোয়াব ?

…বিরজু পলিয়ার কথা মনে হলে আমার মনটা দারুণ খারাপ হয়ে যায় এমন ভয়াল পরিস্থিতিতে আমরা জীবনে পড়িনি। বাবা বরাবরই মাতলাহাটি রিজারভ ফরেস্টের অফিসার। আমার স্কুল ছুটি থাকলে, অর্থাৎ আমি কালিম্পঙ থেকে তখন এসে এখানে থাকলে বাবা শালজুড়ি থেকে জিপে যাতায়াত করত। আর সেই জিপে বাবার সঙ্গে তখন আমিও কম ঘুরতাম না। এক একদিন বাবার সঙ্গে মাতলাহাটি ফরেস্টেও চলে যেতাম। মা আগে জানতে পারলে বকা-বকি রাগারাগি করে আমার যাওয়া বন্ধ করত। তাই বাবার সঙ্গে সড় করে আমি আগের ভাগে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার কোথাও অপেক্ষা করতাম। বাবা আমাকে জিপে তুলে নিয়ে রাস্তার কাউকে বাড়িতে খবর দিতে বলে দিত। ফিরে এলে মা তেলে-বেগুনে জ্বলত। বাবা জবাবদিহি করত, মেয়ে যাবার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দিল, কি করা যাবে। আমি কান্নাকাটি করার মেয়ে নই মা খুব ভালো করে জানে রাগের মাথায় মা আমাকে ধরে ঝাঁকুনি দিলে আমি বলতাম, বা রে, আমি সঙ্গে গেলে বাবা খুশি হয়, যাব না কেন ?

মায়ের জন্যই বাবার সঙ্গে আমার বেশ একটা মজার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার জোর জুলুম বা মেজাজের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাবাতে আমাতে আগে শলা পরামর্শ করে নিতাম। কিন্তু সেবারে

এমন ভয়ংকর দুর্যোগ আমাদের সামনে হাঁ করেছিল কে জানত।...
জিপে করে বাবার সঙ্গে মাতলাহাটি ফরেস্ট থেকে ফিরছিলাম। দুপুর পেরিয়ে বিকেল তখন। বিরজু পলিয়া জিপ চালাচ্ছে। তার পাশে বাবা। শেষে অর্থাৎ ধারে আমি। পাছে পড়ে যাই এই ভয়ে বাবা আগে আমাকে বারবার সাবধান করত, কিন্তু এখন আর তার দরকার মনে করে না, কারণ ততদিনে আমি দিব্বি সেয়ানা হয়ে উঠেছি। ধারে ছাড়া আমার বসতে ভালো লাগত না, বসতামও না।

...আকাশ মেঘলা ছিল। দু'দিকে গভীর জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। পলিয়া সাঁ সাঁ করে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি আসছে দেখলে বুনো মুরগীর দল, খরগোশ, কখনো বা ময়ূর ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করে রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলে সেধোয়। আমার দেখতে দারুণ মজা লাগে। হঠাৎ কাছাকাছির মধ্যে মেঘের ডাকের মতো একটা গর্জন কানে এলো। তারপরেই দেখি মস্ত একটা ডোরাকাটা বাঘ রাস্তা পার হতে যাচ্ছে—একেবারে দশ বারো গজের মধ্যে। জিপটা তখন বলতে গেলে হুড়মুড় করে তার গায়ে পড়তে যাচ্ছে—হর্ন আর জিপের শব্দে ঘাবড়ে গিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে ওটা জিপের ওপরেই লাফিয়ে পড়ল, তারপর ছিটকে পড়েও গেল। আমার শরীরের সমস্ত রক্ত সেই কয়েক পলকের মধ্যেই হিম। আরো পঞ্চাশ ষাট গজ গিয়ে জিপটা থেমে গেল, আর পলিয়া বাবার গায়ে ঢলে পড়ল।

তারপর, হায় ঈশ্বর, এ কি দেখলাম। পলিয়ার মুখের একদিকের মাংস নেই, আর ছিটকে পড়ার আগে বাঘ তার একটা বাহুর হাড় মাংস শেষ করে দিয়েছে। কিংবা হয়তো একটা থাবা ওই বাহুতে আর অন্য থাবা মুখে এসে পড়েছিল। তক্ষুনি পিছনে আবার বাঘের গর্জন। ওটা জঙ্গলে ঢুকে গেলেও জিপের অত স্পিডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় ওটাও অল্প বিস্তর আহত হয়েছে। গর্জন কানে আসতে সেই অবস্থার মধ্যেও পলিয়া টপকে পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ল, আর তার জায়গায় বসে বাবা জিপ ছোটালো।

…আমি উল্টো দিক দিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যাইনি কেন সেটা আজও আমার কাছে বিস্ময়।

পলিয়া বাঁচেনি। সেই বারো বছর বয়সে তার জন্য আমি বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছি। কিন্তু পলিয়া এমন অপঘাতে মরল সে-জন্য মায়ের দুঃখ দেখিনি। তার কাছে ওদের কি-ই বা জীবনের দাম। কিন্তু এই দুর্ঘটনার ফলে মায়ের দুর্জয় রাগ বাবার ওপর। বাবারও কত বড় ফাঁড়া কেটেছে সে কথা কে বলে। চিৎকার করে সকলকে শুনিয়েছে বাঘে আমাকে তুলে নিয়ে গেলে বা আঁচড়ে কামড়ে ফালা-ফালা করে দিলে বাবার শান্তি হত। সে-রকম ইচ্ছে নিয়েই নাকি মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে বাবা যখন-তখন আমাকে নিয়ে জঙ্গলে ঘোরে। আর মেয়েকে খতম করতে পারলে তারপর নিশ্চিন্ত মনে বাবা মা-কে খুন করবার প্ল্যান ভাঁজত।

শুনে সামনে না হোক, সকলে আড়ালে হেসেছে। আর আমি হাসব কি, আমার অদৃষ্টে তো মার। কেন আমি বাবার সঙ্গে জঙ্গলে যেতে চাই। সেই থেকে আমার জঙ্গলে যাওয়া বন্ধই এক রকম। মায়ের মারের ভয়ে নয় বা জঙ্গলের বাঘ-ভালুকের ভয়ে নয়। যা ঘটে গেছে, লোকালয়ে তা কখনো ঘটে না। কিন্তু জঙ্গলে পা দিতে গেলেই বিরজু পলিয়ার মুখখানা আমার চোখে ভাসে। পরে তার বউ আর মেয়ের কি হয়েছে এখানকার কেউ আর সে কথাও ভাবে না। ডিউটির কালে ওই অঘটন বলে বাবা অবশ্য লেখালিখি করে পলিয়ার বউকে কিছু টাকা পাইয়ে দিয়েছিল।

…অনেক বছর পরে বিয়ের আগে ডিকির সঙ্গে চা-বাগানের দিকের জঙ্গলে কিছু ঘোরাঘুরি করেছি। কিন্তু সে অন্য ব্যাপার। আজ অনেক দিন বাদে আবার খুব ইচ্ছে হল পায়ে পায়ে ওই জঙ্গলেই চলে যাই।

রোদ নেই, ভালো লাগবে। ইচ্ছেটা তক্ষুনি বাতিল করলাম। কারণ এ-রকম ঠাণ্ডা দিনেই জঙ্গলে আদিবাসী ছেলেগুলো বেশি হামলা করে। পাথর ছুঁড়ে বা লাঠিপেটা করে নিরীহ জীবগুলোকে বড় নৃশংস-

ভাবে মারে। ওরা গরিব বুঝতে পারি। মাংসের লোভে এই করে। একবার ছ'তিনটে ছেলেকে পাথর ছুঁড়ে কি সুন্দর একটা ময়ূরকে মারতে দেখেছিলাম। কি ছটফট করতে করতেই না মরল ময়ূরটা। একটা পাথর লাগতে ওটা পড়ে গেল। তারপর পাথর বৃষ্টি। মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। বাবার কাছে এই নিয়ে নালিশ করেছিলাম। বাবা মাতলাহাটির ফরেস্ট বাংলোয় থাকত, সপ্তাহে জিপ নিয়ে প্রায়ই আসত, আর আমার জন্য শনি রবিবারে শালজুড়িতে থেকে যেত। আশ্চর্য, মা কিছুতে মাতলাহাটির বাংলোয় গিয়ে বাবার কাছে থাকতে চাইত না। নিজেও যাবে না, আবার বাবাকে নিয়ে কুৎসিত সন্দেহ। আমাকে ছোট ভেবে আমার সামনেই যা মুখে আসে তাই বলত। এখানকার কুলি-মেয়ে বা চা-বাগানের কালো মেয়েগুলোর যৌবন সাদা চামড়ার মানুষগুলোকে পাগল করে ছাড়ে বলে মায়ের বিশ্বাস। এই জঙ্গলের পরিবেশে এমন ঘটনা ঘটেনি এমন নয়। মা সাদা চামড়ার সব পুরুষদেরই এই চরিত্র স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে বসে আছে। বাবার মাতলাহাটির বাংলোয় ঘর-দোর ঝাঁটপাট দেবার জন্যও কোনো মেয়েছেলে ঢুকেছে শুনলে মা হয়তো স্বামী সংহারের কেরামতি দেখিয়ে ছাড়ত।

আমি কালিম্পঙে চলে গেলে মা শুধু রঙিলাকে নিয়েই এই শালজুড়ির বাংলোয় থাকত। দিদিমার নামে দিদিমা আগনেসের করা এই বাংলোর সর্বময়ী কর্ত্রী এবং অধিশ্বরী। বাবাকে সেটা উঠতে বসতে টের পেতে হত। কিন্তু বাবার এত সাহস ছিল না যে বলে তুমি তোমার বাংলো নিয়ে থাকো, আমি আমার ব্যবস্থা দেখছি। ও-রকম বলার হিম্মত বাবার নেই। তাছাড়া আমাকে না দেখে বাবা থাকবে কি করে। তাই এখানে এলে মায়ের দাপটে বাবার ঘর-জামাইয়ের দশা।

ময়ূর বা নিরীহ জীব মারার নালিশ শুনলে বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত কড়া শাসনে এ-সব অত্যাচার বন্ধ করা হবে। কিন্তু কিছুই হত না। আমাদের ধারণা বাবা মানুষটা এত নিরীহ যে তাকে তার

কর্মস্থলের মানুষেরাও খুব একটা ভয় করত। শালজুড়ির জঙ্গল বাবার আওতার মধ্যে না হলেও সতীর্থ অফিসারকে তো অনায়াসেই বলে দিতে পারত। এসব কারণেই জঙ্গল ছেড়ে আমার বরং পাহাড়ী নদী কালজানির দিকে বেড়াতে ভালো লাগত। নদীটা উঁচু থেকে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে সমতলের দিকে গেছে। পাহাড়ী দিকটার জলে রূপোর মতো কত রকমের মাছ ঝিকমিক করে ঠিক নেই। পাথরের ওপর সারি সারি বক বসে থাকে বেড়াল তপস্বীর মতো। টুক টুক করে জল থেকে পছন্দসই মাছ তুলে নেয়। কালজানিরও দু'দিকে জঙ্গল আর বড় বড় পাথর। আর ওখানকার জঙ্গলের দিকটা কি নির্জন। আমি ওদিকেই বেশি যেতাম।

কালজানি নদী বা পাথুরে জঙ্গলের কথা মনে এলেও মায়ের কথা মনে পড়বেই। এমনিতে সব জঙ্গলই মায়ের দু'চক্ষের বিষ। বাবা জঙ্গলের অফিসার বলেই বোধহয় আরো বেশি। কিন্তু মনোহর ডাকুয়ার অমন অ্যাকসিডেন্টের পর আর ওদিকে গেছে শুনলে একেবারে ক্ষেপেই যেত। চেঁচিয়ে বলত, পাথর লেগে মনোহরের মতো কিছু হলে তোকে আর হাসপাতালে যেতে হবে না, না মরিস যদি তোর বাবার বন্দুক দিয়ে আমিই তোকে গুলি করে মারব!

আমি মুখে কিছু বলতে সাহস পেতাম না। মনে মনে ভাবতাম আংকেল ডাকুয়ার মতো কপাল মুখের এক দিক অমন বীভৎসভাবে থেবড়ে গেলে আমার মরাই ভালো। এর পর কালজানির দিকে গেলে মায়ের কাছে চেপেই যেতাম ···মায়ের মাথার বিকৃতির পিছনে অনেক কারণ আমি জানি। তার মধ্যে মনোহর ডাকুয়াকে ভালবাসাও একটা কিনা, সে সম্বন্ধে আজও নিঃসংশয় নই! মা তাকে যত প্রশ্রয় দিত আর কাউকে তেমন নয়।

আমাকে নিয়েও নানান বাজে ভাবনার ফলে মায়ের মাথা গরম হয়ে থাকত।···ছেলেবেলা থেকে সকলের মুখে আমার খুব সুনাম আমি নাকি ভারী ঠাণ্ডা মেয়ে। মায়ের বন্ধুরা বলত, তোমার মেয়েটা

যেমন মিষ্টি তেমনি ঠাণ্ডা, ধরে চটকালেও আঃ-উঃ করে না—আমাদের গুলো বিচ্ছু একেবারে।

মা এই প্রশংসার উল্টো মানে করত। ভাবত, ঘুরিয়ে বন্ধুরা তার মেয়েকে বোকা হাবা বলছে। সামান্য দোষ করলে, এমন কি অনেক সময় বিনা দোষেও মা আমার গালে ঠাস ঠাস চড় বসিয়ে দিত। ফর্সা, গালে আঙুলের দাগ বসে যেত। আমি যদি হাউমাউ করে কেঁদে উঠতাম, বা গলা ফাটিয়ে বলে উঠতাম, শুধুমুদু মারছ কেন, আমি কি করেছি ?—তাহলেও বোধহয় মা আমার মধ্যে তাপ উত্তাপ বোধ আছে এমন একটা স্বাভাবিক মেয়ের হদিস পেত। কিন্তু অতবড় চড় খেয়েও হাঁ করে মায়ের দিকে চেয়েই থাকতাম, শাস্তির কারণ বুঝতে চেষ্টা করতাম···আর মা যা শুনতে চায় কান্না বা চিৎকারের বদলে ওই প্রশ্নই আমার দু'চোখে উপছে উঠত, কেন মারছ ? আমি কি করেছি ? কিন্তু কোনো বোবা প্রশ্ন মা বুঝত না, উল্টে ক্ষেপে গিয়ে আরো তেড়ে আসত।

কি মনে হতেই ভাবনায় ছেদ পড়ল। বুকের তলায় এক মায়ের মন হাহাকার করে উঠতে চাইল। আমার এই জন্ম দিনে বিলিকে মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছি। এমন মার কোনো ছেলেকে কি তার মা মারে ! আমার মা যে আমাকে কথায় কথায় এতো মারত সে-কি এই মার ? এমন নিষ্ঠুর মার কি আমার মা আমাকে কখনো মেরেছে ? মনে মনে বার বার বলতে লাগলাম, আমি বিলিকে মারিনি, যে বীভৎস কীট বিলিকে ধ্বংস করত, কুরে কুরে খেত আমি শুধু তাকে মেরেছি—মারতে চেয়েছি। বিলিকে নয়, বিলিকে নয়।

কিন্তু এ চিন্তাও কি মায়ের মতোই অন্য ধরনের বিকৃতি। আজ সকালে ওই মারের সময় বিলির বাবা ডিকি যদি সামনে থাকত তো কি হত ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই মার দেখত ? ভাবতে গিয়েই আমার চোখের সামনে বাবার মুখ। এত নিরীহ আর এত ভদ্র বাবাও মেয়ের ওপর মায়ের অত্যাচার দেখলে সহ্য করতে পারত না। সে-সব প্রহসন মনে পড়লে এই মানসিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও হাসিই পেয়ে যায়।

…মায়ের শাসন নিয়ে বাচ্চা বয়েস থেকেই আমি কিছু গবেষণা করেছি। শাসন বলতে বাবাকে নয়, আমাকে। লক্ষ্য করতাম, বাবা কাছে থাকলে বা বাড়িতে থাকলেই মা আমার ওপর বেশি চড়াও হত। আমাকে ভালো মেয়ে বা ঠাণ্ডা মেয়ে বলে বন্ধু বান্ধবীরা মায়ের মেজাজ বিগড়ে দিলেও মনে হত মা বাবার জন্যেই অপেক্ষা করছে। অন্য দিকে আমাকে শাস্তি দেবার বা শাসন করাব মতলব আঁচ করতে পাবলেই বাবা আগে থাকতে তৎপব হয়ে উঠত। মা কিছু বলার বা করাব আগেই বাবা আমার ওপব দখল নিত। আমাকে ধরে ঝাঁকুনি দিযে এমন হুংকার ছাড়ত যে সকলেরই মনে হবে আজ আমাকে বাবাই একেবাবে শেষ করে ছাড়বে। ফাঁক পেলেই আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে গলা ফাটিযে চিৎকাব করে মা-কে শোনাতো, আজ তোকে মেবেই ফেলব— তুই ভেবেছিস কি? টেবিল চাপড়ে গর্জন করত, নিজের এক হাত দিযে অন্য হাতে মারার চটাস চটাস শব্দ করত। আর ইশারায় আমাকে বার বার বলত কান্নার বা আর্তনাদ করে ওঠার শব্দ করতে। কিন্তু আমার তখন এত হাসি পেযে যেত যে আমি কিছুই করতে পারতাম না। এক আধ সময় উঃ আঃ শব্দ বার করতাম শুধু। কিন্তু বাবার কারসাজিটা মা কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে ফেলেছিল কিনা জানি না। আমাকে নিযে দরজা বন্ধ করার আগেই বাধা দিত। টেনে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে ঠাস-ঠাস করে মারত আর থেকে থেকে বাবার মুখের অবস্থা দেখত। আর বাবা বাড়িতে না থাকলে অনেক সময় আমি দোষ করেও মায়ের মারের হাত থেকে অব্যাহতি পেতাম।

সাদা কথায় আমার গায়ে হাত তোলাটা বাবা বরদাস্ত করতে পারত না। সময় সময় মা-কে আমার ওপর অবুঝ রকমের নিষ্ঠুর হতে দেখে অমন ভালো মানুষটার মাথায় আগুন জ্বলত। আর তখন যে কাণ্ড হত তার সমস্ত ধকল আমারই ওপর দিয়ে যেত। বাবা অনেক বোঝানো আর কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও যখন দেখত মায়ের মাথায় উল্টে খুন চাপছে, বাবা তখন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে আর একটা লাঠি-টাঠি এনে বা খালি হাতেই অন্য দিক থেকে আমাকে মারতে শুরু করে দিত।

সেটা মেকি মার নয়, সত্যিকারের মার। একদিক থেকে মা মারে তো অন্য দিক থেকে বাবা। মা থমকায় তো বাবাও থেমে আগুন চোখে মায়ের দিকে তাকায়। আবার মা মারে তো বাবারও হাত চলে। তখন আমার যে কি দশা কারোই বোধহয় হুঁশ থাকে না। তারপর মা মার থামিয়ে সভয়ে বাবাকে দেখে, নিরীহ মানুষটা হঠাৎ পাগল হয়ে গেল কিনা ভাবে হয়তো।

এক বারের এই শাসন পর্বের কথা মনে পড়লে এখন হাসিই পায়। কিন্তু তখন বাবার কাণ্ড দেখে ভয়ে আমার গায়ের রক্ত জল। আমার তখন বছর বারো হবে বয়েস। শীতের লম্বা ছুটিতে শালজুড়িতে এসেছি। মায়ের বিবেচনায় একটা সাংঘাতিক দোষই করেছিলাম বটে। আগেই হয়তো বলেছি মায়ের তখন বেশ কনাকতক স্তাবক ছিল। তাদের বেশির ভাগই সাগর পারের মানুষ। এ-দেশের বন্ধুদের মধ্যে মনোহর ডাকুয়া ছাড়া দুই একজন চা বাগানের পদস্থ কর্মচারীও ছিল। এদের নিয়ে অনেক সন্ধ্যাতেই বাড়িতে মদের আসর বসত। ভিতরে ভিতরে আমি তো তখন বেশ পাকা মেয়ে। সক্কলের ওপর আমার দারুণ রাগ হয়ে যেত, আংকল ডাকুয়ার ওপরেও। কারণ আমার তখন বদ্ধ বিশ্বাস, মদ খাওয়া-টাওয়া কিছু নয়, এদের সক্কলের লোভ মায়ের ওপর। যতই বিকৃত মেজাজের মেয়ে হোক, মায়ের চেহারার জলুস তো তখন মিইয়ে যায়নি। মদ খেয়ে মায়ের নেশা হলে এদেরও বেলেল্লাপনা করার আরো বেশি সুবিধে। কিন্তু সেই আসরে গিয়ে আমার কখনো দাঁড়ানো দূরের কথা, জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে কখনো উকি ঝুঁকি দিতে দেখলেও মা আমাকে আস্ত রাখবে না জানতাম।

একবার মায়ের এক সাহেব বন্ধু ছুটি কাটিয়ে বিলেত থেকে এসে মা-কে খুব একটা সুন্দর হুইস্কির বোতল প্রেজেন্ট করলে। সোনালি বাক্সয় মোড়া সেই প্যাকেটটাই দেখতে এত সুন্দর যে হাতে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। মা তো অমন একখানা উপহার পেয়ে আনন্দে আটখানা। নিজের শোবার ঘরের আলমারিতে ওটা তুলে রাখল।

আমার কাঁধে কোন শয়তান ভর করল কে জানে। পরদিন বেলা দশটা এগোরাটায় মা যখন বাথরুমে চানে ঢুকেছে, আর বসার ঘরে বাবা কি একটা বই পড়ছে—আমি তখন মায়ের ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে সেই সুন্দর হুইস্কির বাক্সটা বার করলাম। হুইস্কির রকমারি সুন্দর সুন্দর বোতল দেখেছি। ইচ্ছে, বিলেত থেকে আনা এত সুন্দর প্যাকেটের বোতলটা কেমন দেখব। এই দেখতে গিয়েই বিপত্তি। বোতল আধখানা বার করার আগেই হাত থেকে প্যাকেটটা মাটিতে পড়ে চুরমার। শব্দ শুনে একদিক থেকে রঙিলা ছুটে এসেছে, অন্য দিক থেকে বাবা। আর তার আধ মিনিটের মধ্যে বাথরুম থেকে মা বেরিয়ে এলো—আতংকগ্রস্ত মুখে বাবা তখন সবে রঙিলাকে বলছে, তোমার ম্যাডামকে বলতে হবে ওটা আমার হাত থেকে—

বাবার মুখের কথা থেমে গেল। দোর গোড়ায় মা।

প্যাকেটসুদ্ধ পড়ার ফলে বোতলের কাচ কোনো দিকে ছড়ায়নি, মেঝেতে হুইস্কি ভাসছে। বাবার কথা তো কানে গেছেই, তার ওপর আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই ব্যাপার বুঝতে মায়ের অসুবিধে হল না। মায়ের দিকে চেয়েই বুঝলাম আমার কপালে আজ মৃত্যু লেখা। বাবার মুখ দু'চোখের আগুনে ঝলসে নিয়ে হিসহিস করে বলল, আমাকে বলতে ওই বোতল তোমার হাত থেকে পড়েছে—কেমন ?

বাবার ওই উক্তির ফলে মায়ের বিচারে আমার অপরাধ বোধহয় দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে দরজার বাইরে এনে বারান্দায় ফেলল। তারপরই পাগলের মতো আবার ডাইনিং হলের দিকে ছুটল। সেই ফাঁকে বাবা মরিয়া হয়ে দু'হাতে আমাকে ইশারা করল সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ এমনি অবশ তখন, আর মাথাটাও এমনি অকেজো যে আমি বারান্দার মেঝেতে পড়েই রইলাম।

ও-দিক থেকে দেড় হাত প্রমাণ একটা লাঠি হাতে মা পাগলের মতো ছুটে এলো। বাবা চোখের পলকে আমাকে আগলে দাঁড়ালো।

কাকুতি মিনতি করে করে বলল, ওই হুইস্কি শিলিগুড়িতে পাওয়া যায়—যত দামই হোক তিন দিনের মধ্যে কিনে এনে দেওয়া হবে, মেয়েটাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দাও।

জবাবে মায়ের হাতের এক ধাক্কায় বাবা তিন হাত দূরে গিয়ে পড়তে পড়তে বাঁচল।

তারপর সেই লাঠি আমার ওপর পড়তে লাগল আমার বাঁচার চেষ্টায় এদিক ওদিক করার দরুন হোক, বা মায়ের দুর্জয় ক্রোধের ফলে হোক, আঘাতগুলো তখনো মায়ের মনের মতো অস্তুত পড়ছে। ফলে মা আরো উন্মাদের মতো হয়ে উঠছে পনের বিশ সেকেণ্ড নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে বাবা এই মারের দৃশ্য দেখল। তারপরেই যা করল, তা না করলে আমারও সেদিন আজকের বিলির দশাই হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাবা ছুটে তার ঘরে চলে গেল। পরের মুহূর্তে নিজের বন্দুক হাতে ফিরল। আচমকা মা-কে ঠিক তেমনি করেই একটা ধাক্কা মেরে তিন হাত দূরে ফেলে চোখের নিমেষে বন্দুকে টোটা ভরে নিল। আমি দিশেহারা আর মা হতচকিত কয়েক মুহূর্ত বাবার বন্দুকের নল এবার আমার দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তোর মার খাওয়া আমি চিরদিনের মতো বন্ধ করে দিচ্ছি—

মা মুহূর্তের মধ্যে লাঠি ফেলে বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর বন্দুক নিয়ে ধস্তাধস্তি। বাবা গুলি করবেই আমাকে। ঠাণ্ডা গলায় কেবল বলছে, সরো—সরো বলছি—এ জীবনে আর যাতে তুমি ওকে মারার সুযোগ না পাও তাই করব—তারপর ফাঁসি যাব! বাবা মা-কে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, আর আতঙ্কে এসে মা বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শেষে বাবার সঙ্গে পেরে না উঠে মা পাগলের মতো বুক দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে আগলে রাখল। কিন্তু বাবা তখনো আমাকে গুলি করার ফাঁক খুঁজছে।

কিন্তু সুবিধে না পেয়ে তেমনি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, এই করে আজ তুমি ওকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পাববে ভেবেছ! বন্দুকে হচ্ছে না, কিন্তু আমার রিভালভার নেই! ওকে শেষ করার

জন্য আমার, পাঁচ ইঞ্চি জায়গা শুধু দরকার—তুমি কতটা আগলাবে।

বন্দুক রেখে এবারে রিভলভার আনতে ছুটল বাবা। আমি স্বপ্নে কোনো বিভীষিকা দেখছি কিনা জানি না। কিন্তু ভয়ে আর ত্রাসে মায়ের তখন অন্য মূর্তি। আমাকে মাটি থেকে টেনে তুলে পাগলের মতোই সামলে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। বাইরে থেকে বাবার চাপা গর্জন, দরজা বন্ধ করে পার পাবে—আমি ওকে পিছনের জানলা দিয়ে গুলি করতে পারি না ভেবেছ!

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছেড়ে মা ছুটে গিয়ে পিছনের জানলা দুটো ঠাস-ঠাস করে বন্ধ করল। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে রঙিলা দরজায় ধাক্কা দিয়ে জানান দিল, সাহেব রিভলভার রেখে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, এখন নির্ভয়ে দরজা খোলা যেতে পারে। আমি তখন পর্যন্ত বিমূঢ়। মায়ের ওপর রাগ করে আমাকে গুলি করে মারত!

এর পরেও দু'দিন পর্যন্ত মায়ের ভয় কাটেনি। মনোহর ডাকুয়াকে ডেকে চুপিচুপি পরামর্শ দিয়েছে চা-বাগানের ডাক্তার দিয়ে বাবার মাথাটা যেন পরীক্ষা করানো হয়।

কিন্তু আমি ফাঁক পেয়ে জিগ্যেস না করে পারিনি। তুমি কি আমাকে সত্যি সত্যি গুলি করে মারতে নাকি বাবা?

বাবার ঠোঁটে চাপা হাসি '—মারতাম না তো বন্দুক নিয়ে গেছলাম কেন—আর কক্ষনো মায়ের জিনিসে হাত দিবি?

যা বোঝার তক্ষুণি বুঝেছি। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে হি-হি করে হেসেছি। আমার এমন নিরীহ ভালো মানুষ বাবা যে এত বুদ্ধি ধরে তা কি জানতাম!

কিন্তু দিন-কতকের মধ্যে মা-ও সম্ভবত ভেবে-ভেবে বাবার কারসাজিটা বুঝে ফেলেছিল। কথায় কথায় রাগে ফুঁসেছে তারপর। আর বছরখানেক পর্যন্ত তার সেই বিলিতি হুইস্কির বোতলের শোক আর রাগ যায়নি।

পনের ষোল বছর বয়সেও মা অনায়াসে আমার গায়ে হাত তুলেছে। আর তার পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে চাইনি বলে কুড়ি একুশ বছর বয়সেও হাত তুলে তেড়ে এসেছে।

.. বেচারা ডেভিড হারপার। তার সেই মুখ মনে পড়লে আমার হাসি পায় বটে, কিন্তু তার থেকে বেশি দুঃখও হয়।

ডেভিড হারপার এখানকার চা-বাগানের দ্বিতীয় বড় কর্তার ছেলে। তার বাবা দাপটের মানুষ। মা মিসেস হারপার এখানকার মহিলা মহলের তারকা বিশেষ শিক্ষা দাপ' চাল-চলনে এই নেটিভের দেশে বে-মানান গোছের একজন। সেটা সে সবদাই বুঝিয়ে দিত। বছরের পর বছর ধরে সকলকে বুঝিয়ে আসছে, মিস্টার হারপারের চাকরির মিয়াদ ফুরলে এখান থেকে দেশে ফিরে গিয়ে হাঁফ ফেলে বাঁচতে পারে। দেশ বলতে ইংল্যাণ্ড। মা ওই মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু সামান্য এক জঙ্গল অফিসারের স্ত্রীকে খুব একটা পাত্তা দেবার মতো মহিলা সে নয়। এই কারণে-মায়ের অনেক দিন থেকে তার ওপর রাগ।

সেই রাগের দ্বিগুণ ফায়দা তোলার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালাম আমি। মিসেস হারপারের ছেলে ডেভিডের প্রায় ছেলে-বেলা থেকেই আমাকে পছন্দ। পছন্দের মূলে কতটা আমি আর কতটা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল জানি না। ডেভিড বড় জোর আমার থেকে বছর খানেকের বড়। ছেলে বেলা থেকে আমার ওপর তার টান দেখেই হয়তো তার মা আমাকে খুব অবজ্ঞার পাত্রী ভাবত না। ডেভিড দার্জিলিং কনভেণ্টে পড়ত। প্রত্যেক ছুটি-ছাঁটায় বাবা-মায়ের কাছে আসত। তার জন্মদিনে বা তার বাবা-মায়ের বিয়ের দিনে আমার নেমন্তন্ন থাকতই। আর আমার জন্মদিনেও সবার আগে মা ডেভিডকে নেমন্তন্ন করত।

ছেলেবেলা থেকেই ডেভিড কেতাদুরস্ত সাহেবের ছেলে। সাদা জিনের হাফ-প্যাণ্ট, দামী কেমব্রিকের সাদা হাফ-শার্ট, সাদা মোজা সাদা জুতো, আর চোখ ঝলসানো রঙিন টাই তার সর্বদার পোশাক।

এখানকার দিশি মাটিতে সে যেন একমাত্র দামী সাদা বিলিতি ফুল একখানা।

কিন্তু ডেভিড আমার মন জানত না। সে মায়ের মন বুঝেই সর্ব-ব্যাপারে বিলিতিয়ানার জুলুম দেখাতো। এই দেশের মাটি, গাছ পালা জঙ্গল মানুষ আকাশ বাতাস আমার কত প্রিয় তার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। আমার দাদু দিলীপ ব্যাণ্ডোর রক্ত আমার ধমনীতে কত যে লাল তার ধারণাও ছিল না। তাই ছেলে বেলা থেকেই আমি তাকে পাত্তা দিতে চাইতাম না। ডেভিড তার কারণ না বুঝে দস্তুরমতো অবাক হত।

আমার ওর একই সময়ে ছুটি ছাঁটা, একই সময়ে ভেকেশন। তখন এমন দিন নেই যে ও আসত না। কিন্তু আমার তখন বেশির ভাগ সময় কাটত গ্র্যাণ্ডির স্টুডিওতে, বা এখানকার জঙ্গলে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। ডেভিড এসে আমাকে না পেয়ে শুকনো মুখে ফিরে যেত বলে মা আমাকে বকা-ঝকা করত। কিন্তু সেই বয়েস থেকেই কালিম্পঙে আর এক ছেলে, মানে রয় জার্ভিস যে আমার মন জুড়ে বসে আছে তা আর ডেভিড জানবে কি করে।

আমি লক্ষ্য করেছি মায়ের চোখে আমার চেহারায় যেটা ত্রুটির মতো, এখানকার ইংরেজ বা ইঙ্গ বঙ্গ ছেলেদের চোখে সেটাই একটা বড় আকর্ষণ। আমার চুলের রং কালো জামের মতো কুচকুচে কালো, চোখের তারা ভোমরার মতো কালো—মায়ের সে-জন্য ভীষণ খেদ। বাবা তো আর বাঙালী নয়, ওগুলো বাবার মতো হতে কি বাধা ছিল! কিন্তু রয় জারভিস বরাবর এই কালো চুল আর কালো চোখ দেখে মুগ্ধ। ডেভিডও তাই।

...আরো বছর কয়েক কাটতে ডেভিড বেশ চতুর হয়ে উঠল। আমার থেকে মা-কে বেশি তোয়াজ তোষামোদ করত। চা-বাগানের বড় সাহেবরা তখন বাঙালীর উৎসব-পার্বণে যেমন ভেট পেত, ক্রিশ্চিয়ানদের উৎসব-টুৎসবে সময়ও তেমনি নানা রকম ভেট পেত ফুল ফল মাছ মাংস মদ—এই সবই বেশি আসত। ডেভিড ততো

দিনে ভাপোই জেনেছে মায়ের মদ পছন্দ আর মাংস পছন্দ। সেও এইসব উৎসবের সময় মা-কে মদের বোতল আর মাংস ভেট পাঠাতে শুরু করেছিল। আমার দিকে লক্ষ্য করে এই ভাবে মায়ের মন পেতে আরো কয়েকটা ছেলে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের এই পথটা দেখিয়েছে সব-প্রথম ডেভিড হারপার। আমি ভাবতাম, ওদের বাড়িতে যে ভেট আসে মায়ের জন্য ডেভিড তার থেকেই ওই-সব চুরি করে সরায়। শেষে জেনেছি তা নয়। বাবা-মায়ের এক-মাত্র আদরের ছেলে বাড়িতে জানান দিয়েই এ-সব পাঠায়। আরো আশ্চর্য, ডেভিডের মা ছেলের উদ্দেশ্য জেনেই এ-ব্যাপারে প্রশ্রয় দিত। আমার ইচ্ছে না থাকলেও নানান উপলক্ষে ওদের বাড়িতে আমাকে যেতে হত। ডেভিড শালজুড়িতে এলে আমাকে ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করার ছল-ছুতোর অভাব হত না। আর নেমন্তন্নটা সর্বদা করত বাড়ি এসে, মায়ের সামনে।

মায়ের তাড়নায় আমাকে যেতেই হত। ওদের বাড়ি গেলে ডেভিডের বাবা আমাকে খুব একটা লক্ষ্য করত না। এত বড় সাহেব সে, ছেলের কোন্ বন্ধু বা বান্ধবী আসছে তা নিয়ে কৌতূহল থাকবে কেন। কিন্তু ডেভিডের মা বোধহয় ছেলের মনের বাসনা অনেক আগে থেকেই জানত। তাই আমি গেলে আমার সঙ্গে খুব মিষ্টি ব্যবহার করত। ছেলের অনেক গুণের কথাও বলত। তার দার্জিলিঙে কলেজের পাট শেষ হলেই তাকে দেশে অর্থাৎ বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলত। সেখানে তাকে এনজিনিয়ারিং পড়ানো হবে। সেদিকেই নাকি দারুণ ঝোঁক তার। আর ছেলের কলেজ জীবন শেষ হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে তার বাবার এখানকার চাকরির মিয়াদও শেষ হবে। তাই সব-দিক থেকেই নিশ্চিন্ত তখন।

আমি কিছুই বলতাম না। কারণ তার ছেলে তখন সবে কলেজের মুখ দেখেছে। কলেজের পড়া শেষ হতে আরো প্রায় চার বছর দেরি। ডেভিড বয়সে আমার থেকে যেমন মাত্র বছর খানেকের বড়, পড়তও এক ক্লাস ওপরে। সে আশায় আছে, সামনের বছর আমিও

দার্জিলিঙে মেয়ে কলেজে পড়তে যাব। প্রেম-প্রীতির ব্যাপারটা তখন জমে বরফ হয়ে উঠতে আর বাধা কোথায়।

ওদের বাড়ি থেকে ফেরার সময় ডেভিডের মা-ই আমার হাতে এক একসময় কাগজে বাক্সে-মোড়া বিলিতি মদের বোতল আমার হাতে দিয়ে বলত, এটা তোমার মায়ের জন্য নিয়ে যাও, উনি খুব ভালো-বাসেন শুনেছি—।

তখনই বোঝা যেত মায়ের ভেট ডেভিড চুরি করে আনত না, বাড়িতে জানান দিয়েই আসত। আর পরে লক্ষ্য করতাম, আমি গেলে ওর রাশভারী সাহেব বাবা বেশ কৌতূহল নিয়েই আমাকে দেখত। আমার অভিবাদনের জবাবে হেসেই মাথা ঝাঁকাতো। কেউ না বললেও আমি স্পষ্ট বুঝতাম, ডেভিডের মায়ের তাঁকে জানানো হয়ে গেছে যে ভবিষ্যতে আমি তার ছেলের বউ হতে চলেছি। এ-কথা মনে হলে রাগে আমার গা জ্বলত। কারণও আছে। ততদিনে রয় জারভিসের আমার জীবনে কতটা এগনো সারা, সে আর পৃথিবীতে আমরা দু'জন ছাড়া কে জানে।

আমার ঠাণ্ডা বা নিস্পৃহ আচরণে ডেভিডের অনেক সময় অভিমান হত। দিনকে দিন আমার মায়ের চোখের মণি হয়ে বসছে, মেয়ের কাছ তেমন পাত্তা পাচ্ছে না। সময় সময় বলত আমাকে তুমি একটুও পছন্দ করো না—

আমি সাদা মুখ করে ফিরে জিগ্যেস করতাম, কি করে বুঝলে ?

ডেভিডের জবাব, আমি দার্জিলিং থেকে এলেই দেখি তুমি তোমার আঁকা নিয়ে গ্র্যাণ্ডির ওখানে পড়ে আছ—

—পড়ে থাকব না তো কি, ছুটির সময়েই তো গ্র্যাণ্ডির কাছে আঁকা শিখি।

—তাছাড়া আমার থেকে তুমি নেটিভদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করো।

—করব না কেন, আমিও তো নেটিভ।

ডেভিডের দু'চোখ কপালে। —তোমার বাবা হল জেরোম স্মিথ, মা ইভা স্মিথ—তুমি নেটিভ হতে যাবে কেন!

আমি হেসে হেসেই বলি,. আমার দাদু হল দিলীপ ব্যাণ্ডো—ব্যাণ্ডো মানে বন্দ্যোপাধ্যায়—একেবারে খাঁটি বাঙালি।

—তাতে কি হল। মা বলে, এই জন্তেই তুমি এত সুন্দর, তোমার মতো হলদে গায়ের রং কালো চুল কালো চোখ বিলেতে কোনো মেয়ের দেখা যায় না।

এ-রকম শুন্‌লে মনে মনে কে আর না খুশি হয়।

ডেভিডের অভিযোগের এখানেই শেষ নয়। —তাছাড়া তুমি সেরকমভাবে আমাকে তোমার হাত পর্যন্ত ধরতে দাও না।

আমার মুখে আবার সাদামাটা বিস্ময়। —সে রকমভাবে আবার কি রকম ভাবে?

—এই ইয়ে একটু অন্তরঙ্গভাবে।

আমি একটা হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছি, আচ্ছা ধরে দেখাও কি বকম ভাবে।

জায়গাটা নির্জন ছিল। ও হেসে-হেসে হাতের বদলে এক হাতে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে হাঁটতে চাইল। আমি সেই হাত ঠেলে সরিয়ে বলেছি, এর নাম হাত ধরা না কাঁধ ধরা।

তেমনি হেসে ওর প্রশ্ন, কাঁধ ধরলে তোমার আপত্তি কেন?

—হাত ধরতে চেয়ে তুমি কাঁধ ধরবে কেন?

—যদি হাত না ধবে কাঁধ ধরতে চাই?

—রাস্তার লোক তাহলে আমাদের অসভ্য ভাববে।

—তাহলে চলো, কেউ দেখবে না এমন কোথাও যাই।

আমি জিভ ভেঙচে চলে এসেছি। তাইতেই ওই বড় লোকের ছেলে দারুণ মন-মরা।

আর সীনিয়র কেমব্রিজ পাশ করার পর দার্জিলিঙে না গিয়ে কলকাতায় পড়তে গেলাম বলে ডেভিডের সে-কি মনস্তাপ! আগে আমাকে বুঝিয়েছে, পরে মা-কে। তার মতে একলা কলকাতার

হস্টেলে পড়তে যাওয়া মানেই জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলা।
কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কারণে আমার ভেতরটা তখন কত বিষাক্ত হয়ে আছে কেউ জানে না। ডেভিডের সামনেই মা আমাকে দার্জিলিঙের কলেজে ভর্তি হবার কথা বলতে রাগে ফেটে পড়েছিলাম। ওকে শুনিয়ে মা-কে শাসিয়েছি, আমি কোথায় পড়ব না পড়ব এ নিয়ে তোমার বা কারো মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

মা-কে ভয় করে চলার দিন গেছে। আমার সেই ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে ডেভিড ভড়কে গেছল। আমার জগতে তখন সব থেকে বড় শত্রু, মেলিণ্ডা জারভিস। তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার তাডনাতেই আমার কলকাতায় পড়তে যাওয়া। এতে যে বাধা দেবে তাকে শত্রু ছাড়া আমি মিত্র ভাবব কি করে?

ডেভিড হারপারকে নিয়ে বিপাকে পড়েছিলাম কুড়ি বছর বয়সে। ছুটিতে কলকাতা থেকে শালজুড়িতে এসে দেখি মায়ের মাথার বিকৃতি বেশ বেড়েছে। তার মধ্যে সময়-সময় খুব খোশ মেজাজেও থাকে। বিশেষ করে ডেভিড এলে। বি-এসসি পাশ করে প্রায় সাত আট মাস হল সে শালজুড়িতেই বসে। আর মাস চারেক বাদে তার বাবার চাকরির মিয়াদ ফুরোবে। তারপর এক সঙ্গেই সকলে 'হোমে' রওনা হবে। এ ক'মাসের মধ্যে ডেভিড হারপার মা-কে কত জপিয়েছে আর কতটা হাত করেছে সেটা এখানে এসে বোঝা গেল। মদ যোগাচ্ছে, চা-বাগানের ডাক্তার এনে দেখাচ্ছে।...তার সঙ্গেই মা আমার বিয়ে একেবারে ঠিক করে ফেলেছে। অতএব, চার মাস বাদে আমিও বউ হিসেবে তাদের সঙ্গে হোমে যাচ্ছি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিলেত দেশটা শাশুড়ী একবার চোখেও দেখবে না এ কেমন কথা। আর সদ্য বিয়ের পর মা-বাবাকে ছেড়ে চলে গেলে আমার তো মন খারাপ হবেই। সে জন্য ডেভিডের প্রস্তাব, এই যাত্রাতেই শাশুড়ীকে অর্থাৎ মা-কেও তাদের সঙ্গে যেতে হবে। মায়ের যাতায়াতের আর লণ্ডনে মাস ছয় থাকার সমস্ত খরচ ডেভিডের (অর্থাৎ তার বাবার)। নিজের মা-কে ডেভিড সে-কথা জানিয়েছে

রেখেছে। তার মা-ও সুপারিশ করে ডেভিডের বাবাকে রাজি করিয়েছে। রাজি না হবার কি আছে, লণ্ডনে গাঁয়ের দিকে তাদের মস্ত খামার বাড়ি, থাকার কোন অসুবিধেই নেই—এত জায়গা এত ঘর। আর এই চা বাগানের দৌলতেই তাদের অঢেল টাকা। একজনের যাতায়াতের খরচ দিতে তাদের কিইবা গায়ে লাগবে। এখানে আসার এক ঘণ্টার মধ্যে ফাঁক খুঁজে বাবাই আমাকে এই সমাচার জানিয়েছে। বলেছে, কি পাগলকে যে ছেলেটা নাচিয়ে তুলেছে, এমন লোভের টোপ গিলে আর তোর মায়ের মাথা ঠিক থাকে! ওদের যেতে এখনো চার মাস বাকি, এর মধ্যে তোর বিয়ে দিয়ে সে এখন থেকেই বিলেত যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বসে আছে।

আমার ভিতরটা বিষিয়ে গেল। কাল বড় দিন। তার পরেও দিন কতক এখানে থেকে যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে চলে এসেছিলাম। এই ব্যাপার শোনার পর ইচ্ছে হল আজই আবার চলে চাই। মা তো আনন্দে আমাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে ডেভিড কত সোনার ছেলে, তার বাবা-মা কত উদার কত দরাজ মনের মানুষ, আর আমার কত ভাগ্যি তাই বিন্যাস করতে করতে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেলছে। শুনে আমিও আনন্দে নেচে উঠছি না দেখে এক-একবার তার চোখ মুখ ঘোরালো ধারালো হয়ে উঠছে।

বিকেলে দেখলাম এই আগের দিনই হারপারদের বাড়ি থেকে বড় দিনের ভেট এলো। প্রচুর জিনিস, তার সঙ্গে একটা নয়—দু' দুটো দামী বিলিতি মদের বোতল। ডেভিডকে আমি অনেকবার চুপি চুপি নিষেধ করেছি, মা-কে মদে শেষ করছে, এ-সব পাঠাবে না। ডাক্তারও যতটা সম্ভব কৌশলে তার মদের মাত্রা কমিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছে। ফাঁক পেলে বাবা বা এখানে থাকলে আমি তার মদের বোতলে জল মিশিয়ে রাখি। তার মধ্যে ওই বড় লোকের ছেলে এই রাস্তা বেছে নিয়েছে—আমি রাগে জ্বলব না তো কি! বাবা অবশ্য বলেছে ডেভিড ছেলে খারাপ নয়, তার বাবা-মা-ও লোক ভালোই, বিয়েতে আমার আপত্তি না থাকলে তারও এগোতে আপত্তি নেই।

কিন্তু জীবনে যদি আর কোনো পুরুষের পদক্ষেপ না-ও ঘটে যেত তবুও ডেভিড হারপারের এই সাধে আমি ছাই দিতাম।

সন্ধ্যার খানিক বাদেই ডেভিড এলো। আসবে জানাই ছিল। কারণ, আমার আসার খবর তার অজানা নেই। আসা মাত্র মা জামাই আদর শুরু করে দিল। ততক্ষণে তার তিন-চার দফা নতুন বোতলের মদ গেলা হয়ে গেছে। ফলে স্নেহ আরো গলে গলে পড়ছে। ডেভিডকে এক-রকম জড়িয়ে ধরেই আমার ঘরে এনে বসালো। তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে হেসেই রসিকতা করল, যার জন্যে সেই বিকেল থেকে হাঁ করে বসে আছিস—এই নে—আর এতক্ষণ আসেনি কেন সে-জন্য আচ্ছা করে বকে দে।

আমার সামনেই মায়ের মুখে এ কথা শুনে ডেভিডের সমস্ত মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। আমার দিক থেকে বাধা আসবে এমন একটা ভয় হয়তো তার মনে মনে ছিল। মায়ের খুব একটা দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। বসে পড়ে রঙিলার উদ্দেশে হাঁক-ডাক শুরু করে দিল। সে আসতে হম্বি-তম্বি, ডেভিড আসবে জানা কথাই, কেন আগে থাকতে প্রস্তুত হয়নি, ওর জন্য চপ কাটলেট ভাজতে শুরু করেনি! দশ মিনিটের মধ্যে টেবিলে সব না-দেখলে রঙিলার গর্দানই যাবে।

একটু বাদে আবার উঠে দাঁড়ালো। মুখে হাসি আর ধরে না। কিন্তু গলার স্বর স্নেহ ঢালা ধমকের মতো—কথাগুলোও টানা টানা। ডেভিডকেই বলছে, আমাকে যে চোখ দিয়েই তাড়াতে চাইছ দেখি—যাচ্ছি বাবু, যাচ্ছি—তোমাদের যে এখন কথার পাহাড় জমে আছে সে আমি খুব জানি।

হাসতে হাসতে টলতে টলতে পর্দা ঠেলে ঘর থেকে চলে গেল। ...নিজের ঘরে গেলাসের সদ্গতি করতে গেল জানা কথাই। বাধা না পেলে রাত ন'টা পর্যন্ত চলবে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে। আর বাধা পেলে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে।

ডেভিডের হাসি হাসি সুন্দর মুখটা আমার থেতলেই দিতে ইচ্ছে করছে। ও ধরেই নিয়েছে আমাদের মা-মেয়ের মধ্যে সব কথা হয়েই

গেছে আর ও গ্রীন সিগন্যাল পেয়েই গেছে। চেয়ারটা আর একটু কাছে টেনে আনল। আমার দিকে চেয়ে দু'চোখে প্রেমের নামে লোভ ঝরছে। বলল, তোমার ওপর কিন্তু আমি রেগেই আছি, তোমার মা বলে, কলকাতা থেকে সব চিঠিতে তুমি আমার কত খবর জানতে চাও—কিন্তু নিজে আমাকে এ পর্যন্ত একটা চিঠিও লেখোনি··· আর আমার দু'দুটো চিঠির একটারও জবাব পর্যন্ত দাওনি।

আমি একটা চিঠিও পাইনি। মা কচিত কখনো চিঠি লিখলে বাবা ঠিকানা লিখে দেয়। মায়ের কাছ থেকে আমার কলকাতার ঠিকানা নিয়ে থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশি। তা না হলে চিঠি না পাবার কারণ নেই। কোন ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে আমি জিগ্যেস করলাম না। কিছুই বললাম না। শুধু অপলক ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

—কি দেখছ ?

—তোমাকে।

হেসে উঠল। —কেমন দেখছ ?

—দারুণ ভালো।

দু'চোখে লোভ আরো বেশি চিকিয়ে উঠছে। হেসেই বলল, শুধু দেখছ না, মনে হচ্ছে ভাবছও কিছু।

—ঠিকই ধরেছ।

—কি ভাবছ ?

—দু' দশ দিনের মধ্যেই বিয়ে, তারপর মা-কে নিয়ে লণ্ডন— ভাবনার কত কি আছে···।

খুশিতে ডগমগ। —তা বলে দুর্ভাবনার কিছু নেই, তোমার মা ওখানে খুব ভালো থাকবেন দেখো—ও-দেশটা দেখার তার এত সখ—

—এত সখ যে দেখার পর সেখানে থেকেও যেতে চাইতে পারে।

ডেভিড হৃষ্ট মুখে জবাব দিল, তা হলেই বা ভাবনার কি আছে— সি ইজ্ এ ওয়াণ্ডারফুল লেডি। আই অ্যাডোর হার।

আমি ঠাণ্ডা চোখে চেয়েই আছি। —তাহলে এক কাজ করো,

আমার বদলে মা-কেই বিয়ে করে নিয়ে যাও—বাবাকে বলি ডিভোর্স করতে···

ভালোরকম থতমত খেলো একপ্রস্থ। তারপরেই গলা ছেড়ে হাসি। —উঃ! গম্ভীর মুখে তুমি কি বিচ্ছিরি ঠাট্টাই করতে পারো—তোমার মায়ের কানে গেলে?

—গেলে তোমার মতোই হাসত।

আমার রকম সকম দেখে ও হয়তো একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। —তোমার মনে কি আছে স্পষ্ট করে বলো দেখি?

খুব স্পষ্ট করেই কিছু বলা দরকার। কিন্তু বাড়িতে বলার সুবিধে হবে না। এই নেশার মধ্যে মায়ের কানে কিছু গেলে চেঁচামিচির হাট বসিয়ে দেবে—আমাকে পাগলের মতো গালমন্দ করবে। জবাব করবে। জবাব দিলাম, আজ নয়, কাল বলব—

ডেভিড সশঙ্কে চেয়ে রইল একটু।—কাল কখন আসব?

—এ সব রসের কথা কি বাড়িতে বসে হয়, এখানে আসতে হবে না, বিকেল চারটে নাগাত কালাজানির ধারে এসো, আমি থাকব।

—ঘাবড়ে যাচ্ছি যে, ভয় পাওয়ার মতো কিছু কথা নয় তো?

ফিরে বললাম, মা তোমার ভয় ভাঙিয়ে দিতে বাকি রেখেছে কিছু?

এবারে খুশি হয়ে আর কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে লাগল।

রঙিলা দুটো বড় ডিশে এক-রাশ খাবার নিয়ে হাজির। তার পিছনে মা। পা ঠিক মতো পড়ছে না, আরো বেশি অপ্রকৃতিস্থ বোঝা যায়। অত খাবার দেখে ডেভিড আঁতকে উঠল। —এ কি কাণ্ড করেছেন আপনি!

—খা-ও খা-ও-ও—কিছুই বেশি করিনি। নে রে মেয়ে, তুইও হাত লাগা। কাঁপা হাতে চামচেয় করে ডেভিডের ডিশে তিন চারটে চপ কাটলেট তুলে দিল।

তারপর চেয়ারে ধুপ করে বসে নিজেও একটা কাটলেট তুলে নিল। বার বার বলা সত্ত্বেও আমি কিছু স্পর্শ করলাম না। মা আমার ডেভিডের সঙ্গে বিলেতের গল্প জুড়ে দিল। কথাও এখন ঠিকমতো

বলতে পারছে না। জিভ আটকে-আটকে যাচ্ছে। রঙিলাকে ডেকে হুকুম করল, ও-ঘর থেকে তার আধ-খাওয়া গেলাস এ-ঘরে দিয়ে যেতে। গেলাস রেখে রঙিলা খাবারের ট্রে আর ডিশ তুলে নিয়ে গেল, কারণ ডেভিড বলল সে আর কিছুই খাবে না—রাতে এক জায়গায় তার ডিনার আছে।

কঠিন গলায় মা-কে বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তোমার বিলেত যাওয়া হবে না।

ডেভিড সচকিত। মায়েরও নেশা ছোটার দাখিল।—কেন? ডেভিডের সঙ্গে সমস্ত কথা পাকা, তুই এ-কথা বলার কে?

—বলছি তার কারণ, যে ভাবে মদ গিলছ, চার মাসের মধ্যে একেবারে শেষ না হয়ে গেলেও পাকাপোক্ত ভাবে বিছানা নিতে হবে।

শুনে ডেভিড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাওয়া হবে না বলায় ওর বোধহয় ভয় ধরেছিল আমি বিয়েই বাতিল ঘোষণা করব। মায়ের দিক টেনে ও এবারে আমাকে আশ্বস্ত করতে চাইল, বলল, উনি ইদানীং যা খাচ্ছেন তা এক নম্বর বিলিতি জিনিস, এতে খুব ক্ষতি কিছু হবে না।

আমি মনে মনে ভাবছি কালকের মধ্যেই ওর অদৃষ্টে ভালো-রকম দুঃখ আছে। কিন্তু দুঃখটা যে আজই ঘনিয়েছে ভাবিনি। আরো একটু বাদে মা গেলাস হাতে উঠে যেতে ও উসখুস করতে লাগল। সতৃষ্ণ চোখে আমাকে দেখছে, ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি। বলল, ডিনারের নেমন্তন্নটা আগেই নিয়ে ফেলেছি, কিন্তু উঠতে হচ্ছে করছে না।

বললাম, না করলেও উঠতে হবে, আমি রীতিমতো ক্লান্ত। তুমি না এলে এতক্ষণে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তাম।

ডেভিড ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।—না, আর তাহলে তোমাকে বিরক্ত করব না। তার পরেই হাসি-হাসি মুখে আমার খুব কাছে এলো। তার দু'হাত আমার দুই কাঁধে উঠে এলো। আমি সেই রকমই ঠাণ্ডা, হয়তো আরো বেশি। ওর চোখে চোখ।—কি মতলব?

চাপা গলায় মিষ্টি করে বলল, মতলব নয়···ইচ্ছেটা তুমি টের পাচ্ছ না? ওনলী ওয়ান কিস্···প্লীজ।

ধাক্কা মেরে ওকে দু'হাত সরিয়ে দিলাম।—প্রাণে ভয়-ডর থাকে তো আর বিরক্ত না করে সরে পড়ো! বেশ জোরে আর রূঢ় গলাতেই বললাম।

ডেভিডের আহত মুখ। কিছুটা বিস্মিতও।

তারপরেই অবাক আমি। একটা ঝটকা মেরে পর্দাটা সরিয়ে মা ঘরে ঢুকল। তেড়ে আমাকে মারতেই আসছে যেন। কিন্তু এদিকে এত বে-সামাল যে এগোতে গিয়ে সামনের চেয়ারটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। চেয়ারটা উল্টে পড়ে গেল। মায়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিকৃত গলায় বলে উঠল, এত সাহস তোব যে ডেভিডকে তুই অপমান কবিস? ক'দিন বাদে যাব সঙ্গে বিয়ে সে একটা চুমু খেতে চাইলে খুব দোষের হয়ে গেল! তুই ওকে ধাক্কা মেরে সরালি আর ও-কথা বললি! এত বাড় বেড়েছে তোর?

আমি কেন, ডেভিডও বোধহয় হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। বারান্দাটা তখন অন্ধকার বলেই পর্দার আড়াল থেকে সব দেখেছে আর শুনেছে বোঝা গেল।

মদেব নেশা মাথায় উঠেছে বলেই অস্বাভাবিক রাগে মা কাঁপছে। চেঁচিয়ে ডেভিডকে হুকুম করল, আমি বলছি তুমি ওকে চুমু খাও, একটা ছেড়ে পাঁচটা চুমু খাও! দেখি কত সাহস ওর যে তোমাকে বাধা দেয়—যাও—দাঁড়িয়ে আছ কেন—তুমি তো আর নেটিভের ছেলে নও যে মা বা শাশুড়ী কাছে থাকলে লজ্জা পাবে—কোথায় নিজে আগ বাড়িয়ে এসে চুমু খেতে দেবে তা না লেখা পড়া করে এই শিক্ষা আর এই সাহস হয়েছে ওর! যা বলছি শোনো!

আমি তাজ্জব। মাথাটা একেবারেই গেছে বুঝতে পারছি। নেশার চোটে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। রাগেও কাঁপছে। কিন্তু ডেভিড যে মায়ের এই বকৃতির সুযোগে নির্লজ্জ লোভে সত্যিই এগিয়ে আসবে এ কি ভাবা যায়! মুখখানা কাঁচুমাচু করে আমার কাছে এগিয়ে এলো, যেন মায়ের হুকুমের ফলেই ও নিরুপায়। দু'হাতে আমাকে বুকে টেনে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো।

তারপরেই যা হয়ে গেল সেটা আমার পরিকল্পিত কিছু নয়। আবারও ওকে ঠেলে হাত খানেক দূরে সরিয়েছি। তারপর হাতের এক চড়ে ও ঘুরে পড়তে পড়তে ছোট টেবিলটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সামলেছে।

এ রকম ব্যাপার মায়ের কল্পনার বাইরে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে কি ঘটল বুঝতে চেষ্টা করছে। ডেভিডের দু'চোখ বিস্ফারিত। আমি বললাম, কাল কালাজানির ধারে এই গোছের কিছু বলাটা তোমার জন্য মজুত ছিল—আজই জেনে গেলে। এখন যাবে না আরো জানার ইচ্ছে আছে?

রাগে অপমানে ওর সমস্ত মুখ রক্ত বর্ণ। ঘর ছেড়ে হনহন করে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার শব্দও কানে এলো।

...এই এক কাণ্ড করে মায়ের কিছু ক্ষতি করেছি জানি। তাকে ডাক্তার দেখাতে হয়েছে! তিন-চার দিন হিষ্টিরিয়ার মধ্যে কেটেছে। ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছে।

ডেভিড হারপার এর পরে আর আমাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেনি। ওর বাবার তখন পর্যন্ত যা প্রতিপত্তি, সেই জোরে হয়তো বা প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করতে পারত। তা করেনি। আমার ধারণা, কাউকে কিছু না বলে রাগ আর অপমান দুইই নিঃশব্দে হজম করে গেছে।

...এর পর অর্থাৎ আরো সাড়ে তিন চার বছর পরে যখন আমার চব্বিশে গড়িয়ে—তখন ডিকি ডেটনের মতো প্রায় ছন্নছাড়া একটা বাঁশী-প্রেমিককে বিয়েই করে বসলাম যেদিন সেই দিনটাই হয়তো মায়ের জীবনের একটা বড় শোকের দিন। সেই শোকে ওই বছরেই মায়ের মৃত্যু এগিয়ে এসেছিল কিনা কে জানে।

আমার বাবা জেরোম স্মিথ এমনিতে শান্ত শিষ্ট ভারী ভালো মানুষ। তার ভদ্রতার তুলনা নেই। শালজুড়ির জেণ্টলম্যান বলতে সকলে বাবাকে বুঝত। যদিও সপ্তাহের মধ্যে চারদিন মাতলাহাটির বাংলোয় কাটাতো। এখানকার ছোট বড় সকলেই তাকে চিনত, জানত। আমার ধারণা, জিপেই বাবা এই শালজুড়ি থেকে মাতলাহাটিতে

যাতায়াত করতে পারত, শুধু মায়ের জ্বালায় সরে থাকে। আমি সেই কোন, বাচ্চা বয়সে মেলিণ্ডা জারভিসের সঙ্গে কালিম্পঙে পড়তে চলে গেছি। বাবার ঘরের টান তাইতে আরো কমেছে। উইক-এণ্ড বাসে দু'দিনের জন্য শালজুড়িতে চলে আসি। সে দু'দিন তো বাবাও এখানে এসে থাকেই, অন্যান্য দু'চার দিনের ছুটিতে এলেও বাবা এখানেই থাকে। আর বড় ভেকেশনে এলে বাবা তো বলতে গেলে এখান থেকেই জিপে গিয়ে অফিস করে আসে। তাহলে মায়ের ভয়েই যে বাবা এখান থেকে পালায়, শুধু আমার টানে এখানে এসে থাকে এটা ধরে নেওয়াই যেতে পারে। আর, তেরো বছর বয়সে পুরুষ সম্পর্কে আমি যখন বেশ সচেতন তখন মা আর মনোহর ডাকুয়াকে নিয়ে আমার সন্দেহটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমার মাথায় মা আর মনোহর ডাকুয়াকে নিয়ে সম্ভব অসম্ভব অনেকচিন্তার ছাপ পড়ত। চেষ্টা করেও সে-সব মাথা থেকে তাড়াতে পারতাম না। কেবলই ভাবতাম, মা তো দিশী মানুষ মোটে পছন্দ করে না—তাহলে মনোহর ডাকুয়াকে এত পছন্দ কেন। শুধু চেহারা আর রূপের খাতিরে? যত ভাবতাম, ব্যাপারটা ততো জটিল আর রহস্যময় মনে হত। উইক এণ্ড-এ আর ভেকেশনে শালজুড়িতে এলেই শুধু ওই দু'জনার সম্পর্কে সজাগ থাকার সুযোগ পেতাম। কিন্তু আমিও যখন নেই, বাবাও না, তখন তাদের ওপর কে আর চোখ রেখে বসে থাকে? কেউ না।··· তখন?

সেই তেরো বছর বয়সে আমার এমন দশা যে শালজুড়িতে এলে এ-সব মনে মনে ভাবতেও ভয় পেতাম। এই বুঝি মা ভিতরের ভাবনাটাও টের পেয়ে গেল।

মা-কে বাবা এক রকম এড়িয়েই চলত। ঝগড়া করত না, তর্ক করত না। মা বেশি লেগে থাকলে চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। মায়ের রাগ তাতে চার গুণ বেড়ে যেত। তখন অকথ্য গালাগাল। বাবাকে মা যখন তখন (রঞ্জিলার সামনেও) বিশ্বাসঘাতক বেইমান ছোটলোক বলে তারস্বরে গালাগাল করত। মায়ের হাত থেকে

আমাকে সামলাতে এলে আগুন হয়ে বলত, আমার সর্বনাশ করেছ, এখন মেয়েটাও যাতে গোল্লায় যায় সেই ইচ্ছে, কেমন ?

সকলে কেন, ছেলেবেলা থেকে এই কথা শুনে শুনে আমিও এক এক সময় ভাবতাম, মায়ের ওপরে বাবা বোধহয় বড় রকমের অন্যায় কিছু করেছে, যার জন্য মায়ের ভিতরে এ-রকম একটা ক্রোধ। আগেই বলেছি মা আমাকে কখনো বেশি মেরে বসেছে দেখলেই শুধু বাবার মেজাজ বিগড়তো। একবার মায়ের হাত থেকে আগলে রেখে বাবা গর্জন করে উঠেছিল, কেন তুমি ওর গায়ে হাত তোলো—কতদিন তোমাকে বারণ করেছি—এরপর কিছু একটা করে বসব আমি !

এ-ঘটনা সেই বন্দুক নিয়ে কাণ্ড করে বসার পরে। আমার ওপর ক্ষিপ্ত হওয়াটা তখনো মায়ের দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে। বাবার ওই কথার জবাবে মা-ও সমান তালে ফুঁসে উঠেছিল, কি ? কি করবে তুমি ? আমার মাথা কাটবে—কেমন ? আমার খুশি আমার মেয়েকে আমি মারব তাতে তোমার কি ?

এর জবাবে বাবা একদিন যা জবাব দিয়েছিল, আড়ালে গিয়ে মার ভুলে আমি হেসে আটখানা। বাবা তেমনি রেগে বলে উঠেছিল, শুধু তোমার মেয়ে—আমার কিছু না ? জঙ্গল থেকে বাঘ ভালুক এসে তোমাকে মেয়ে দিয়ে গেছে ?

আড়ালে এসে খিলখিল করে হেসেছি। তখন তো বছর পনের বয়েস। তার ওপর ছোট থেকে বাড়ন্ত গড়ন। কালিম্পং আর শালজুড়ির অল্প বয়সী ছেলেগুলো আমার চার দিকে ছোঁক ছোঁক করে। কালিম্পঙে রয় জারভিসের ভয়ে কেউ তেমন সাহস পেত না, তা-ও সে জলপাইগুড়ির মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে চলে গেলে অন্তত এক ডজন ছেলে আমার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করেছে, প্রেম নিবেদনও করেছে। আর শালজুড়ির অফিসারদের ছেলেরাও ভাব জমাতে আর প্রেম জানাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু আমি এমন চেয়ে থাকতাম যেন এ-সবের অর্থই ঠিক ঠিক বুঝতে পারতাম না। মোট কথা, তখন ভিতরে ভিতরে আমি প্রাকাপোক্ত মেয়ে একটা। একটা মেয়ের

ছেলেপুলে কেন হয়, কি করে হয় আমার জানতে কিছু বাকি ছিল না।
তাই বাবার ওই কথা শুনে হেসে গড়িয়ে একটা দৃশ্য কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি।...শালজুড়ির জঙ্গল থেকে একটা বাঘ বা ভালুক এলো মায়ের কাছে, দুজনে আদরে সোহাগে রাত কাটিয়ে দিল, যার ফলে আমি এলাম—হি হি হি হি হি হি, বাবা কি কথাই না বলল মা-কে!

আরো একটু বড় হয়ে জানতে বুঝতে চেষ্টা করেছি বাবার ওপর মায়ের কেন এত রাগ। বাবাকেও জিগ্যেস করেছি। বাবা গোড়ায় গোড়ায় এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। শুধু বলত, মাথার বিকৃতি ছাড়া আর কি।

—কিন্তু কেন বিকৃতি? মা কেন এত মদ খায়?

আমাকে নাছোড় দেখে বাবা ক্রমে অনেক কথাই বলেছে। কিছু মেলিণ্ডা জারভিস আর মীনা মাসির কাছ থেকেও আঁচ করেছি। কিছু আভাস বা গ্র্যাণ্ডির কাছ থেকে পেয়েছি।...আমার দাদামশাই দিলীপ ব্যাণ্ডোর দোষ অনেক ছিল, কিন্তু গুণ আর গোঁ-ও কম ছিল না। মদ খেত এন্তার, জুয়া খেলত। দিদিমা আগনেসের মতো শক্ত হাতে পড়েছিল বলেই তার জীবনটা উতরে গেছে এ-তো মেলিণ্ডা জারভিস জোর গলায় বলত। নইলে তাকে সুদ্ধু নিয়ে ভেসে যাওয়ার মতো বেপরোয়া মানুষই ছিল দাদামশাই দিলীপ ব্যাণ্ডো। মেলিণ্ডা জারভিস বলত, আমার মা ইভা তার বাবার গুণের দিক কিছুমাত্র পায়নি। দোষের ভাগ ষোল আনার ওপর আঠারো আনা পেয়েছে —আর তার মায়ের গুণের এক কণাও পায়নি, এ-ও মেলিণ্ডা জারভিস অনেক সময় রাগ করে মায়ের সামনেই সোজাসুজিই বলত।

...দিদিমা আগনেসকে বিয়ে করার পর দাদামশায়ের যেমন পুরো দস্তুর সাহেব বনার ঝোঁক বেড়েছিল, নিজের গায়ে বাঙালীর রক্ত বলেই মা ইভাও তার উল্টো অর্থাৎ খাঁটি মেমসাহেব বনে যেতে চেয়েছিল। তার পণ ছিল সে এমন কোনো ইংরেজ ছেলেকে বিয়ে করবে যে দু'চার বছরের মধ্যে অন্তত এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে মাকে নিয়ে বরাবরকার মতো ইংল্যাণ্ডে বাস করবে। আমার বাবা

জেরোম স্মিথ খাঁটি ইংরেজই বটে। সেই আমলের এক মস্ত মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারের ছেলে। ভারতে থাকত। বাবা বন বিভাগের কি পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে উত্তর বাংলায় বন বিভাগে ঢুকেছিল। গোড়ার দিকে অনেক জঙ্গলেই ঘুরেছে। মাতলাহাটির অনেক আগে একেবারে গোড়ার দিকে শালজুড়ির জঙ্গলে জুনিয়ার অফিসার হয়ে আসার পর মায়ের সঙ্গে আলাপ এবং হৃদ্যতা। দিদিমা আগনেসেরও তাকে খুব পছন্দ। উনিশ পার না হতে মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ে হয়ে গেছে। মায়ের শর্তেই বিয়ে হয়েছে, তাই কোনো গণ্ডগোল হয়নি। বাবা গোড়া থেকেই অর্থাৎ একটু ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর থেকেই মা কে বুঝিয়েছে, তার বাবার এখানকার কাজের মিয়াদ ফুরোলেই তার বাবা মায়ের সঙ্গে মা কে নিয়ে হোমে চলে যাবে। সেখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ নেবে নয়তো কোনো স্বাধীন ব্যবসা করবে। বড় জোর আর দু'তিন বছরের মামলা।

বছর চারেক পার হতে ভাঁওতা ধরা পড়ে গেল। স্কটল্যাণ্ড থেকে চিঠিতে খবর এলো সেখানে বাবার বাবা অর্থাৎ আমার ঠাকুরদা মারা গেছে। আর এ-ও পরে জানা গেল, ছেলের বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তার বাবার এখানকার কাজের মিয়াদ ফুরিয়েছিল, তখনই সপরিবারে সে দেশে চলে গেছল। মায়ের মনে পড়েছে, দিন কতকের জন্য বাবা কি কাজের কথা বলে একলা সে সময়ে বম্বে গেছল বটে। তার মানে, তার বাবা মা-কে বিদায় দিতে গেছল।

সেই থেকে মায়ের কাছে বাবা বেইমান বিশ্বাসঘাতক ভণ্ড। আমি বাবাকে সোজা জিগ্যেস করেছিলাম, তুমি অমন মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলে কেন, মা-কে ও ভাবে ভাঁওতা দিয়েছিলে কেন?

বাবা বলেছিল, তোর দিদিমার কথায়। তোর দিদিমা আগনেসকে আমি বিয়ের আগে থেকেই দারুণ শ্রদ্ধা করতাম, শালজুড়িতে এসে তার সব কথা শুনেছিলাম। তোর মায়ের সঙ্গে আমার একটু খাতির হতে দেখে তোর দিদিমাই বিশেষ করে আমাকে অনুরোধ করেছিল ওই রকম বলতে। তার ধারণা ছিল এক আধ বছর কাটলেই মেয়ের

ও-বাই চলে যাবে।···অমন মায়ের মেয়ে, আমিও তাই আশা করেছিলাম।

এই হতাশায় কিনা, কিংবা দাদামশাইয়ের রক্তের ধারায় কিনা বলা যায় না, মা-কে মদের নেশায় পেয়ে বসতে লাগল। এখানে পার্টি-টার্টি তখন লেগেই থাকত। বাবা মা-কে নিয়ে যেত। নিজে মাত্রা রেখে ড্রিংক করত। কিন্তু মা দেদার মদ গিলে বে-সামাল হয়ে পড়ত। আর তখন দশজন মানী লোকের সামনেই বাবাকে গালাগাল শুরু করে দিত। শেষে এমন হল যে বাবা পার্টিতে যাওয়া ছেড়েই দিল। কিন্তু মা রাগারাগি করে একলাই চলে যেত, আকণ্ঠ গিলে আসত, শেষে বাবাকে নিয়ে আবার পড়ত।

···কোথাও পার্টি থাকলে কেউ কেউ আগের ভাগে জানতে চাইত জেরোম বা ইভা স্মিথের কাছেও কার্ড গেছে কিনা। তাহলে তো পার্টি মাটি, জেরোম না এলেও ইভা স্মিথ তো আসবেই—

এই করে বাবা মায়ের পার্টির নেমন্তন্নও বন্ধ হয়ে গেল। আর মা তাতে আরো ক্ষিপ্ত। বাধ্য হয়ে বাবা তখন মায়ের জন্য বাড়িতেই ড্রিংক-এর ব্যবস্থা রাখা শুরু করল। ফলে তখন মায়ের মেজাজ একটু ঠাণ্ডা। কিন্তু মদ একটু বেশি পেটে গেলেই (যা সব সময় যেত) সেই বে-সামাল মূর্তি, বাবাকে গালাগালি। মায়ের সঙ্গে বসে মদ খেতে না চাইলে বিতণ্ডা চরমে উঠত। বাবাকেও খেতে হত। মাকে গোপন করে বাবা অনেক সময় নিজের গেলাসের মদ বেসিনে ঢেলে দিয়ে আসত।

আবার শুধু দু'জনে বসে ড্রিংক করাটাও মায়ের সব সময় পছন্দ হত না। ফলে বাছাই দুই একজনকে আমন্ত্রণ জানাতেই হত। সেই দুই একজনের মধ্যে আংকল মনোহর ডাকুয়া বাঁধা-ধরা একজন। বয়সে ছোট হলেও এই পরিবারের সঙ্গে তাদের বিশেষ সদ্ভাব। সদ্ভাবের আরো কারণ, মীনা ডাকুয়া তখন আমাকে বাড়ি এসে বাংলা পড়াতো। বাবা মায়ের বিয়ের বছর ঘুরতেই তো আমি এসে গেছলাম।

আমার বাংলায় কথা বলা আর বাংলা শেখা নিয়েও কি কম কাণ্ড

হয়েছে ? দিদিমার চেষ্টায় মা বেশ বাংলা জানত, কিন্তু বাংলা উচ্চারণও করত না। মা ঝেঁটিয়ে বাংলা বিদেয় করতে চায়, আর বাবা আমাকে বাংলা পড়াবেই। এর কারণ বাবার মুখেই শুনেছি। আমার তিন বছর বয়েস হতেই দিদিমা আগনেস নাকি বাবাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিল, আমাকে যেন বাঙালার ছেলেমেয়েদের মতোই বাংলা শেখানো হয়। বলেছিল, ওব দাদামশায়ের বাংলা ভাষা যে কি চমৎকার ভাষা তুমি জানলে বুঝতে।

বাবা দাদুকে কথা দিয়েছিল, বড় হয়ে মায়ের মতো আমিও বিগড়ে না গেলে আমাকে যথাসাধ্য বাংলা শেখানো হবে। মীনা ডাকুয়া··· না তখন ছিল এখানকার চা বাগানের এক ছোট অফিসারের মেয়ে মানা চক্রবর্তী—আমাকে আট বছর বয়েস থেকে বাংলা পড়াতো। তার আগে অর্থাৎ সেই তিন বছর বয়েস থেকেই এখানকার হু'জন বাঙালী কর্মচারীর বউ পর পর আমাকে বাংলা পড়িয়েছে, বাংলায় কথা বলা শিখিয়েছে। মানা চক্রবর্তী সে সময়ের আই, এ পাশ মেয়ে, উনিশ বছর বয়সে ওই পাশ দিয়ে এখানে বাপের কাছে এসে আর বি. এ পড়তে কলকাতায় ফেরেনি। তার মধ্যে মনোহর ডাকুয়ার সঙ্গে প্রেম এবং বিয়ে। আমি কালিম্পঙে চলে গেলেও আমার বাংলা পড়ায় ছেদ পড়েনি। কারণ বছর কয়েক মীনা মাসিও মেলিণ্ডা জারভিসের কালিম্পঙের স্কুলে চাকরি করেছে। সেখানে স্কুল বোর্ডিংএ থাকত। সে-ও উইক-এণ্ডএ আর ভেকেশনে শালজুড়ি চলে আসত। আমি তার সঙ্গেই যেতাম আসতাম। তাই আমার বাংলা পড়ায় কোথাও কখনো ছেদ পড়েনি মীনা মাসি বলে, এখন আমিই তাকে বাংলা শেখাতে পারি। আমি লজ্জা পাই, কিন্তু মনে মনে জানি এটা খুব অতিশয়োক্তি নয়।

বাংলা শেখার ব্যাপারে মা-কে দিদিমার আদেশের কথা বলে বাবা ঠাণ্ডা করতে পেরেছিল। সে-ও অল্পেতে হয়নি। মায়ের ভূতের ভয় আবার খুব। তার ধারণা, এখানকার জঙ্গলে আর চা বাগানে ভূতেরা গিসগিস করছে। কেউ আত্মহত্যা করেছে শুনলে বা বে-ঘোরে

মারা পড়লে মায়ের ধারণা সে অবধারিতভাবে ভূত হয়ে গেছে। আত্মহত্যার ঘটনা বিশেষ না থাকলেও বে-ঘোরে তো এই চা বাগান বা জঙ্গলের লোক হামেশাই মরছে। তাই ভূতের অভাব আছে? মদের নেশায় এই শালজুড়িতে মা আজ পর্যন্ত কত ভূত যে দেখেছে ঠিক নেই। নেশার ঘোরে অনেক সময় জীবিত মানুষকে মা মৃত ভাবত, আর তাকে সামনে দেখে আতকে উঠত।

বেগতিক দেখে মা-কে বাবা বলেছিল, তোমার মা পুণ্যাত্মা মানুষ, ভূত-টুত নিশ্চিয় হননি, কিন্তু অশরীরী আত্মা তো বটেন। তাঁর আদেশ অমান্য করে তাঁর কোপে পড়লে তোমার ভালো হবে না তোমার মেয়ের ভালো হবে?

এই যুক্তির পর মা হাল ছেড়েছে।

মায়ের বিকৃতির তৃতায় কারণ, সন্দেহ বাই। উঠতে বসতে বাবাকে সন্দেহ। বাবার সঙ্গে গিয়ে মাতলাহাটির বাংলোয় থাকবেও না আবার সন্দেহও করবে। চোখের আড়ালে গিয়ে কি করে না করে ঠিক আছে কিছু? কলহের ভয়ে বাবা মাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু মায়ের কাছে সেটাই আবার সন্দেহের ব্যাপার। অন্য কোনো মেয়ের সংস্রব ভিন্ন নিজের স্ত্রীকে কে এড়িয়ে চলতে চায়? বিশেষ করে যে লোক মিথ্যে বলে ভণ্ডামি করে তাকে বিয়ে করেছে তার অসাধ্য কর্ম কি?

মায়ের এই সন্দেহ বাইয়ের খবরটা আমি সঠিক রাখতাম না। তবে এটা লক্ষ্য করতাম, মায়ের বান্ধবীরা বাড়িতে এলে বাবা কাছাকাছির মধ্যে থাকত না। আর এ-ও দেখেছি, রঙিলার সঙ্গে বাবাকে কথা বলতে দেখলেও মা চোখ পাকিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। রঙিলা তখন ভয়ে জড়সড়। বাবা এরপর রঙিলার সঙ্গেও কথা বলা বন্ধ করেছিল। আর এ-ও জানি কথায় কথায় বাবাকে মা চরিত্রহীন বলে গাল দেয়। ব্যাপারখানা পনের ষোল বছর বয়সে আমি জেনেছি। মীনা মাসি বলেছিল। আমার বছর বারো তেরো বয়সে এক ভেকেশনে মীনা মাসি হঠাৎ আমাকে বাড়িতে এসে পড়ানো বন্ধ করেছিল। অথচ এখানে থাকলে বরাবরই বাড়িতে আসে। সেবারে অনেক সাধ্য

সাধনা করেও তাকে বাড়িতে আনতে পারিনি। চোখ মুখ লাল করে বলেছিল, ভেকেশনে পড়তে হবে না, কালিম্পঙে গিয়ে পড়িস্। শুনে আমি হতভম্ভ। অথচ জানি, বাবা বরাবর মাস গেলে তার হাতে বাংলা পড়ানোব টাকা গুঁজে দেয়। এত দিন বাংলা পড়ানো বন্ধ থাকবে শুনে আমি চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। কারণ, বাংলা তখন আমার কাছে একটা গর্বের বিষয়! অনেক কাকুতি মিনতি করতে মীনা মাসি শেষে বলেছিল, পড়তে হয় আমার এখানে এসে পড়ে যাস, তোদের বাড়িতে আর নয়।

আমি বিমূঢ় মুখে ফিরে এসেছিলাম। বাবাকে মাকে বলেছিলাম। মা জ্বলন্ত চোখে বাবার দিকে চেয়ে ছিল। আর বাবা দারুণ গম্ভীর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মীনা মাসির জেদ টেকেনি। মনোহর ডাকুয়ার সঙ্গে খাতিরের ফলে হোক বা দিদিমা আগনেস ব্যাণ্ডোর অশরীরী আত্মার ভয়ে হোক, মা নিজে গিয়ে হাত ধরে মীনা মাসিকে বাড়িতে ধরে এনেছে। কিন্তু তার পরেও দেখেছি, আমাকে পড়ানোর সময় মা কতবার করে যে ঘরে ঢুকত ঠিক নেই। পরে বুঝেছি, আমি এলেই বাবা শালজুড়িতে থাকে, তাই তখন বাবার ওপরেও মায়ের কড়া নজর। তার সন্দেহ মীনা মাসিকে কাছে পাওয়ার লোভেই বাবা তখন এখানে থাকে।

আরো বড় হতে মীনা মাসিই বলেছিল, তোর মাকে নিয়ে আর পারা গেল না, মদে আর সন্দেহ বাতিকেই মরবে একদিন

আমি হাঁ।—সন্দেহ বাতিক কেন? কাকে সন্দেহ?

—কাকে আর, তোর বাবাকে। একদিন গেছে, আমাকে নিয়ে পর্যন্ত সন্দেহ করত। এখন তোর বাবার থেকেও দশ বছরের বড় মেলিণ্ডা জারভিসকে নিয়েও সন্দেহ—মাথাটা একেবারেই গেছে।

এরপর ঘটনা শুনেছি। এই সময় থেকেই আমার সঙ্গে মীনা মাসির বন্ধুর মতো আচরণ। মায়ের খটকা, মেলিণ্ডা জারভিস ভেকেশনে শালজুড়িতে এলে বাবা অত ঘন ঘন তার ওখানে বা গ্র্যাণ্ডির স্টুডিওতে যায় কেন? তার আবার আর্টপ্রীতি কবে থেকে হল?

সেই বাচ্চা বয়েস থেকে আমার শিক্ষা-দীক্ষার সব দায় দায়িত্ব মেলিণ্ডা জারভিসের হাতে। তাই সে এখানে এলে সৌজন্যের খাতিরে বাবা তার সঙ্গে একটু আধটু দেখা-সাক্ষাৎ ঠিকই করে। তার খবর নেয়, সেই ফাঁকে আমারও। কিন্তু বাবা মেলিণ্ডা জারভিসের ওখানে ঘন ঘন নিশ্চয় যায় না। এটা মায়ের নিছকই কল্পনা। একবার তার মাথায় কিছু ঢুকলে সেটা দানা বেধে বিশ্বাসের দিকে পৌঁছুতে সময় লাগে না। মানা মাসির কাছে মা চুপি চুপি খোঁজ নিয়েছে, বাবা কালিম্পঙেও যায় কিনা, মেলিণ্ডা জারভিসের সঙ্গে দেখা করে কি না?

শুনে মানা মাসি মায়ের মুখের ওপর ছি-ছি করেছে। আর বলেছে, মিস্টার জেরোমের থেকে দশ বছরের বড় ম্যাডাম জারভিস, আর সকলের কত সম্মানের পাত্রী—আপনি এ-সব বলছেন কি?

এই শুনেও মা এতটুকু দমেনি, বা লজ্জা পায়নি। উল্টে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, সম্মানের পাত্রী বলে কি তার ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই! এই বয়সেও ওই মহিলা চেহারাখানা অমন পরিপাটি রেখেছে কি জন্যে? আর বিলেতে দশ বছরের বড় মেয়ের সঙ্গে ছেলেদের বিয়ে হামেশা হচ্ছে না? তোমার অত ছি-ছি করে ওঠার কি হয়েছে? যে মানুষ নিয়ে ঘর করি তার দ্বারা সবই সম্ভব।

আমার গায়ে কাঁটা। এ যদি কোন ভাবে মেলিণ্ডা জারভিস জানতে পারে তাহলে আমারই সর্বনাশ ভেবেছি।

বাবাকে নিয়ে মা ঘর করে বলে নয়, মায়ের মতো স্ত্রী নিয়ে বাবা অমন শান্তভাবে ঘর করছে বলেই সমস্ত শালজুড়ির মানুষের বিবেচনায় বাবা জেরোম স্মিথ একজন 'পারফেক্ট জেণ্টল্‌ম্যান'।

বুদ্ধি আরো কিছু পাকতে আমার ধারণা, মনোহর ডাকুয়াকে যে মা সবার থেকে বেশি খাতির করে সেটা বাবার মনে ঈর্ষা জাগানোর জন্যেও হতে পারে। কিন্তু বাবার মনে ঈর্ষার ছিটে ফোঁটাও দেখে না বলেই আরো রাগে জ্বলে। আবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে আর এক ভয়।...মানা ডাকুয়া যদি কখনো সন্দেহ করে মা তার স্বামীকে বশ করার চেষ্টায় আছে—তাহলে?

তাহলেও আমার সর্বনাশ।

কিশোর বয়স থেকে প্রথম যৌবনে খুব—খুব কাছের একজন যে, সে মেলিণ্ডা জারভিসের ভাইপো রয় জারভিস। তার পরেও অনেক অনেক বছর ধরে আমার জগতের একমাত্র পুরুষ সে-ই। কিন্তু সেই ছেলে বাচ্চা বয়েস থেকেই কি হাড়পাজি! আর তার কত রকমের বজ্জাতি।

আমার বারো বছর বয়েস থেকে রয় আমাকে একটা মেয়ে ভাবতে শুরু করেছে। ওর নিজের তখন কি-বা বয়েস। আমার থেকে খুব বেশি হলে চার বছরের বড়। ষোল বছর বয়েসে একটা ছেলে—যে-ছেলে মেলিণ্ডা জারভিসের ভাই পো—এমন পাকা হয় কি করে। আরো বছর খানেক বাদে আমি ওকে সোজাসুজি বলেছিলাম, মা-মেলিণ্ডা তোমার পিসি, জন্ম থেকেই বলতে গেলে তার কাছে আছ—তুমি এমন পাজি হলে কি করে?

হাসলে রয়কে আরো সুন্দর দেখায়, আরো দুষ্টু—মিষ্টি মনে হয়। হেসে আমাকে জাপটে ধরে বলেছে, তোমার জন্য, তোমাকে এত কাছে পেলে কোন ছেলে না চালাক হবে আর লোভী হবে?

শুনে মজা লেগেছে। ভালো তো লেগেইছে।

সেই বারো বছরেও আমি বেশ ডাগর ডোগরটি। স্কুল ছুটি হলেই মেলিণ্ডা জারভিসের কোয়ারটার্সএ চলে যেতাম। দু'জনে খেলা করতাম। মস্ত বাগানে ছোটাছুটি হুটোপুটি করতাম। মেলিণ্ডা জারভিস সন্ধ্যার আগে স্কুল থেকে ফিরত না। ফিরলেও আমাদের এই মেলামেশায় তার একটুও আপত্তি হত না। বরং চোখে মুখে দু'জনের প্রতিই মায়ের স্নেহ দেখতাম। ভালো কিছু খাবার এলে ডেকে দু'জনকে ভাগ করে দিত।

খেলাধুলো আর ছোটাছুটির পর ক্লান্ত হয়ে আমরা বাগানের কোনো বেঞ্চএ বসতাম। এক সময় খেয়াল হল ও আমাকে আজকাল গাছের আড়ালের কোনো বেঞ্চএ হাত ধরে এনে বসায়। আর তারপর লক্ষ্য

করতে লাগলাম ও আমার গায়ের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে পায়ের সঙ্গে পা ঠেকিয়ে ঘন হয়ে বসতে চেষ্টা করে। আমার হাবভাব তো হাবাগোবা গোছের, খারাপ লাগে না বলে ওর চালাকি বুঝেও বুঝি না। ফলে ও-ছেলের সাহস বাড়তেই থাকল। গায়ের সঙ্গে লেগে ঘন হয়ে বসে এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরে, মাঝে মাঝে আরো কাছে টানতে চেষ্টা করে, আর সারাক্ষণ আমার কাঁধ হাত টেপে, সেদিকের উরু টেপে।

আমি বোকার মতো জিগ্যেস করি, এ-রকম ক'চ্ছ কেন ?

ও হেসে বলে, তুমি এমন ছুটতে পারো, এমন গাছে উঠতে পারো, ঝাঁপ খেতে পারো, অথচ তোমার শরীরটা কি নরম ! আমার টিপে টিপে দেখতে খুব ভালো লাগে।...তোমার ?

আমি বোকা মেয়ের মতোই জবাব দিই, ভালোই লাগে...তবে জোরে টিপলে লাগে।

—ঠিক আছে, আর তাহলে কক্ষনো জোরে টিপব না।

কিন্তু টেপাটেপি বাড়তেই থাকল। এমন কি আমার গাল কেমন নরম তারও পরীক্ষা শুরু হল।

তেরো বছর বয়সে আমি আরো হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলাম। রয় তখন মাথায় আমার থেকে আঙুল তিনেক মাত্র লম্বা হবে। নিজের দেহের মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছি, আমার শরীরটার ভিতরে কোনো অদৃশ্য হাতের কিছু কারিকুরি চলেছে।

লক্ষ্য শুধু আমিই করিনি। লোভীর মত লক্ষ্য রয়ও করছে। তার হাতের হামলা বাড়ছে। মাথায় ও আমার থেকে কতটা লম্বা পরখ করার জন্য প্রায়ই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুকে বুক ঠেকিয়ে আঙুল দিয়ে দু'জনের মাথা মাপে। প্রায়ই ওর মনে হয়, ও আর একটু লম্বা হয়েছে—আর মনে হলেই না মেপে পারে না। ওর বজ্জাতি দেখে মনে মনে তাজ্জব হয়ে যাই, সেই সঙ্গে মজাও পাই।

এমনি সময়ে ওর হঠাৎ একদিন গায়ের জোর পরখ করার ইচ্ছে হল। বজ্জাতি তখন আরো বেড়েছে কারণ, সীনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়েছে, সারাক্ষণ ছুটি আর মাথায় নানা মতলবের প্যাঁচ। বাগানে

আড়ালের অভাব নেই। একদিন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, আমার গায়ে কত জোর জানো? দেখাচ্ছি—

বলে আমাকে একরকম নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে দু'হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল। খানিকক্ষণ ওইভাবে ধরে রেখে তারপর ধুপ করে মাটিতে ছেড়ে দিল। হাসছে।—দেখলে?

দেখলাম কিছু তো বটেই। ঠোঁট উল্টে জবাব দিলাম, আমিও পারি।

—তুমি পারো? আমাকে তুলতে? যেন বিশ্বাসই হয় না।—দেখি কেমন পারো?

ও যা করল তাই করলাম। প্রথমে দু'হাতে বুকে টানলাম, কোমর জড়িয়ে ধরলাম, তারপর শূন্যে তুলে ফেললাম।

রয় যত অবাক, ততো খুশি। আসলে ধূর্তের একশেষ।—অত নরম শরীর, অথচ গায়ে জোর বটে তোমার। তা বলে আমার মতো নয়, এবারে দেখো কি করি।

এবারে বেশ সাপ্টেই বুকে জড়ালো আগে। আগের মতোই দু'হাত কোমরে জড়িয়ে শূন্যে তুলে আমাকে নিজের বুকে আটকে গাছপালার ভিতর দিয়ে প্রায় বিশ গজ হেঁটে গেল। তারপর নামিয়ে দিল। অল্প হাঁপাচ্ছে এবার। মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি।—এবারে তুমি করে দেখাও।

করলাম। ওকে বুকে তুলে নিয়ে গজ পাঁচেক হাঁটলাম। আরো চার-পাঁচ গজ পারতাম বোধহয়। আর একটু চলতে চলতেই আচমকা দু'হাত ছেড়ে দিলাম।

—উঃ! খাড়া থেকে মাটিতে চিৎপাত একেবারে। আমার অপ্রস্তুত মুখ।

—দিলে তো লাগিয়ে! উঠল। তেমন লাগলে মুখে অত হাসি লেগে থাকত না।—তাহলে তোমার থেকে আমার জোর বেশি স্বীকার করলে তো?

মাথা নেড়ে স্বীকার করলাম। বললাম, মেয়েদের থেকে ছেলেদের তো একটু জোর বেশি হবেই।

ও সান্ত্বনা দিল, তা নয়, অনেক ছেলের থেকে তোমার গায়ে ঢের বেশি জোর। নইলে আমাকে তুলতেই পারতে না। দিন কতক প্র্যাকটিস করলে দেখবে অনেকটা যেতে পারছ।

আমি ভালো মুখ করে জিগ্যেস করলাম, তোমার আন্টিকে এ-ভাবে আমি তুলে ধরে প্র্যাকটিস করব।

মেলিণ্ডা জারভিসের আমি কত আদরের মেয়ে এই পাজি খুব ভালো করে জানে। তাই আতকে উঠল --না না না না তাকে এ-রকম ফেলে দিলে বুড়ো হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে—আর তাকে আমাদের এই খেলার কথা বলবেই না, তাহলে আমাদের আর বাগানেই আসতে দেবে না।

আমি তো বোকা মেয়ে। জিগ্যেস করলাম, কেন?

জবাব দিতে গিয়ে রয় একেবারে ফাঁপরে পড়ল।—ইয়ে মানে—আন্টি এ-সব খেলা পছন্দই করে না—বুঝলে? তাকে কিছু বলবে না—মনে থাকবে?

আমি বেশ জানি, দুনিয়ায় ভয় ডর বলতে এই দামাল ছেলে একজনকেই করে। সে ওর পিসী মেলিণ্ডা জারভিস। মাথা নাড়লাম মনে থাকবে।

এরপর দিন দুই ওর সঙ্গেই জোর পরীক্ষার মহড়া চলল। ও আমাকে সার্টিফিকেট দিল, এরই মধ্যে আমার গায়ের জোর অনেকটা বেড়েছে।...তারপরের একদিন বিকেলে মহড়া দেবার জন্য রয় আমাকে বুকে চেপে ধরল। ধরেই আছে। চাপ বাড়ছে। আমার অস্বাস্তি শুরু হয়েছে।

—কি হল...তোলো?

ওর দুষ্টু চোখের চাউনিটা তখন আরো অন্যরকম। তুলল না। তেমনি আঁকড়ে ধরে থেকে সামনে ঝুঁকল। ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। তারপর সেই চাপে আর ঠোঁটের ওপর সেই দু'রন্ত হামলায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার দাখিল। ওদিকে ভয়ংকর অস্বস্তি। ভিতরে কাঁপুনি।

ছাড়ল একসময়। দু'জনেই হাঁপাচ্ছি।

—এটা কি হল? আমার প্রশ্ন।

—এর নাম কিসিং···কিস্ জানো না?

আমি মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ জানি। মাস্টারের মুখ করে বললাম, বাংলায় বলে চুমু।

—কি বলে ছুমু?

—না চু-মু।

—ও·· ছুমু।

হেসে উঠলাম।—বলো চ'—চায়নিজ।

ও চেষ্টা করে বলল, চ্-হাইনিজ।

—বলো, চিয়ারস্।

—চিয়ায়স। এবারে পারলো।

—বলো চুমু।

—শিওর—চ্ছু-মু।

আমি রাগ দেখিয়ে এবারে যে কাণ্ড করে বসলাম সেটা ওর কল্পনার বাইরে। ঠাস করে গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েই দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে ওকে বুকে টেনে আনলাম। তারপর যত জোরে পারি দু'হাতে ওকে বুকে চেপে ধরে প্রায় এক মিনিটের একটা লম্বা চুমুতে ওরও দম বন্ধ করে দিতে চাইলাম। শেষে জোরে ধাক্কা মেরে তাকে তিন হাত দূরে ঠেলে সরিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলাম, নটি বয় আজ এক বছর ধরে তুমি কি কাণ্ড করে যাচ্ছ আমি বুঝি না ভেবেছ?

রয় জারভিস হাঁ প্রথম। তারপর উৎসুক।—তুমি সব বুঝেও এমন বোকার মতো থাকতে!

আমি বড় করে জিভ ভেঙিয়ে ছুট।

এর পর থেকে আমার ভয় যতো টানও ততো। রোজ প্রতিজ্ঞা করতাম আর যাব না। আবার না গিয়েও পারতাম না। দু'দিন না গেলে ও বোর্ডিংএ এসে আমার খোঁজ করে। আমার রাগ হয় আবার

ভালো লাগে। না গেলে মেলিণ্ডা জারভিস পর্যন্ত বলে, তুই দু'দিন যাসনি শুনলাম, শরীর ভালো আছে তো?

ওদিকে স্কুলের বা বোর্ডিংএর মেয়েরা হাবা-গোবা নয় কিছু। ছুটির পর একটা মেয়ে ওদের সঙ্গে খেলা করে না, মেলিণ্ডা জারভিসের বাড়ি ছোটে যেখানে রয় জারভিস নামে তার ভাইপো আছে—ব্যাপার-খানা তারা এমন সাদা চোখে দেখবে কেন? তাদের ঠাট্টা ঠিসারা লেগেই আছে। এমন কি, মীনা মাসি পর্যন্ত একদিন ঠাট্টার সুরে বলেছিল, কি রে, যে ভাব দেখি তোদের দু'জনার, আর ম্যাডাম জারভিসও তোকে এত ভালবাসে—বয়েস কালে তার ভাইপোর সঙ্গেই তোর বিয়ে থা হবে নাকি?

খুব সাদাসিধে মুখ করে জবাব দিয়েছি, সে-তো হবেই।

—বলিস কি রে! মীনামাসির দু'চোখ কপালে।—এরই মধ্যে কথা-বার্তা পাকা হয়ে গেছে? ম্যাডাম জারভিস জানে?

তখন একটু চুপসে গেছলাম অবশ্য। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়েছি, তুমিও যেমন জিগেস করছ আমিও তেমনি বলছি—আমার বর সেই বাচ্চাকাল থেকে ঠিক হয়েই আছে জানো না?

মীনা মাসি আরো অবাক। —কে?

—কেন, গ্র্যাণ্ডি—গ্র্যাণ্ড মেরি!

মীনা মাসি হেসে উঠেছিল। —খুব পেকেছিস দেখছি।

মীনা মাসির কথার জবাব দিইনি বটে, কিন্তু মনে মনে ঠিক জানি মেলিণ্ডা জারভিসের দিক থেকে কোনো বাধাই আসবে না—আসতে পারে না। আমার বদ্ধ ধারণা, ওই মহিলারও মনে মনে এমনি একটা ইচ্ছে আছেই—না হলে আমাকে বা রয়কে এতো প্রশ্রয় দিত না।

কিন্তু আমার সব থেকে ভয় রয়কেই। তার হামলা বেড়েই চলেছে এখন। আমি অনেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়েছি, আর গায়ে হাত দেবে না বা দুষ্টুমি করবে না—তাহলে যাব। ও নিজের কান ধরে প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু নাগালের মধ্যে পেলে এমন দুষ্টুমি করে যে আমার এই শরীরটা যেন ওর খাস দখলের জিনিস। একদিন তো গুনে গুনে

একশটা চুমু খেল। আর আমাকেও অতগুলো খাইযে তবে ছাড়ল। আমি ভয় দেখাতে চেষ্টা করি, কাল থেকে আর আসব না—তোমার আন্টি জানতে পারলে দুজনকেই এই বাগানে পুঁতে ফেলবে।

ও হাসে। বলে, জানতে পেলে তো ফেলবেই, কিন্তু জানছে কি করে?

—একদিন না একদিন তো জানবেই…।

—তা তো জানবেই, সেই জানার সময় হবে যখন তখন তো আমাদের বিয়েও পাকা হয়ে যাবে।

—তোমার আন্টি যদি আপত্তি করে?

—ক্ষেপেছ! আন্টি তোমাকে আমার থেকেও ভালবাসে সে আমি খুব ভালো করেই জানি।…আমাকে তো বলেই রেখেছে, ভালো করে লেখা-পড়া শিখে সে-ভাবে মানুষ হয়ে উঠলে সব থেকে সেরা প্রাইজ দেবে—সব থেকে সেই সেরা প্রাইজখানা যে তুমি এ আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি। নইলে আমাদের এ-ভাবে মেলামেশা করতে দেয়? তোমার মন যাতে আর কোনো ছেলের দিকে না পড়ে সেই জন্যেই দেয়।

আমার সর্বাঙ্গে পুলকের শিহরণ। রয়ের কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি। রাগ ভুলে নিজেই তাকে জড়িয়ে ধরেছি। ফলে তার মুখ শুধু নয়, হাত দুটোও নানাভাবে অবাধ্য হতে চেষ্টা করেছে। ওর দৌরাত্ম্য ঠেকানোর দায় যেন শুধু আমারই। আবার রাগ। আবার শাসন। কারণ আমার ভয়, এ-ভাবে প্রশ্রয় দিলে ও একদিন আরো এগোতে চাইবে—বিয়ের আগে যা সব মেয়েই সর্বনাশের সামিল ভাবে। ভাবনা চিন্তার দিক থেকে ভিতরে ভিতরে আমি অতটাই পেকে গেছি বটে।

একদিন আমি স্পষ্টই ওর সঙ্গে ফয়সলা করলাম।—দেখো, আমি যখন তোমার বউই হব তখন এমন কিছু কোরো না যাতে সব আনন্দ পরে নষ্ট হয়ে যায়। তোমার মধ্যে আমি একটা সংযমী পুরুষমানুষ দেখতে চাই, কিছুতে ঘৃণা বা অবিশ্বাস করতে চাই না।

—ও ববা-বা, [illegible] দু'চোখ, বিস্ফারিত, তোমার না মাত্র তেরো

বছর বয়েস চলেছে এখন? এ-সব কথা শিখলে কোথেকে?

—আর দু'তিন মাস বাদে চৌদ্দ হবে। তোমার কাছ থেকেই ঠেকে শিখেছি।

এর পর থেকে বাধ্য হয়েই ওকে আমার কড়ার মেনে নিতে হয়েছে। ও এতটা চুমু খাবে, আর আমি অতটা চুমু খাব। এর বাইরে জড়াজড়ি জাপটা জাপটি টেপাটিপি কিচ্ছু নয়। বে-চাল দেখলেই আমি তার কাছ থেকে কেটে পড়ব।

বে-চাল দেখতাম। কিন্তু শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই রয় মিইয়ে যেত। চেষ্টা কবত নিজেকে বাধ্য ছেলে করে তুলতে।

এরপর আমাদের দু'জনেরই মন খারাপের দিন। রয় জার্ভিসের সিনিয়র কেম্‌ব্রিজের ফল বেরুলো। মোটামুটি ভালোই পাশ করেছে। মেলিণ্ডা জারভিস ঠিক করেছে, আপাতত ও জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হবে। চার বছরে মেডিক্যাল স্কুল থেকে বেরুলে কলকাতায় গিয়ে কনডেন্‌স্‌ড্‌ কোর্স-এ এম. বি পাশ করে আসবে।

তাব মানে আপাতত চার বছরের বিচ্ছেদ। পরের কথা ভাবছি না। জলপাইগুড়ি থেকে মেডিক্যাল পড়া ছাত্রর উইক-এণ্ডে কালিম্পঙে আসার কোনো প্রশ্নই নেই। দৈবাৎ এলেও আমি তো তখন শালজুড়িতে। আব বড় ভেকেশনে মেলিণ্ডা জারভিসের সঙ্গে শালজুড়িতে আসতে পারে। কিন্তু আমার মতে কালিম্পঙে মেলিণ্ডা জার্ভিসের কোয়ারার্টর্সএর বাগানের মতো প্রেমিক প্রেমিকার জায়গা আর কোথাও নেই।

রয় জারভিস চলে গেল। কালিম্পঙে বড় একলা হয়ে গেলাম। কিন্তু সেটা এমন দুঃসহ কিছু নয়। বড় তো হতেই হবে তাকে, মানুষ তো হতেই হবে। কালিম্পঙে মেডিক্যাল স্কুল বা কলেজ থাকলে বড় হওয়ার ব্যাপারে এত ঘ খামাখিটা বরং বিঘ্নের মতো হত। রয়কে বড় ডাক্তার হতে হবে আর আমাকেও পড়াশুনার ভিতর দিয়ে ওর যোগ্য হতে হবে।

একটা বছর কেটে গেল। আমি শালজুড়িতে। বড় ভেকেশন চলছে। মীনা মাসিও এখানে। রোজ ছুটে ছুটে গ্র্যাণ্ডির ওখানে যাই। কিন্তু প্রথম বছরই না মেলিণ্ডা জারভিস এলো, না রয়। আমি ভেবে পেলাম না কি হল। শেষে মুখ ফুটে জিগ্যেসই করে বসলাম, এবারের ভেকেশনে তোমার 'দ্য বীগ লেডি' এলো না যে?

শুনলাম, দিল্লিতে সারা ভারতের মিশনারি স্কুলের প্রিন্সিপালদের এক কনভেনশন হচ্ছে, মিলিণ্ডা জারভিস সেখানে গেছে। সেখান থেকে নানা জায়গায় ঘুরবে। এবারের ভেকেশনে সে আসছে না।

—কিন্তু রয়···সে তাহলে ভেকেশনের সময় কোথায় থাকবে?

গ্র্যাণ্ডি কুতকুত করে খানিক চেয়ে রইল আমাব দিকে। তারপর ঝপ করে জিগ্যেস করল, কতটা এগিয়েছিস?

আমি ধড়ফড় করে উঠলাম, তা—তার মানে?

মাথার ওপর একটা হাত তুলল, যেন মেরেই বসবে। গ্র্যাণ্ডি গর্জন করে উঠল, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা—আমার সঙ্গে বেইমানি! কিছুই খবর রাখি না ভেবেছিস?

আমাদের ভাবসাবের খবর যদি কিছু রেখে থাকে তো সেটা মেলিণ্ডা জারভিসের কাছ থেকেই জেনেছে। অবশ্য সেই ভাব সাব কদ্দূর গড়িয়েছে সেটা মেলিণ্ডা জারভিসও জানে না। কিন্তু এই থেকেই ওই মহিলার মন আর আমার প্রতি স্নেহ তো বোঝা গেল। ভিতরে ভিতরে আমি বেজায় খুশি। বললাম, আ-হা, তুমি তো আমার আছই, আমি ভাবছিলাম ভেকেশনে ও বেচারা কোথায় গেল।

—ও বেচারার ভেকেশন কোথায়? জলপাইগুড়ি কি কালিম্পং যে শীতের ভেকেশন থাকবে।

যাঃ কলা! এ তো আমি ভাবিইনি। যাবার আগে রয়ই কি জানত যে শীতের ভেকেশন নেই। আমার ছুটির মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল।

আমার চারটে সুন্দর শাড়ি আছে। আমার পছন্দ দেখে গত দু বছরে বাবা তিনটে শাড়ি কিনে দিয়েছে। আর এ-বছরে একটা শাড়ি

মীনা মাসি আমাকে প্রেজেণ্ট করেছে। মা অবশ্য আমাকে শাড়ি পরতে দেখলে আগুন হয়। বলে, নেটিভের রক্ত গায়ে, গুণ যাবে কোথায়। কিন্তু জানি শাড়ি পরলে সক্কলে আমাকে ঢের বেশি সুন্দর দেখে। এখানে এলেই আমি শাড়িগুলো পরি! তার কারণ, মুখ-চেনা ছেলে-গুলোও তখন হাঁ করে চেয়ে থাকে, চোখ ফেরাতে পারে না। ভিতরে ভিতরে মজা পাই বেশ। সেই সন্ধ্যায় শাড়ি পরেই মীনা মাসির কাছে বাংলা পড়তে গেছলাম। এই মীনা মাসিই আমাকে সুন্দর করে শাড়ি পরতে শিখিয়েছে। আমাকে দেখে চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর জিগ্যেস করল, তোর বয়েস কত হল রে?

চোদ্দ পার হতে চলেছে···কেন?

—আর শাড়ি পরিস না বাপু, একেবারে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে মনে হয়।

খুব হাসি পেল। জিগ্যেস করলাম, কত বয়েস হলে তোমরা বিয়ের যুগ্যি ভাবো?

—আজকাল খুব কম করে আঠেরো। ছদ্ম বিস্ময়ে আমার চোখ কপালে।—শাড়ি পরলে আমাকে আঠেরো মনে হয়?

আঠেরো ছেড়ে দূর থেকে উনিশ বললেও কেউ অবিশ্বাস করবে না···সামনে এলে দেখবে কেবল মুখখানা কাঁচা।

পরদিন দুপুরে সেই শাড়িটাই সুন্দর করে পরে বেরিয়ে পড়েছি। শীতের রোদ্দুর ভারী আরামের। বেড়াতে বেড়াতে প্রথম কালজানির দিকে চললাম। ভাবলাম ও-দিকটায় একটু বেরিয়ে তারপর গ্র্যাণ্ডির কাছে যাব। এই পোশাকে সে আমাকে কেমন দেখে জানার লোভ। পছন্দ হবে জানা কথাই। অনেক মজার কথাও নিশ্চয় বলবে। সঙ্গে সঙ্গে আর এক মজার চিন্তা আমার মাথায়। শাড়ি পরলে আমাকে কেমন দেখায় রয় জানেই না। ঠিক করলাম, এবারে একখানা শাড়ি অন্তত কালিম্পঙে নিয়ে যাব। তার পিসী ফিরেছে জানলে তুই এক-দিনের জন্যেও তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে হয়তো। পাঁচ সাত দিনের কোনো ছুটিছাটা যদি পড়ে যায় তাহলে তো নিশ্চয় আসবে।

ওদের ছুটির ক্যালেণ্ডার আমার কাছে থাকলে ভালো হত। ···আমি মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি, শাড়ি-পরা আমাকে দেখে রয় একেবারে হাঁ হয়ে গেছে, যেন দেখেও বুঝতে পারছে না এই খুব চেনা মেয়েটা কে।

এমনি মজার কল্পনার ফাঁকে কালজানি নদীর সমতল দিকটায় এসে গেছি। আমার বেড়াতে ভালো লাগে ওই জঙ্গলের দিকটায় যেখানে অনেক ছোট ছোট ঝরণা, বাঁদরের কিচির মিচির, কাঠবেড়ালির ছোটাছুটি। ওখানে গিয়ে কোনো বড় পাথরে বসে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি। ভয় কেবল সাপের। কিন্তু এই শীত কালে সব সাপ গর্তে।

জঙ্গলের ঈষৎ চড়াই ধরে এগোতে গিয়ে হঠাৎ পা দুটো থেমে গেল। নদীর ধারের একটা ছোট পাথরে বসে ছিপ ফেলে জলের দিকে নিবিষ্ট চোখে বসে আছে আংকল মনোহর ডাকুয়া। আমার রোজই ছুটি এখন। তাই আজ যে সকলেরই ছুটির দিন খেয়াল ছিল না। পরণে পা-জামা। গায়ে শার্ট। তাকে চমকে দেবার জন্য আমি পা টিপে এগোলাম। পিছনের দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ানোর পরেও তার হুঁস নেই। কেন নেই তাও বোঝা গেল। পাশেই পাথরের ওপর একটা ছোট খালি বোতল। ও-বোতল আমি চিনি। দিনে দুপুরে মদ গিলতে গিলতে মাছ ধরার চেষ্টা চলেছে। মায়ের সঙ্গে এই মদ খাওয়ার পর্ব আমার এত দেখা যে এ-জন্যে একটুও ধাক্কা খেলাম না। উল্টে মজা লাগল, কারণ আংকল ডাকুয়া অপলক মনোযোগে ছিপের টোপের দিকে চেয়ে আছে বটে, কিন্তু বসে বসে বেশ দুলছে।

—ক'টা মাছ উঠল ?

চমকে ঘুরে তাকালো। তারপর বিস্ফারিত চোখে আমাকে দেখল খানিক। এর কারণ বুঝতে অসুবিধের কি আছে। কারণ, আমার পরণে শাড়ি। তারপর তার টকটকে ফর্সা মুখে হাসি ছড়াতে থাকল। বলল, মাছগুলোর যেন কি হয়েছে আজ, টোপ গিলেও গিলছে না।

আমি বললাম, তোমার হাত কাঁপছে, বঁড়শি নড়ছে, ওরা গিলতে যাবে কেন।

আরো হাসি।—কি যে বলিস, পাথরের পাশটা চাপড়ে দিল, আয়, বোস্ এখানে, শাড়ি পরে কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোকে—

—হ্যাঁঃ এখন আমি বসতে গেলাম, ওই ঝরণার দিকে দিব্বি এখন বেড়াব বলে বেরুলাম, তুমি বরং তোমাব বোতলের তলানি জলে ঢেলে দেখো মাছেরা নেশার ঝোঁকে টোপ গিলতে আসে কি না—

হাসতে হাসতে চলে গেলাম। একটু একটু করে মন্দ খাড়াই ভাঙতে হয় না। যত এগিয়ে চলেছি চারদিক ততো নিস্তব্ধ। এই স্তব্ধতা আমার ভালো লাগে। ঝরণার জল পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে নেমে চলেছে, দুই একটা বাঁদব এ-গাছ থেকে ও-গাছে ঝাঁপ দিচ্ছে—কিন্তু তাতে এখানকাব স্তব্ধতা একটুও নষ্ট হয না। এমন গম্ভীর নির্জন পরিবেশে এটুকু যেন ভারি মানায়।

অনেকটা দূরে এসে ঝরণার ধারে একটা মস্ত নিচু পাথরের ওপর বসলাম। এখানে এলে এই বিশাল পাথরটার ওপরেই হাত পা ছড়িয়ে বসি, কখনো পা ঝুলিয়ে ঝরণা দেখি। এখানকার জলে সর্বদাই ছোট মাছ কিলবিল করে। কখনো বা চিৎপাত হয়ে শুয়ে জঙ্গল দেখি।

ঝরণার দিকে পা ঝুলিয়ে বসেছি। মিনিট পাঁচ সাতও হয়নি। কারো চলার শব্দ কানে আসতে পাশে তাকিয়ে দেখি ছিপ আর একটা থলে হাতে আংকল মনোহর ডাকুয়া আসছে। বুঝলাম মাছ না পেয়ে বিরক্ত হয়েই হাল ছেড়েছে। কিন্তু বাড়ি গেলেই তো পারতে বাপু, এখানে এসেই বকবকানি শুরু হবে।

হাসি-হাসি মুখে আংকল ডাকুয়া পাথরটা ঘেঁষে দাঁড়ালো। চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। —বেশ জায়গা তো···তোর পছন্দ আছে।

থলে আর বঁড়শি পাশের মাটিতে রেখে আংকল ডাকুয়া আমার গা ঘেঁষে বসল। এতবড় পাথরে পাশাপাশি চারজন বসতে পারে। আমি নাক মুখ কুঁচকে বললাম, সরে বোসো, গন্ধ আসছে—

জবাবে আরো সরে আমার কোমরের সঙ্গে কোমর ঠেকিয়ে বসে হাসতে হাসতে বলল, গন্ধটা খারাপ হলে তোর মা এমন পিপে পিপে

খেত! খেলে বুঝতি এর মতো জিনিস নেই। আয়, কাছে আয়, কি ভালো যে লাগছে আজ তোকে—

এক হাতে শক্ত করে আমার কাঁধ-ধরে প্রায় কোলের ওপর টেনে নিতে চাইল। মায়ের সামনেই অনেকদিন আমাকে কোলের কাছে টেনেছে, গাল টিপে আদর করেছে। তখনো তার চাউনি কেন যেন আমার খুব ভালো লাগত না। কিন্তু আজ তার চোখে চোখ পড়তে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম একটা। আমি যেন আস্ত একটা মুরগীর রোস্ট, আর এই লোকের উপোসী একজোড়া লোভী চোখ!

হাতটা কাঁধ থেকে টেতে ছাড়াতে চেষ্টা করলাম।—ধেৎ, ছাড়ো!

ছাড়ল বটে; কিন্তু চোখের পলকে উঠে আমার ঝোলানো দু'পায়ের ফাঁকে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে দু'হাতে কোমরটা জড়িয়ে ধরল। বলল, আমি রোজ সন্ধ্যেয় তোর জন্যে তোদের বাড়ি যাই, তুই বাড়ি থাকিস না কেন?

শুনে আমি হতভম্ব। যায় রোজ মায়ের কাছে। মদ গেলে। আর বলে কিনা আমার জন্য যায়! মুখে সত্যিই বিচ্ছিরি গন্ধ, কিন্তু আমার নড়ার উপায় নেই। দু'হাতে বেশ শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে আছে। বললাম, মীনা মাসির কাছে বাংলা পড়তে যাই।

—আজ ছুটির দিনে সকালে ছিলি না কেন?

কথা-বার্তার ধরণটাই অদ্ভুত লাগছে। চাউনিও। জবাব দিলাম, গ্র্যাণ্ডির কাছে গেছলাম।

—ও···সবাই তোর আপনার জন আর আমি কেউ নয়!

ইচ্ছে করল একটা ধাক্কা মেরে ঝরণায় ফেলে দিতে, কিন্তু যে ভাবে শক্ত করে ধরে আছে, ধাক্কা দিলে আমি সুদ্ধু হুড়মুড় করে পড়ব, আর দু'জনেরই হাড় গুড়িয়ে যাবে। যা কখনো হয়নি, আমার কেমন ভয়-ভয় করছে। বললাম, তোমার জন্যে তো মা-ই বাড়িতে থাকে।

আশ্চর্য, এই রকম কথাতেও আংকল ডাকুয়া সত্যি সত্যি রেগে উঠল।—হ্যাঙ্ ইওর মা, আমি কেবল তোর জন্যে যাই—তুই আমাকে ভালো বাসবি কিনা বল্!

মাতালের হাত থেকে এখন ছাড় পেলে বাঁচি। বললাম, আচ্ছা, বাসব, ছাড়ো—

—কি ? ভালবাসলে কেউ কাউকে ছাড়তে বলে ? তোকে এ-ভাবে পেয়েও ছাড়ব ? মুহূর্তের মধ্যে উঠে দু হাতে আমার দু'কাঁধ চেপে আচমকা ধাক্কা মেরে পাথরটার ওপর শুইয়ে দিল। মাথায় খুব লাগল তাতে। তেমনি তৎপর হাতে আমার দু'পা পাথরের ওপর তুলে দিল। আমি জোর করে খানিকটা মাথা তুলতেই গালে প্রচণ্ড এক চড়। এত জোরে যে আমি চোখে অন্ধকার দেখে আবার পাথরের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিজের পা দিয়ে পেট দিয়ে বুক দিয়ে আমার পা কোমর বুক চেপে রেখে শক্ত হাতে হাত দুটো ধরে থাকল। চাপা গর্জনে বলল, একটু উঠবি বা নড়বি তো আজ তোকে গলা টিপে এখানে মেরে রেখে যাব—কাক পক্ষীও জানতে পারবে না !

আমি অন্ধকার দেখছি। এত বড় একটা শরীর আমার ওপর। দম বন্ধ হয়ে আসছে। দাঁতগুলো ঠোঁটে গালে বসে বসে যেতে লাগল আর ফিসফিস কথা, জোর করবি না, খবরদার জোর করবি না !

জোর করার শক্তি নেই, উপায় নেই। আমি অসাড় অবশ হয়ে যাচ্ছি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে বুঝেই বোধহয় দুই কনুইতে আর হাঁটুর কাছটায় পাথরে ভর দিয়ে দেহের চাপ সামান্য কমালো। ফিসফিস করে বলল, মরতে না চাস তো লক্ষ্মী হয়ে থাক।

বুকের কাপড় আগেই সরে গেছল। এবারে আমার হাত দুটো নামিয়ে বাহুর চাপে দখল রেখেও দু'হাতে গায়ের জামার বোতাম পটা-পট খুলে ফেলল—একটানে ভিতরের জামাও। আবার বাধা দিতে চেষ্টা করতে আবার প্রচণ্ড চড়, সেই সঙ্গে সমস্ত দেহের চাপ।

না, আর আমি পারছি না। মরেই যাচ্ছি। মরেই যাব। আমার মুখ গাল ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, এতটুকু বাধা দিতে চেষ্টা করলে বুকের মাংস খুবলে নিতে চাইছে। দেহের চাপ বাড়ছে। চোখে লাল নীল সবুজ দেখছি। তারপর কালো, শুধু কালো। টের পাচ্ছি

একটা চূড়ান্ত কিছু ঘটতে চলেছে এবার, আমি নিস্তব্ধের মতো পড়ে আছি, সেই লোক তৎপর হয়ে তার লালসার শেষের দিকে এগোতে চাইছে সেই সঙ্গে চাপা গর্জন, একটু নড়বি তো শেষ করে ফেলব!

...ঠিক সেই মুহূর্তে, তার উল্লাসের সেই উন্মত্ত মুহূর্তে আমার অসহায় দু'হাত মাটিতে ঝুলে পড়েছিল। একটা হাতে ঠেকল কিছু। বেশ বড় কিছু। কি সেটা আমি জানি না। জোরে ওটা মুঠো করে ধরলাম। লোকটার মুখ এখন আমার বুকের হাত দেড়েক ওপরে। চোখের পলকে কি ঘটে গেল আমি জানি না। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে মনোহর ডাকুয়া সোজা হল, সঙ্গে সঙ্গে যতটা সম্ভব আমি উঠে ওই মুখে দ্বিতীয় বার আঘাত করলাম। লোকটা বুকের ওপর পড়ে কাত হয়ে পাথর থেকে ঝরণার উল্টো দিকে পড়ে গেল। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখি আমার হাতে কম করে আধসের ওজনের তিন চার মুখো এবড়ো-খেবড়ো পাথর একটা। আর ওই লোকের সমস্ত মুখ রক্তে ভাসছে। কি ভীষণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে! জঙ্গলের আদিবাসীরা পাথর দিয়ে বাচ্চা হরিণ, ময়ূর মারলে ওগুলো যেমন ছটফট করে তার থেকে ঢের ঢের বেশি

ভয়ে ত্রাসে আমি দিশেহারা। লোকটা মরে যাচ্ছে, মরতে চলেছে তাতে কোনো ভুল নেই। ছুটতে গিয়ে থামলাম। আমার শাড়ির গিঁঠটা শুধু কোমরের সঙ্গে আটকে আছে, বাকিটা ওই পাথরে আর মাটিতে লুটোচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে পরে নিলাম। কাঁপছি থর থর করে। আমি একটা জ্যান্ত মানুষ খুন করেছি, আর ওদিকে তাকাতে পারছি না।

ছুটলাম। প্রাণের তাগিদে ছুট।

এক সময় খেয়াল হল আমি গ্র্যাণ্ডির স্টুডিওর দিকে চলেছি। থেমে গেলাম। না, এক্ষুণি গ্র্যাণ্ডির কাছে নয়। আমার চোখ মুখের অবস্থা এখন কেমন জানি। স্বাভাবিক নিশ্চয় নয়। শাড়িটা খুলে গেছল বলে ডাকুয়ার রক্তের দাগ লাগেনি। কিন্তু আমার বুকে আর জামায় চাপ চাপ রক্ত। কারণ ওই দুটো পাথরের আঘাতে

লোকটা মুখ থুবড়ে প্রথমে আমার বুকের ওপর পড়েছিল। তারপর কাত হয়ে মাটিতে। আমিই ঝটকা মেরে ফেলে দিয়েছিলাম কি না মনে নেই। না, গ্র্যাণ্ডির ওখানে কিছুতে নয়। আমার কেমন ধারণা সে মানুষের ভিতর দেখতে পায়। দেখে ছবি আকে। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ছবি আকুক না। আকুক—আমার মধ্যে একটা খুনী দেখতে পাবে—খুনের রক্ত যার বুকে জামায় এখনো চটচট করছে আর আমার ভয়ঙ্কর গা ঘুলোচ্ছে।

ফিরলাম। যতটা সম্ভব জংলা পথ ধরে এগোলাম। বেলা তখন দুটো হবে। রাস্তায় লোক কম। সকলেরর দৃষ্টি এড়িয়ে আমি শাল জুড়ির জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে চাই। সেখানে খানিক বসে ভাবতে চাই। জঙ্গলের গভীরে অনেক বাঘ ভালুক নেকড়ে বুনো শূওর থাকে জানি। ছিটকে ছটকে কখনো দুই একটা ধারের দিকেও চলে আসে। আজ এলে বরাত ভালো ধরে নেব। ওরা হিংস্র জানি। কিন্তু মানুষ এত হিংস্র এত লোভী জানতাম! বয়সে ছোট হলেও লোকটা বাবার বন্ধু মায়ের বন্ধু, মীনা মাসির স্বামী…। নাঃ, আর ভাবতেও পারি না। মীনা মাসির কি হবে?

বসা হল না। শালজুড়ির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধার ঘেঁষে বাড়ির দিকে চললাম। মা এ-সময়ে অঘোরে ঘুমিয়ে। রঙিলাও দুপুরে ঘুমোয়। বাবা হয় ঘুমোচ্ছে নয়তো কোনো বইটই পড়ছে। নিঃশব্দে আমাকে বাড়িতেই ঢুকতে হবে। সকলের অলক্ষ্যে চানের ঘরে ঢুকতে হবে, রক্তের দাগ মুছে ফেলতে হবে। জামা আর ছোট জামাটার ব্যবস্থা করতে হবে। শাড়িটায় রক্ত লেগেছে কিনা ভালো করে দেখতে হবে। তারপর কি করব ভাবতে পারছি না। পরে ভাবব।

সামনের বারান্দায় কেউ নেই। বইটই পড়লে বাবা বারান্দায় বসেই পড়ে। স্বস্তি। পা টিপে উঠে এলাম। একটা ফ্রক আর ইজের নিয়ে নিঃশব্দে চানের ঘরে ঢুকলাম। আগে শাড়িটা খুলে ভালো করে পরখ করলাম। শাড়িতে রক্তের দাগ নেই, তাছাড়া

শাড়িটার লালচে রঙ। ব্লাউসে আর ছোট জামায় রক্তের ছোপ দেখে শিউরে উঠলাম। চোখ বুজে ওগুলো খুলে ফেললাম। তারপর শব্দ না করে সাবান দিয়ে বুকের রক্তের দাগ তুলে ফেললাম। শব্দ না করে, কারণ শীতের দুপুরে চান করছি টের পেলে মা ছেড়ে রঙিলাও চেচাঁমেচি শুরু করে দেবে। অনেকক্ষণ ধরে চান করলাম, কেউ টের পেল না। শীতের কাঁপুনি বাড়তে কিছুটা আত্মস্থ হলাম।

এবার কি করি ?

ওই জামা ছোট-জামা আর ব্যবহার করতে পারব না। শাড়িটাও এখন ধুয়ে শুকোতে দিলে সকলের নজরে পড়বে। ফ্রক-টক পরে শাড়িটা বেশ করে ভাঁজ করে ওটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। এত সুন্দর প্ল্যান চটপট মাথায় আসছে যে আশ্চর্য। শাড়িটা জায়গায় রেখে চটপট বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। এখানে পাথরের অভাব নেই। সেরটাক ওজনের একটা পাথর তুলে নিয়ে নিঃশব্দে আবার উঠে এলাম। বাড়িতে মোটা ব্রাউন পেপারের অভাব নেই। ওতে মুড়িয়ে মায়ের জন্য এক সঙ্গে তিন চারটে করে বোতল আসে। দড়ি খুঁজে পেতেও সময় লাগল না। পাথর ব্রাউন পেপার আর দড়ি নিয়ে আবার বাথরুমে। ব্লাউসটা ফেলে ছোট জামাটা তার ওপর রেখে পাথরটা বসালাম। তারপর সবসুদ্ধ ব্রাউন পেপারে প্যাক করে ভালো করে দড়িতে বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। চানের পর এত সব করতে পাঁচ সাত মিনিটও লাগেনি।

ওটা আড়ালে লুকিয়ে বাড়িতে কে কি করছে একবার দেখতে এলাম। দরজার বাইরে থেকেই মায়ের নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। বাবা বাড়িতেই নেই। আর রঙিলা ডাইনিং রুমের মেঝেতে ঘুমোচ্ছে। ঈশ্বর সদয়…আমি সত্যিকারের খুনী নয় বলেই বোধহয়।

বলতে ভুলে গেছি। বাড়িতে একটা অনেক কাল আগের মেয়েদের সাইকেল আছে। একসময় মা ব্যবহার করত। রঙিলা এখনো ওটায় চেপে হাটে বাজারে যায়। আর সেই বয়সে আমি তো বলতে গেলে সাইকেলের পোকা। এখানকার ছেলেমেয়ের আসল

বাহন নিজের পা অথবা সাইকেল। সাইকেলের পিছনে প্যাকেটটা বেঁধে এতটুকু শব্দ না করে সিঁড়ি থেকে নেমে উঠোনে, উঠোন পেরিয়ে রাস্তায়।

কালজানিতে নয়। ওই পাথুরে নদীর অনেক দূর পর্যন্ত নিচের পাথর আর মাটি দেখা যায়। তিস্তায়। এখান থেকে সাড়ে তিন চার মাইল দূর। মনের তাড়ায় আমি পনের ষোলো মিনিটের মধ্যে একটা নির্জন দিকে চলে এলাম। তখন ভাঁটা' সুবিধেই হল। প্যাকেটটা নিয়ে জল ভেঙে অনেকটা চলে গেলাম। ফ্রকটা তুলে নিয়েছি, ইজেরের নিচের দিকের অনেকটা ভিজে গেছে। পাড় উঁচু— পাড় ঘেঁষে কেউ না এলে আমাকে দেখতে পাবার কথা নয়। তবু পিছন ফিরে একবার দেখে নিলাম। তারপর যত জোরে পারি পাথর ভরা প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিলাম। বেশ কয়েক গজ দূরেই পড়ল। আর ভয় নেই। ভাঁটার জল অতটা নামবে না, আ জোয়ার এলে তো কথাই নেই।

আবার পনের বিশ মিনিটের মধ্যে বাড়ি। সাইকেল রেখে নিজের ছোট ঘরে (এখন যে ঘরে বিলি থাকে) এসে শুয়ে পড়লাম। অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ছে। মনে হল, শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ব। ফ্রকের নিচে ইজেরটা ভিজে। মরুকগে—

কিন্তু কোথায় ঘুম? মাথায় নতুন চিন্তার জট।...মনোহর ডাকুয়া যদি তক্ষুনি মরে গিয়ে না থাকে? মরার আগে যদি বলে দিয়ে যায় কে তাকে খুন করেছে? নিজের দোষের কথা কি বলবে? কক্ষনো বলবে না।

...বাবা—বাবা কোথায় গেল? সব কথা আগে বাবাকে বলা দরকার। সব...সব। তারপর বাবা ভাববে। আমি আর ভাবতে পারি না। চোখ বুঝলাম। তক্ষুনি দেখলাম মীনা ডাকুয়ার-ছু'চোখ আমাকে গিলতে আসছে।

প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। মা ডেকে গেল, সাড়া দিলাম না। খানিক বাদে রঙিলা ডাকতে মুখ ঝামটা

দিলাম, শরীর ভালো না, কেন বিরক্ত করছ ?

আর কেউ বিরক্ত করল না। আধঘণ্টা বাদে বাবার উত্তেজিত গলা শুনে আমি উৎকর্ণ। মাকে বলছে, সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে—মনোহরের মুখ কে পাথর মেরে থেঁতলে দিয়েছে—অজস্র রক্ত পড়েছে—কোনো রকমে টলতে টলতে বড় রাস্তায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। লোকজন তাকে জিপে তুলে নিয়ে মাতলাহাটির ছোট হাসপাতালে দিয়ে এসেছে। ডান দিকের ঠোঁটে গালে কপালে অনেকগুলো স্টিচ পড়তে রক্ত বন্ধ হয়েছে। এত রক্ত পড়েছে যে রক্ত দিতেও হয়েছে। বাবা শুনে হাসপাতালে চলে গেছল। শুনে এসেছে মনোহর ডাকুয়ার একটু জ্ঞান হতে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। তাছাড়া মুখের চার ভাগের তিন ভাগ ব্যাণ্ডেজে বাঁধা, জ্ঞান হলেও কথা বলতে পারবে না।

মা শুনে আর্তনাদ করল। অনেকবার করে জিগ্যেস করল, মনোহরের এমন দশা কে করেছে বা করতে পারে ?

বাবা কি জবাব দেবে। আমি বিছানায় সিঁটিয়ে পড়ে আছি। মা-কে বাবা বুঝিয়ে পারল না মনোহর ডাকুয়াকে দেখতে তক্ষুণি সে মাতলাহাটি যাবেই। জিপে কম করে দু'ঘণ্টার পথ। অগত্যা বাবা নিয়ে গেল। রঙিলা এসে দু'চোখ কপালে তুলে আমাকে ব্যাপারখানা শোনালো। আমাকে স্থির নিস্পন্দ দেখে ভাবল খবর শুনে ঘাবড়ে গেছি। ব্যাপারটা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছে তার। কিন্তু আমার বিরক্তি দেখে সরে গেল।

আমার মাথায় চিন্তার জট। মনোহর ডাকুয়ার মুখে ঠোঁটে সেলাই, ব্যাণ্ডেজ—দু'চার দিন কথাই বলতে পারবে না নাকি। কিন্তু প্রাণে বাঁচবে এটা বোঝা যাচ্ছে।···তারপরেও সত্যি কথাটা প্রকাশ করবে কি ? মনে হয় বলবে না। আমি কাউকে কিছু বলিনি বুঝলে যা হোক কিছু বানিয়ে বলবে। কিন্তু অত বড় পাজি প্রাণে বাঁচবে যখন, আমি বাবাকে সব বলে দেব না কেন ? সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে মীনামাসির মুখ। তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তার

জীবনটাও বরবাদ হয়ে যাবে।

...নাঃ, তার থেকে আগে দেখা যাক মনোহর ডাকুয়া কি বলে। আমি খুনী নয়, এ ভাবতেও এখন কি যে স্বস্তি আমিই জানি।

বাবার জিপ নিয়ে অফিস করা মাথায় উঠল। পর পর পাঁচ ছ'দিন সকালে বিকেলে মাকে আর মীনা মাসীকে ছুটতে হল মাতলাহাটির ছোট হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে ফিরেই মা রাগে ফেটে পড়েছে। অমন সুন্দর মুখের এই হাল যে করেছে তাকে শাপ শাপান্ত করেছে, বাপ বাপান্ত করেছে। ছ'দিনের দিন নাকি মনোহর ডাকুয়া কথা বলেছে (আমার ধারণা ইচ্ছে করেই আগে মুখ খোলে নি —এদিককার হাওয়া বুঝে তবে খুলেছে), ডাক্তার আর তাদের কাছে ফিরিস্তি দিয়েছে, মাছ ধরতে ভালো লাগছিল না বলে সে জঙ্গলের ঝরণার পাশে বেড়াতে বেড়াতে একটা পাথরে বসেছিল। তখন বাচ্চা হরিণ মারতে গিয়ে একটা যোয়ান ছেলের পরপর ছুটো পাথর তার মুখে লেগেছে—তারপর তার আর কিছু মনে পড়ছে না।

মায়ের সে কি রাগ। দিনের মধ্যে কতবার করে যে ওই আদিবাসী ছেলেটার ফাঁসী দিয়েছে আর ওই ছেলেকে ধরতে পারছে না বলে বাবাকে গালমন্দ করেছে ঠিক নেই। অমন সুন্দর মুখের ওই হাল হয়েছে বলে মায়ের তুঃখের আর ক্ষোভের শেষ নেই। আমার মনে হয়েছে, কি সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল শুনলেও মনোহর ডাকুয়ার ওই হাল আমি করেছি জানলে মা হয়তো আমাকে কেটে ছু'খানা করে ফেলত।

...এ ক'দিন আমি আর মীনা মাসির সঙ্গেও দেখা করিনি। বেঁচে গেছি। সকালে বিকেলে ছু'বেলাই তো সে-ও মায়ের সঙ্গে মাতলা-হাটির হাসপাতালে ছুটছে।

সাত দিনের সকালে মা আমার ঘরে এসে বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নে, জিপ দাঁড়িয়ে আছে—

আমি অবাক।—কোথায়?

—মনোহরকে দেখতে। সে বার বার করে তোকে একবার দেখতে

চেয়েছে। কত ভালবাসে তোকে, নিজেই তো দেখতে যাবার কথা বলতে পারিস—তোদের কি একটুও মায়া দয়া আছে!·

হুকুম দিয়েই মা নিজে তৈরি হতে গেল। শোনামাত্র আমার ভিতরটা বিদ্রোহ করে উঠল। এর পরেও ডেকে পাঠানোর সাহস! তার পরেই মনে হল সাহস নয়। ক'দিন থেকে বাবা-মা অতি আপনার জনের মতো তাকে দেখতে যাচ্ছে। তাই থেকে ধরেই নিয়েছে আমি কাউকে কিছু বলিনি। ভবিষ্যতেও যাতে না বলি. আরো নিশ্চিন্ত হতে চায়। তাই আমাকে দেখতে চাওয়ার নামে কিছু অনুরোধ করতে চায়।···আমি বলতে তো আর কাউকে কিছু পারবই না. মানা মাসির জীবনটাও নষ্ট হতে দিতে পারব না।

···ঠিক আছে যাব।

জিপ সোজা যাচ্ছে দেখে জিগ্যেস করলাম, মীনা মাসি!

—মীনা এখন আর সকালে যেতে পারছে না, তার তো রান্না-খাওয়া আছে—বিকেলে যায়।

বাবাকে তাদের মাতলাহাটির অফিসে ছেড়ে দিয়ে জিপ আমাদের হাসপাতালে নিয়ে গেল। মা আমাকে নিয়ে একটা ছোট কেবিনে ঢুকল।

···ইস! এ আমি কি করেছি! ডান দিকটা কি আর মানুষের মুখ আছে! আমার সমস্ত গা শিউরে উঠল। চোখ বুজে ফেলতে ইচ্ছে করল। বেড-এর সামনে একটাই চেয়ার। মা সেটাতে বসেই খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে দিল। দুই এক কথায় ভালো আছে জানিয়ে মনোহর ডাকুয়া আমার দিকে তাকালো। হাসতে চেষ্টা করল একটু। শয্যার একটু ও-ধারে সরে গিয়ে বলল, বোসো—

মা খেয়ালও করল না, কিন্তু আংকল এখন আমাকে তুই ছেড়ে তুমি বলছে এটা আমার কান এড়ালো না। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। মা কাছে থাকলে একটা সুবিধে, কথা চৌদ্দ আনা সে বলে। শয্যাশায়ী লোকটাকে তপ্ত মুখে আশ্বাস দিচ্ছে, যে শয়তানের বাচ্চা পাথর ছুঁড়েছে তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছে, ওকে ধরতেই হবে,

গায়ের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হবে…জিগ্যেস করছে বার বার, সেই শয়তানের মুখ একটুও মনে পড়ছে কিনা।

ক্ষত বিক্ষত মুখে অস্বস্তি লক্ষ্য করেছি। একটু বিকৃত করে বিড় বিড় করে মনোহর ডাকুয়া জবাব দিল, আর খুঁজে কি হবে, আমারই অনেক পাপ জমা হয়েছিল…তার শাস্তি পেয়েছি। আমার দিকে চেয়ে আবার বলল, বোসো না—

চাপা ধমকের সুরে মা বলল, বলছে বসতে পারিস না? দুর্ঘটনায় আমার যদি এমন হয় তুই কাছে আসবি না নাকি?

শয্যার এক ধারে বসলাম। মনোহর ডাকুয়ার কষ্ট-ক্লিষ্ট চাউনি আমার মুখের ওপর। হঠাৎ মায়ের দিকে একটু কাত হয়ে বলল, ম্যাডাম, এখানকার সবাই তো তোমাকে চিনে গেছে, একবারটি মেট্রনকে গিয়ে জিগ্যেস করে এসো তো, ডাক্তার এখান থেকে আমাকে কবে পর্যন্ত ছাড়বে কিছু বলেছে কিনা, আর একটুও ভালো লাগছে না।

মা তক্ষুণি উঠে চলে গেল।

মনোহর ডাকুয়া আমার একটা হাত ধরল।—তুমি কাউকে কিছু বলোনি আমি কৃতজ্ঞ…তুমি আমাকে উচিত শাস্তি দিয়েছ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি জীবনে আর এরকম করব না, এখন থেকে তোমাকে আমার মেয়ে ভাবব…সেই দুপুরে মদই আমার মাথা খেয়ে দিয়েছিল। তুমি কথা দাও, কোনদিন কাউকে কিছু বলবে না—বলবে না তো?

আমি হাত সরিয়ে নিলাম না। মাথা নাড়লাম। বলব না।

ভারী নিশ্চিন্ত। আবেগ ভরে আমার হাতে একটু চাপ দিল, বলে উঠল, আরো প্রতিজ্ঞা করছি জীবনে আর মদও ছোঁব না—

এই কথার মধ্যেই মা ঘরে ঢুকল। বেশ থমকালো। জীবনে আর মদ ছোঁবে না কানে গেছে। আমার সঙ্গে এমন কথা কেন ভেবে পেল না। বেশ মজাই হল। মায়ের রুষ্ট গম্ভীর মুখ। কাছে এসে আবার চেয়ার নিল।—মেট্রন বলল, সাত আট দিনের মধ্যে ছাড়া পাওয়ার আশা নেই—স্টিচগুলো কাটার পরেও রোজ জ্বর হচ্ছে, ওয়াচে রাখতে হবে।

শুনে মনোহর ডাকুয়া মুখটা বিকৃত করল একটু। আমি তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারছি না পর্যন্ত।

—ওর সঙ্গে মদ ছোঁয় না ছোঁয়ার কথা হচ্ছিল কেন? মদ কি করল? মায়ের গম্ভীর প্রশ্ন।

মনোহর ডাকুয়া সচকিত। আমতা আমতা করে জবাব দিল, শীলা আমাকে কালজানির পাড়ে বসে মদ খেতে খেতে মাছ ধরতে দেখেছিল, ওর ঠিকই ধারণা, মদে বেহুঁস হয়ে আমি জঙ্গলে গিয়ে ঝরণার ধারে বসেছিলাম··· তাই বলছিলাম···

—তার জন্য তুমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে প্রতিজ্ঞা করছ? রুষ্ট দু'চোখ আমার দিকে ফিরল, তোর ছোট মুখে এত পাকা পাকা কথা কেন?

মনোহর ডাকুয়া মদ ছেড়ে দিলে মায়ের কত অসুবিধে সে তো ভালই জানি। মা তখনও দু'পুরে মদ ধরে নি। তাই মাথা খাটিয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, আমি তো ছাড়তে বলিনি, বলছিলাম দিনে দুপুরে না খাওয়া ভালো···

— কেন তুই এ নিয়ে কথা বলবি?

মনোহর ডাকুয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিল, থাক থাক, ছোটদের কথা সব সময় ফেলতে হয় না ম্যাডাম, ঠিক আছে, আমি দিনে আর কক্ষনো মদ খাব না।

মা আশ্বস্ত একটু। আমি এখনো আংকল্ ডাকুয়ার দিকে ভালো করে তাকাতে পারছি না, এরই মধ্যে কেমন হাসিও পাচ্ছে।

·

···আংকল মনোহর ডাকুয়ার যে বড় রকমের একটু পরিবর্তন এসেছে অস্বীকার করতে পারব না। দিনের বেলায় এত বছরের মধ্যেও তাকে আর মদ খেতে দেখিনি। বীভৎস ক্ষত চিহ্ন থেকে গেছে, মানুষটা বদলেছে। কখনো আদরের ছলে আমার গা-ও স্পর্শ করেনি আর। মা-কে নিয়ে বিপাকে পড়লে সে-ই সবার আগে ছুটে এসেছে, যথাসাধ্য করেছে। শীলা মাসিও অনেক পরে মা-কে কথায় কথায়

বলেছে, ওই অঘটনের পর মানুষটা কত বদলেছে আমিই শুধু বুঝি—অমঙ্গলের ফাঁক ধরেও কিছু মঙ্গল আসে বোধহয়।

এ সব ভাবের কথা মায়ের আদৌ ভালো লাগে না।

চেয়ারে বসেই ধড়ফড় করে সজাগ হলাম।…কটা বাজল? মেঘলা আকাশে বেলা ঠাওব হয় না। বিলির ফেরার সময় হল? উঠে ঘরে এসে ঘড়ি দেখলাম। মাত্র দু'টো দশ। অথচ ভাবছিলাম কতক্ষণ না জানি কেটে গেছে। ঠিক সময়ে এলে বিলির বাড়ি ফিরতে এখনো দু'ঘণ্টা দশ বিশ মিনিট। এই উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি থাকি কি করে! …এইটুকু-টুকু বাচ্চাগুলোর চারটে পর্যন্ত ক্লাস থাকাব কোনো মানে হয়? অবশ্য তিন থেকে পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েদের দুটোয় ছুটি। ছয় আর সাত বছর হলে চারটে পর্যন্ত। বিলির এ'বছরেই চারটেয় ছুটি শুরু হয়েছে। কিন্তু এ-ও মনে আছে, ওর দুটোয় ছুটি হত যখন, তখনো ওকে আমি কিছু না কিছু কাজ দিয়ে স্কুলেই আটকে রাখতাম, আমার ছুটির পর সঙ্গে নিয়ে ফিরতাম। আজ ভেতরের তাড়নায় এ-রকম ভাবছি।

অবসন্নের মতো আবার এসে বারান্দার চেয়ারে বসলাম।

॥ চার ॥

আমার (?) চৌদ্দ বছরের জীবনে একটা কালো দাগ পড়-পড় হয়েছিল। কিন্তু পড়েনি। তার কোনো গ্লানি কোন ক্লেদ আর আমাকে ছুঁয়ে নেই। সেই গ্লানি আর ক্লেদের দাগ একলা বয়ে চলেছে শুধু মনোহর ডাকুয়া। তার মন থেকে সে দাগ কতটা মুছেছে আমি জানি না।

কিন্তু আঠের বছরের ভরা যৌবনে যে দাগটা পড়েছিল তার ত্রিসীমানায় কোনো কালোর ছায়া ছিল না। অবশ্য তাতেও আমার দিক থেকে কুমারীর সহজাত বাধা ছিল, প্রতিরোধ ছিল। সেই বাধা

সেই প্রতিরোধ ঝড়ের সন্ধ্যার কুটোর মতোই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে উড়ে উড়ে দূরে সরে গেছল। তখন নিজেরও প্রশ্রয়ের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছিল অস্বীকার করব কি করে? সেটা আমি কোনো দাগ ভাবিনি। বরং তার মধ্যে ঝলমলে ভবিষ্যতের এক অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দেখেছি।

...জলপাইগুড়িতে মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার কটা বছর রয় জার-ভিসের সঙ্গে আমার মেলামেশার সুযোগ একেবারেই কমে গেল। ওদের কোনো ভেকেশনের সঙ্গেই আমাদের ভেকেশন মেলে না। তাছাড়া মেডিক্যাল স্কুলের পড়ার যা চাপ, নিজের ভেকেশনেও রয় বিশেষ আসতে পারে না। এলেও দু'চার দিনের মধ্যে চলে যায়। সেদিক থেকে তার আণ্টি মেলিণ্ডা জারভিস কড়া প্রহরী। মেডিক্যাল পাশ করে বেরুনো যে চাট্টিখানি কথা নয় এটা সে খুব ভালো করেই জানে। উইক-এণ্ডএ ফাঁক পেলে মেলিণ্ডা জারভিস নিজে জলপাইগুড়ি চলে যায়। ভাইপোর পড়াশুনার খোঁজ-খবর নেয়। দুই এক বার ফিরে এসে রাগে গজগজ করতে দেখেছি। রয় এখানে না থাকলে তার কোয়ারটার্সএ একেবারে না যাওয়া যে খারাপ দেখাবে এটুকু জ্ঞান বুদ্ধি আমার আছে। রয় থাকলে যে মেয়ে রোজ আসে, সে না থাকলে একেবারে আসবে না—তার অর্থ কি দাঁড়ায়? তাই রয় না থাকলে আমি বুদ্ধিমতীর মতো মেলিণ্ডা জারভিসেরই তদারক করতে যেতাম। মহিলা খুশি হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মেলিণ্ডা জলপাইগুড়ি থেকে এসে প্রায়ই ভাইপোকে বাতাসে বকে আমাকে শোনাতো।...মোটে পড়াশুনায় মন নেই, মাস্টারেরা বলে মাথা আছে দারুণ, কিন্তু মাথা থাকলে কি হবে? এটা বই নিয়ে বসে তপস্যার সময়...খুব বকে এসেছি, ভেকেশনে আসাও বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। আনন্দ ফুর্তির সময় কি ফুরিয়ে যাচ্ছে! আগে বড় হ', মানুষ হ'—তারপর যত খুশি আমোদ আহ্লাদ কর।

দু'তিনটে বছর কাটতে একটা জিনিস আমি বেশ বুঝেছি, আমার জন্যেই মেলিণ্ডা জারভিস তাকে তার ভেকেশনে কালিম্পঙে আসতে দেয় না। এলেও দু'চার দিনের বেশি থাকতে দেয় না। কারণ, তখন

তার পড়াশুনা সিকেয় ওঠে সত্যি কথাই। জবাবদিহির ছলে মেলিণ্ডা জারভিস আমাকে শোনায়, তুই ভালো মেয়ে, আনন্দ ফুর্তি আছে আবার পড়াশুনায়ও, ক্লাসে ফার্স্ট গার্ল (এটা আমি এই মহিলারই কৃতিত্ব ভাবি, কারণ এখনো সপ্তাহে তিন দিন অন্তত আমাকে ডেকে নিয়ে পড়তে বসায়)—কিন্তু ও ছোঁড়া? একাগ্রতা বলে কিছু আছে? ফুর্তি পেলেই হল!...ও-কে বল, ভবিষ্যতে মস্ত একজন হতে না পারলে আমার কাছে কোনো খাতির নেই!

আমি মজা পেতাম। আনন্দও পেতাম। তখন আমার বয়স ষোলো পেরিয়েছে। না বোঝার কি আছে? মেলিণ্ডা জারভিস প্রকারান্তরে আমাদের দু'জনের ভবিষ্যতটা বুঝিয়েই দেয়। তাই তার কথায় আমার একটুও রাগ হয় না। ছুটিতে পিসীর কাছে এখানে আসতে দেয় না বলেও না। আমি নিজেও ভাবি ওই দামাল ছেলের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার থেকে বেশি আর কার? সে বড় হয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালে আমার থেকে বেশি লাভ আর কার? তাই দু'চার দিনের জন্য রয় এলে আগে দেখা হলেই আমি তাকে উপদেশ দিতাম, মেলিণ্ডার কথা বোঝাতে চেষ্টা করতাম।

কিন্তু বোঝাব কাকে। বুদ্ধিতে তো আমার থেকে কম তুখোড় নয়! যা বলি, তক্ষুনি ভারী ভালো ছেলের মতো মাথা নেড়ে সায় দেয়, আর তাকে-তাকে থাকে কোন ফাঁকে দখল নেবে। একবার দখলে পেলে কম করে পাঁচ সাত মিনিট ধরে হামলা চলে। তাই সর্বদাই আমাকে সাবধান থাকতে হয়। আরো সতর্ক থাকতে হয়, কারণ, ইদানীং রয় এলে তার পিসীও আর সাতটা পর্যন্ত স্কুলে বসে থাকে না, গুটিগুটি পাঁচটার সময়ই কোয়ারটার্স ফিরে আসে। বাগানে আমাদের সঙ্গেই বেড়ায়। তখন রয়ের মুখ দেখে আমার বেজায় হাসি পায়। বাইরে পিসীর সামনে ছেলের হাসি-হাসি মুখ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাগে ফুঁসছে বুঝতে পারি।

কিন্তু ও-ছেলেকে কত আর চোখে বেঁধে রাখবে তার আন্টি। ফাঁক খুঁজে নেবেই। আমার প্রশ্রয় না পেলে অবশ্য সে-রকম সুযোগ

পাওয়া সহজ হত না। কিন্তু মুখে যা-ই বলি, একটু আধটু ওকে নিরিবিলিতে পেতে তো আমিও চাই। ও তখন পাঁচ মিনিটে আধ ঘণ্টার সাধ উশুল করে ছাড়ে। জোর করেই তারপর ওকে ঠেলে সরাতে হয়। রাগ দেখিয়ে বলি, এই জন্যেই আণ্টি তোমাকে এতটুকু বিশ্বাস করে না—ছু'দিনের জন্যে এসে তুমি সাত দিনের পড়াশুনার মনোযোগ নষ্ট করে যাও। মেডিক্যাল স্কুল থেকে ভালোভাবে পাশ করে বেরুনোর আগে আর আমি তোমার মুখও দেখতে চাই না!

কিন্তু ওর আণ্টির আড়ালে খুব নিরাপদ গোছের ছোটখাট হামলা যে খুব অপছন্দ করি না, আর মুখ দেখার জন্য অন্তত আমারও কত আগ্রহ সেটা জানতে বুঝতে বাকি নেই। ভালো মুখ করে বলে, ঠিক আছে, আমিও আর না আসতেই চেষ্টা করব।

...সেবারে ওর রওনা হবার সময় বুঝে আমিও বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে ঠিক জায়গায় এসে অপেক্ষা করছিলাম। ও এলে ফেরার সময় তাই করি। এখানে চুমুটুমু খাবার জায়গা বা আড়াল নেই দেখে ওর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। আমি হাসি চেপে সঙ্গ ধরে বললাম, এবারে গিয়ে কষে মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, রেজাল্ট খারাপ হলে আণ্টি কেন আমিও বিগড়ে যাব বলে দিলাম—

ও তেমনি একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, পড়াশুনায় মন দিতে তো ইচ্ছে করে, কিন্তু কি করি বইয়ের যে পাতা খুলি সে-পাতাতেই কেবল তোমার মুখ—

হাসি পেলেও রাগ দেখাতে ছাড়লাম না।—আমার মুখ এমন কি মন্দ। ছু'চক্ষে দেখতে পারে না, তোমাদের মেমসায়েবদের মতো লাল হয়ে মিশ কালো চুল, কটার বদলে ঘন কালো চোখ—

অবাক যেন।—আমি তো খেয়াল করিনি খুব ঘন কালো চোখ তোমার? দেখি দেখি—

বলার সঙ্গে সঙ্গে এক হাতের হ্যাঁচকা টানে আমাকে রাস্তার ধারে একটা গাছের পিছনে এনেই অন্য হাতের ব্যাগ মাটিতে ফেলে ছু'হাতে জাপটে ধরে তিন-চারটে চুমু। ছাড়িয়ে নিয়ে সশব্দে মাথায় একটা

চাঁটি বসিয়ে দিয়ে সোজা বোর্ডিংয়ের দিকে ছুট আমি। বুকের তলায় কাঁপুনি, কেউ দেখে ফেললে ওর আন্টির কানে যেতই জেনেও এমনি বেপরোয়া!

আমার পড়াশুনা শুরুই হয়েছিল একটু দেরিতে। নইলে সতের বছরে ছেলেমেয়েরা সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করে সাধারণত। নয়তো আঠারোয়। কিন্তু আমি উনিশে পড়ে সিনিয়র কেমব্রিজ দেব। এর অবশ্য একটা সুফলও আছে ক্লাসের সব মেয়ের থেকে আমি দেহে সুঠাম শুধু নয়, বুদ্ধিতেও পাকা। ক্লাসের পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট প্রাইজ নিই। রয় ঠাট্টা করে, তুমি যদি এত ভালো মেয়ে না হতে আন্টির কাছে আমাকে অত বকুনি খেতে হত না। এই বকুনি যে এত কঠিন বাস্তব হয়ে উঠবে ভাবিনি। আমার সতের চলছে, রয়ের একুশ—এবারেই তার মেডিক্যাল স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষা। ফাইন্যালে একেবারে ফেল করে বসল। ওদিকে সেবারেও আমি ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পেয়েছি।

খবরটা আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেলিণ্ডা জারভিস দিল। রয় জারভিস সে-ঘরেই মাথা নিচু করে বসে আছে। মেলিণ্ডার সমস্ত মুখ রাগে লাল। আমাকে দেখা মাত্র গলা খুব না উঁচিয়ে (চেঁচিয়ে কথা বলা তার স্বভাবও নয়) বলল, একটা ভারা সুখবর আছে, সেটা শোনাবার জন্যেই তোকে ডেকে পাঠিয়েছি—রয় মেডিক্যাল ফাইনালে ফেল করেছে!

আমি কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। অথচ মহিলার ওই মূর্তি দেখে বুকের ভিতরে কাঁপুনি। দোষ যেন আমারই।

মেলিণ্ডা জারভিস শ্লেষের সুরে ভাইপোকে বলল, এখন মাথা নিচু করে বসে আছিস কেন—শেইলা এসেছে, আমোদ আহ্লাদ কর গে যা! ও ফার্স্ট হয়েছে আর তুই ফেল করেছিস, সে-জন্য তোর মতো ব্যাটাছেলের আবার লজ্জার কি আছে! শেইলার তো আমার মতো অত বুদ্ধি বিবেচনা নেই যে ফেল-করা ছেলেকে ছেঁটে দেবে—ফার্স্ট হলেও ও তো একটা বোকার মতো উদার মেয়ে!

ইচ্ছে করছিল ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে।

মেলিণ্ডা জারভিস কিন্তু আমার সঙ্গে চিরাচরিত সদয় ব্যবহার করল। খেতে দিল। রয়ের সামনেই আমার এখন থেকেই সিনিয়র কেমব্রিজের জন্য তৈরি হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিল। স্কুলের মুখ আমি উজ্জ্বল করব তার এই আশার কথাও শোনালো (আমাকে না রয়কে ?)।

পরের তিন দিনের মধ্যে আমি আর ও বাড়িমুখো হইনি। মেলিণ্ডা জারভিসের কাছে পড়তেও যাইনি। আমার কেবলই মনে হয়েছে যত ভালো ব্যবহারই করুক, ওই মহিলা আমার ওপরেও তুষ্ট নয়। তার হয়তো মনে মনে ধারণা পড়াশুনার ব্যাপারে আমার কাছ থেকে উৎসাহ তার ভাইপোটি পায়নি। পেলে এমন হত না! হুঁঃ! নিজের মনে আমি রেগে উঠতে চেষ্টা করি। উৎসাহ দেব—ভাইপোটি যে কি চিজ্ হয়ে উঠেছে তা যদি জানত—আমার যেন প্রাণে ভয়-ডর নেই।

পরদিন সকালে চুপি চুপি আমার ঘরে রুক্মিণী এসে হাজির। রুক্মিণী মেলিণ্ডা জারভিসের পুরনো আয়া হীরার মেয়ে। আমারই বয়সী হবে। কালোর ওপর দিব্বি হাসি-খুশি মিষ্টি মেয়ে। ওর মায়ের হাঁপানি রোগ, তাই যতটা পারে মায়ের কাজে সাহায্য করে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন তাই মেলিণ্ডা জারভিসও এই মেয়েটাকে পছন্দ করে।

ওকে দেখে আমি চমকেই উঠেছিলাম। রুক্মিণী (মেলিণ্ডা বলে রুখ্মিনি) আমার হাতে একটা চিঠি দিল। আমি হতভম্ব। খুলে দেখি রয়ের লেখা। ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। কি সাহস ছেলের!

ঊর্ধ্বশ্বাসে পড়লাম। চার পাঁচ লাইনের চিঠি।—আজ চলে যাচ্ছি। পিসীর আদেশ, এক বছরের মধ্যে আর এক দিনের জন্যেও আমার কালিম্পঙ আসা হবে না। পরীক্ষার ফল ভালো করে তবে যেন মাথা উঁচু করে তাকে মুখ দেখাতে আসি। সম্ভব হলে বিকেলে

রাস্তার সেই জায়গায় থেকো।—রয়।

রুক্মিণীকে বললাম, ঠিক আছে।

ও চলে যাচ্ছিল। ফিরে ডাকলাম। একটু ইতস্তত: করে জিগ্যেস করলাম, তুমি এখানে এসেছ মেমসায়েব জানে না তো?

কালো মুখে চাপা হাসি খেলে গেল।—না, ছোট সায়েব আমাকে সমঝে দিয়েছে।

—আচ্ছা যাও। তাড়াতাড়ি বিদেয় করে বাঁচলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মীনা মাসি ঘরে হাজির।—প্রিন্সিপালের বাড়ির আয়ার মেয়ে না?

মাথা নাড়লাম। তাই।

গম্ভীর মুখে মীনা মাসি হাত বাড়ালো।—দে!

হকচকিয়ে গেলাম।—কি?

মীনা মাসি চোখ পাকালো। পলকা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, কি আবার, চিঠি! মেয়েটা এমনি গপ্প করতে এসেছে তোর সঙ্গে কেমন? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস আমরা কিছু বুঝি না?

মীনা মাসি সত্যিই বন্ধুর মতো হয়ে উঠেছে এখন। তাছাড়া ক্লাসে ফার্স্ট হই বলে ডুবে ডুবে একটু আধটু জল খাওয়াটাও উদার চোখেই দেখে। হেসে জবাব দিলাম, ডুবে ডুবে কেন, সকলের চোখের ওপরেই তো যাচ্ছি—এই নাও।

চিঠিতে রসের কথার ছিটে ফোঁটাও নেই। দিতে আপত্তি কি। আর মিথ্যেও বলিনি। রয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্কুলের বড় মেয়েরা অন্তত জানেই।

সত্যি পড়বে কি পড়বে না ভেবে মীনা মাসি ইতস্তত করল একটু। আপত্তিকর হলে চিঠি তার হাতে দিতাম না এ বুদ্ধি আছে। পড়ে চিঠিটা ফেরত দিয়ে মীনা মাসি নাক সিঁটকালো।—এ কেমন চিঠি, হাবা নাকি রে ছোঁড়াটা! আর তার পিসীরই বা এমন হুকুম কেন?

—মেডিক্যাল ফাইন্যালে ফেল করেছে।

—ও…। তার জন্যে ওকে আসতে বারণ করে এবারে তোর ফেল করার ব্যবস্থা করছে ?

ফেলের নামে আমার কিন্তু সত্যিই গায়ে জ্বর। বলে উঠলাম, ইস ! আমার ফেল করতে বয়ে গেছে।

বিকেলে রাস্তার নিশানায় গিয়ে আগে থাকতে অপেক্ষা করছিলাম। রয় এলো। বিমর্ষ মুখ। আমারও খুব খারাপ লাগল। রয় বলল, তিন দিনের মধ্যে আব এলে না যে ?

সত্যি জবাব দিলাম। বললাম, ভয়ে।

—আব আমার কথাটা মনে হল না ? গলার স্বরে অভিমান।—আন্টি না হয় নিষ্ঠুর হতে পারে, তুমি হলে কি করে ? তুমি একটা মেয়ের মতো মেয়ে এই কথা শুনিয়ে শুনিয়ে আমাকে এ ক'দিন কত খোঁচা মেরে কথা বলেছে জানো ?

—তা আমি কি করব, আমাব ওপর রাগ করছ কেন ? তারপর যাবার সময় ওর মন মেজাজ একটু ঠাণ্ডা রাখার তাগিদে বললাম, শোনো, আন্টি তোমার ওপর একটুও নিষ্ঠুর নয়, আমার কথা শুনে তুমি যদি হিংসেয়ও এবারে জেদ ধরে ভালো রেজাল্ট করো এই জন্যেই ও-রকম বলেছে—নইলে আমি এমন কিছুই ভালো ছাত্রী নয়।

একটু গুম হয়ে থেকে রয় চলতে চলতে বলল, কিন্তু আন্টি ভয়ানক অবুঝ, বুঝলে ? কতবার করে বললাম, বারো পারসেন্ট মাত্র পাশ করেছে, মেডিক্যাল ফাইন্যালে এক-আধবার সকলেরই আটকে যেতে হয়—সে-কথা কানেই তোলে না—তার এক কথা, এক পারসেন্ট পাশ করলেও সে আমি নয় কেন।

সেই গাছটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ভালো করে খেয়ালও করিনি। রয়ের উৎসুক চাউনি।—হবে একবার ?

এই ছেলে কি সাত জন্মে শোধরাবে ! আমি সভয়ে তিন হাত সরে গেলাম।—ধেৎ !

—ঠিক আছে, আমি আর এক বছরের মধ্যে আসছি না জেনে

রেখো। রাগে অভিমানে আমাকে ওখানেই ছেড়ে হন হন করে এগিয়ে গেল।

রয় এতো মেজাজ খারাপ করে চলে যেতে আমার দুঃখ হয়েছিল। তা বলে জেনে শুনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি ওকে ওই কাণ্ড করতে দিতে পারি নাকি! ছেলেগুলো অতো অবুঝ হয় কি করে ভেবে পাই না।

একটা বছরের মধ্যে এক দিনের জন্যেও রয় আর সত্যিই কালিম্পঙে আসেনি। মাসে একবার করে মেলিণ্ডা জারভিস জলপাইগুড়ি যায়। টাকা কড়ি দিয়ে আসে। ফিরে এলে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, রয়ের পড়াশুনা কেমন চলছে। কিন্তু সত্যি জিগ্যেস করব অত বুকের পাটা নেই। রয়ের জন্য মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়। খুব ইচ্ছে করে উইক এণ্ড-এ বাড়ি যাবার নাম করে একবার জলপাইগুড়ি চলে যাই। কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিসের পারমিশন পেলেও যেতে পারব না জানা কথাই। হুট করে একটা ছেলের পক্ষে কোথাও চলে গিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করাটা জল-ভাত ব্যাপার। একটা মেয়ের বেলায় বাধার অন্ত নেই। তাছাড়া মেলিণ্ডা জারভিস অমন পারমিশন দিতে পারে সেটা পাগলের কল্পনা।

এখন বয়েস আঠারো আমার। সামনের বছরের গোড়ার দিকেই সিনিয়র কেমব্রিজ ফাইন্যাল। পড়াশুনার চাপ বেড়েছে, ভালোই হয়েছে। অন্য ভাবনা চিন্তার সময় কম।

বিকেল পাঁচটার পরে সেদিন আবার ঘরের দরজায় রুক্মিণী। ওর মা হাঁপানিতে আরো অচল হওয়াতে মেলিণ্ডার ঘরের কাজকর্ম এখন বেশির ভাগ ও-ই করে। খবর দিল, মেমসায়েব বাড়িতে ডাকছে।

আমি আঁতকে উঠলাম। কারণ, অনেকদিন ধরে আমি বিষম উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম। গেলবারের পর ন'মাস বাদে রয়ের আবার মেডিক্যাল ফাইন্যাল দেবার কথা ছিল। ন' মাস ছেড়ে বছর ঘুরতে চলেছে। ফাইন্যালের পরেও রয় আসেনি। কি ব্যাপার, পরীক্ষা কেমন হল কিছুই জানতে পারছি না। খুব সাহসে ভর করে

মেলিণ্ডাকে একদিন বলেছিলাম, মেডিক্যাল ফাইন্যাল তো অনেকদিন হয়ে গেছে, পরীক্ষা কেমন হল চিঠি পত্র পাননি ?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সে জবাব দিয়েছিল, কেমন হল রেজাল্ট বেরুলেই বোঝা যাবে—সেই যে বলেছিলাম, তাই রেজাল্ট বেরুলে আসবে বলে গোঁ ধরে বসে আছে—থাক্ বসে, দেখি এবারে কি রেজাল্ট নিয়ে আসিস।

আমি মনে মনে বলেছিলাম, বেশ করেছে গোঁ ধরে বসে আছে, পুরুষমানুষের এ-রকম গোঁ থাকাই উচিত।

কিন্তু এখন এই ডাক পেয়ে আমার ভিতরে প্র তঙ্ক। রুক্মিণীকেই জিগ্যেস করলাম, কেউ বাড়িতে এসেছে ?

—ছোট সায়েব…। মুচকি হাসল রুক্মিণী।

বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল। পাশ-ফেলের খবর ওর জানার কথা নয়। তবু উদ্বেগ চাপতে না পেরে ওকেই জিগ্যেস করলাম, মেমসায়েব রাগটাগ কিছু করছে ?

রুক্মিণীর ঢলঢলে কালো মুখে হাসির চেকনাই। রয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এতদিনেও ওর না জানার বা না বোঝার কথা নয়। মুখ দেখেই আমার ভিতরের উদ্বেগ আঁচ করতে পারছে। মাথা নেড়ে জবাব দিল, জানি না, নিচে ছিলাম, আমাকে বলল, ডেকে নিয়ে আসতে।

চললাম। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় আর উঠতে পারি না। পায়ে পায়ে সামনের বড় ঘরটার কাছে গিয়ে দেখলাম, আগের বারের মতোই ছ'জনে ছটো চেয়ারে বসে। রয় গম্ভীর, কিন্তু ওটা কেমন খাঁটি মনে হল না আমার। মেলিণ্ডার হাসি হাসি মুখ।

সদয় গলায় ডাকল, আয়।

আমারই যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে।

ঠাট্টার সুরে মেলিণ্ডা এবারে ভাইপোকে বলল, চুপ করে আছিস কেন, ওকে বল্ কি দিগ্বিজয় করে এলি—ও খুব ভাবনার মধ্যে ছিল।

—আমি কেন, রয়ের গম্ভীর গলায়ও কৌতুকের ছোঁয়া, আগের

বারে ঝাঁটা পেটা করেছ, এবারেও যা বলার তুমিই বলো।

পাশের চেয়ারটা চাপড়ে মেলিণ্ডা জারভিস বলল, আয়, বোস্—রয় খুব ভালো পাশ করেছে, সেকেণ্ড না কি হয়েছে বলছে—গেজেট দেখার আগে পর্যন্ত আমি অবশ্য বিশ্বাস করছি না।

আনন্দে আমার চোখ মুখ কতটা উদ্ভাসিত হয়েছিল কি করে জানব! রয় আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। মেলিণ্ডা জারভিসের ঠোঁটেও হাসি। আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল, তোর দু'চোখ এমন কপালে উঠল কেন—খুব মস্ত ব্যাপার কিছু হয়েছে নাকি!…কলকাতায় গিয়ে এবারে কনডেন্সড এম. বি. পড়ার তোড়জোড় করুক… ফিউচার শুরু তো তার পরে—এখনই হয়েছে কি!

বলল বটে, মন যে খুশিতে ভরপুর বোঝাই যায়। বিকেলের চা-টায়ের পর্ব বেশ ভালই হল। তারপর আমাদের না ডেকে একলাই নিজের বাগানে হাঁটতে চলে গেল। অর্থাৎ আজ সদয় হয়ে আমাদের নিরিবিলিতে কথা-বার্তা বলতে দিতে আপত্তি নেই।

রয় এইটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। ঠোঁটে টিপটিপ হাসি। ওর মতলব ভালো না বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম, অসভ্যতা করবে না বলছি!

উঠে দাঁড়ানোর ফলে ওর যে এই সুবিধে হবে তা কি জানি! দু' হাতে আমাকে যেন ছোঁ মেরে বুকে তুলে নিয়ে ছুটে পাশের ঘরে চলে গেল। তারপর সে-কি পাগলের মতো কাণ্ড। কত বাধা দেবে! এক বছরের উপোস কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে উশুল করার তাড়া। ভালো পরীক্ষা পাশের ফলে ওর যেন আমার ঠোঁট গাল বুক আর শরীরের মাংস খুলে খুলে দেখার অধিকার জন্মেছে। ওদিকে ঘরের দরজা দুটো হাঁ করে খোলা।

মিনিট আট-দশ বাদে কয়েক নিমেষের বিরতির ফাঁকে ওকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে আমি ছুট্। একেবারে নিচে। তারপর খানিক দম নিয়ে বাগানে মেলিণ্ডা জারভিসের কাছে। বাগানে আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। নয়তো তা-ও সাহস করতাম না। মেলিণ্ডা জারভিস

হয়তো মুখ দেখেই কিছু বুঝে ফেলত।

রয়কে ছেড়ে এরই মধ্যে আমি একলা নেমে আসতে পারি মেলিণ্ডা জারভিস তা-ও আশা করেনি। জিগ্যেস করল, ও ছোঁড়া কি করছে?

বললাম, আসছে···।

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল কি। তারপর বলল, রয় আসার আগে যা বলি শুনে নে, এই পরীক্ষায় ভালো করা খুব বেশি কিছু নয়। তুই এমন ভাব দেখাবি এখন থেকে কনডেন্সড্ কোর্স এম. বি.'র ফল যাতে ভালো হয় সেই উৎসাহ দিবি—ইচ্ছে করলেই পারে দেখলি তো?

আজ ঘুম ভাঙার পর কার মুখ দেখেছিলাম প্রথম? ডানা মেলে পাখির মতো বাতাসে ভাসতে ইচ্ছে করছে। রয়ের ভালো পাশ করাটা যে নিজের ফার্স্ট হওয়ার আনন্দের থেকেও চারগুণ বেশি এ-ও কি আগে কখনো অনুভব করেছি। সে আনন্দ তো আছেই, কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিস এখন যে কথা বলল, সে-কথা শোনার ভাগ্য এক আমি ছাড়া কি পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের হতে পারে? শুধু আমাকেই এ কথা বলার যে অর্থ সে কি আর একটুও অস্পষ্ট—একটুও গোপন? রয়কে নিয়ে ভবিষ্যতে আমার চোখের সামনে যে স্বপ্ন, যত রাশভারীই হোক মেলিণ্ডা জারভিসের চোখেও যে সেই একই স্বপ্ন তাতে কি এর পরেও আর ভুল থাকতে পারে!

নিজের মা-কে আনন্দে কখনো জড়িয়ে ধরেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিসকে আজ আমার দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল।···দুনিয়ার কোনো পিসী কি তার ভাইপোকে এত ভাল বেসেছে! আমার মনে হয় না রয় জারভিসের মতো এত ভাগ্য আর কারো হতে পারে।

তিন দিন পরে।

বেলা দশটা এগারোটা থেকে মেঘে মেঘে আকাশ কালি। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত বর্ষালো না। কেবল আকাশের চেহারা ভয়ংকর থেকে আরো ভয়ংকর হতে লাগল। বেলা চারটের সময় মনে হল সন্ধ্যা। বাতাসে বড় বড় গাছগুলো অল্প অল্প দুলছে। কোনো আসন্ন তাণ্ডব

থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা যেন তৈরি হচ্ছে।

থেকে থেকে খুব চাপা গুরগুর মেঘ ডাকছে। অত মেঘ কিন্তু উত্তরের কোণে লালচে আভা। সবই প্রলয়ের লক্ষণ।

পাঁচটার সময় আরো অন্ধকার। বোর্ডিংএর মেয়েরা এসেছে। কিন্তু টিচাররা আসেনি। প্রিন্সিপাল তাদের নিয়ে মাসিক মিটিংএ বসেছে। ঘণ্টা দেড়েকের আগে সে মিটিং শেষ হয় না। কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিসের বোধহয় আকাশের দিকে চোখ ছিল না। থাকলে মিটিং স্থগিত রাখত।

এই স্তব্ধ আকাশে বাতাসে সেদিন কি মন্ত্রণা ছিল কে জানে। মন বলছে বেরুনো উচিত নয়, এই ঝড় আর বৃষ্টি মাথায় ভেঙে পড়লে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব কি না সন্দেহ। কিন্তু কেউ যেন আমাকে বাইরের দিকে ঠেলে দিল। রেন কোটটা চাপিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে প্রায় ছুট দিলাম। বাতাসের জোর অল্প অল্প বাড়ছে টের পাচ্ছি। বাইরে এখনো যত ফেরার তাগিদ, ভিতরে ততো এগনোর তাগিদ। ঝড় জলের ভয়ে দুনিয়ার কোনো প্রেমিক প্রেমিকা যে-যার ঘরে সেঁধিয়ে থাকে—এমনও কখনো হয়! আবার দেখছি আকাশের যা চেহারা, ঘর ছেড়ে বেরুনোর নামে কাঁপুনি ধরার কথা। আসলে এই আকাশ আর বাতাস আমার মধ্যে ফেরার বদলে ছুটে যাবার রোমাঞ্চ ছড়াচ্ছে।

আকাশ মাথায় ভাঙার আগেই পৌঁছে গেলাম। রয় দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে দৌড়ে নেমে এলো। এক-গাল হেসে বলল, গড্ অফ ক্লাউড অ্যাণ্ড স্টর্মকে এতক্ষণ আমি শাপ-শাপান্ত করছিলাম, কিন্তু এখন বলছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ!

নিজের হাতে রয় আমার গা থেকে রেন কোটটা খুলে নিল। রুক্মিণী অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছে ভ্রূক্ষেপ নেই, কোমর জড়িয়ে ধরে দোতলায় টেনে নিয়ে চলল। আমি যতটা পারি ওকে ঠেলে ঠেলে সরাচ্ছি। মাঝ সিঁড়িতে উঠে রয় ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর হাঁক দিল, —রুখ্‌মিনি—কফি!

আবার উঠতে লাগল। সামনের বড় ঘরে দু'জনে বসতে না বসতে

সেই বহু আশঙ্কার প্রলয়। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়। আকাশের সমস্ত আক্রোশ আজ পৃথিবীর ওপর।

রয় চটপট সব দরজা জানলা বন্ধ করে কেবল সামনের বড় দরজার এক পাট খোলা রাখল। না বন্ধ করলে ওগুলো ভেঙে চুরমার হবে। মুখোমুখি আবার বসে জিগ্যেস করল, তুমি বোর্ডিং হয়ে চলে এলে, আন্টি এলো না⋯এরপর আসবে কি করে?

বললাম, তার আজ মানথলি মিটিং। আকাশের দিকে চোখ ছিল না বোধহয়, সব টিচারদের নিয়ে বসেছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ভালো করলাম না। শোনা মাত্র আমার মুখের ওপর রয়ের দু'চোখ চকচক করতে লাগল। আর দুই ঠোঁটে আনন্দ উছলে পড়তে চাইছে।

রুক্মিণী এক-পাট খোলা দরজা দিয়ে কফি নিয়ে এলো। কফি খেতে খেতে গম্ভীর মুখে রয় তাকে বলল, নিচের দরজা জানালা বন্ধ করে কাচের ভেতর দিয়ে গেটের দিকে চোখ রেখো, তোমার মেমসায়েব এসে গেলে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসতে হবে⋯।

ও মাথা নেড়ে চলে গেল। আমি বললাম, মতলবখানা কি তোমার. বললাম যে আমার আন্টি স্কুলেই আটকে গেছে। এর মধ্যে এ-সময় কেউ রাস্তায় বেরোয় নাকি!

রয় মুচকি হেসে বলল, বলা তো যায় না যদি বেরিয়ে পড়ে, বুড়ো মানুষ⋯পড়ে টড়ে গেলে তো হয়ে গেল। ডাক্তার হিসেবে আমার একটা দায়-দায়িত্ব আছে না?

মেলিণ্ডা জারভিস তখনো শক্ত পোক্ত কাঠামোর মানুষ! আমার মন বলছে, আজ আসা উচিত হয়নি, খুব অন্যায় হয়েছে। আবার আমারই ভেতর থেকে কেউ তার প্রতিবাদ করছে, না এসে পারি কি করে⋯!

দরজা জানালা সব বন্ধ থাকার দরুণ ঝড়ের তাণ্ডব একটা চাপা গর্জনের মতো শোনাচ্ছে। রুক্মিণী বেরিয়ে যেতে রয় আধ-পাট খোলা দরজাটাও বন্ধ করেছে। কফি শেষ হতে উঠে দাঁড়ালো। বলল,

চলো, আমার মেডিক্যালের যন্ত্রপাতি, অ্যানাটমির সরঞ্জাম এ-সব তো এই চার বছরের মধ্যে তুমি কিছুই এখনো দেখোনি—

হাত ধরে আমাকে টেনে তুলল। এই আবহাওয়ায় তার যন্ত্রপাতি দেখানোর আগ্রহটা স্বাভাবিক লাগল না। আর ওর এই অতি সভ্য-ভব্য মুখ দেখেও আমার সন্দেহ গেল না।—শয়তানি করবে না তো?

হাঁ করে একটু মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আমার আশঙ্কা বুঝেই যেন হেসে উঠল।—কলকাতায় যাবার চিন্তা মাথায় ঢুকে ছিল, আন্টির তো দিবা-রাত্র তাড়া, মনে-বেঁধে তৈরি হ', —তার মধ্যে তুমি মনে করিয়ে দিলে—তাতো একটু করবই —তা বলে তুমি সেটা শয়তানি বলবে নাকি!

জবাব শোনার তর সইল না। ত্ব'হাতে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বেশ করে চুমু খেল। এটুকু বিশেষ করে এই দুর্যোগে এখন আর ঠিক শয়তানিব মধ্যে ধরি না। তাছাড়া মনে মনে এটুকুর জন্য নিজেও কি প্রস্তুত ছিলাম না?

আমাকে বলল, ফেরত দাও।

অর্থাৎ চুমু ফেরত। দিলাম। কিন্তু ওর যেন একটুও মন ভরল না। বলল. এই ঝড়ের দিনের চুমু কিছুটা ঝড়ের মতোই হওয়া উচিত। তোমার এই চুমু আজকের দিনে সুক্তোর মতো। ফলে আরো পাঁচ সাত মিনিট ধরে এ-ই চলল।

এবারে দু'হাতের দখল ছেড়ে আমার একখানা হাত ধরে বলল, চলো, আবার তো সব গোছগাছ করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে— তার আগে তোমাকে দেখাই—

কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। আপত্তি করলাম না। ভালো পাশ করেছে, পড়াশুনার ভাবনা একটু মাথায় থাকতেই পারে। সামনের ঘরের পাশে কোণের ঘরটা রয়ের।—বোসো।

শয্যার দিকে আমাকে এগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখের পলকে দরজা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, রয়!

ও হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। গায়ে হাত দেবার আগেই সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। জড়িয়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে আমাকে ওই শয্যায় নিয়ে এলো। আমি তেমন জোর করেছি ন', তেমন বাধা দিয়েছি কিনা মনে পড়ে না।

…আমার কেবল কিছু কিছু মনে আছে। বার বার আমার মুখ দিয়ে একটাই আকুতি বেরিয়ে আসছিল, না রয় না…না না রয় না…

আমাকে আবো দখলের মধ্যে এনে ওর ফিসফিস জবাব, তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন. তুমি কি সত্যিই ভীতু মেয়ে। কি-চ্ছু গণ্ডগোল হবে না, হলেও ভয় নেই, আমি তো ডাক্তার…।

…আব মনে পড়ছে, কালজ্ঞানিব জঙ্গলে ঝরণার ধারের পাথরে শুয়ে নয়. ওর বিছানায় শুয়ে তখনো বুকেব ওপর থেকে ওকে সরাতে চেষ্টা করছি, আব বলছি, না বয় না…কিন্তু ওব সেই উল্লাসেব মুহূর্ত এগিয়ে আসছে.. তখন হঠাৎ ওব দিকে চেয়ে একবার আমার মনোহর ডাকুয়ার মুখটা ভেসে উঠেছে…সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, হাতের কাছে একটা কিছু পেলে এই মুখের দশাও আমি কি ওই রকমই করে দেব ?…সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠেছি, আমাব মুখের ওপর বুকের ওপর দেহের ওপব মনোহব ডাকুযার মুখ নয…রয়ের মুখ। তার মুখের ওই দশা মনে হতে শিউরে উঠে না-না বলতে বলতেও দুই বাহুতে আমি তাকে বুকে আঁকড়ে ধরেছি।

ঝড়ের পৃথিবী বুঝি থেমে ছিল। কিছুক্ষণ…হয়তো বা অনেকক্ষণ…।

দেড় ঘণ্টা বাদে ঝড় থেমেছে। বেশ বৃষ্টি তখনো। রয় অনেক বার বারণ করেছে, তবু রেন-কোট গায়ে চাপিয়ে আর হুডটা মাথায় তুলে নেমে এলাম। মেলিণ্ডা জারভিসের সামনে আজ কেন, কাল পরশু তরশুও দাঁড়াতে পারব কি ? আমি এসেছিলাম, কতক্ষণ ছিলাম সে তো রুক্মিণীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। না এলেও সাদা বুদ্ধির রুক্মিণী এই দুর্যোগে আমার আসার খবরটা মেমসায়েবকে দেবে না কেন ?

রুক্মিণী নিজের বারান্দাতেই বন্ধ দরজার এ-ধারে বসে আছে। বৃষ্টি মাথায় করে আমাকে বেরুতে দেখে ও কি অবাক হল? আমার দিকে আড়চোখে তাকালো কি একবার? ওর ঠোঁটে কি চাপা হাসি খেলে গেল? আমাকে দেখে ঈষৎ বিস্ময়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে অবশ্য।

বেরিয়ে এলাম। চোখে মুখে জলের ছাঁট লাগল। ভিতর থেকে টের পাইনি, বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসও একেবারে বন্ধ হয় নি···রুক্মিণী কি সারক্ষণই নিচের তলায় বসে ছিল? একবারও ওপরে ওঠেনি? পরদা সরিয়ে একবারও কাচের জানলা দিয়ে দেখেনি হল্ ঘরে হু'জনের কেউ নেই? মরুকগে, আর ভাবতে পারি না। আমার এখন শুধু মনে মনে প্রার্থনা, বোর্ডিংএ ফিরে যেন মীনা মাসির মুখো-মুখি না পড়ি।

···কিন্তু এ-রকম ভাবছি কেন? আমি কি কোনো কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরছি? একবারও তো সে-রকম মনে হচ্ছে না।···মনোহর ডাকুয়ার কবল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে আমি চান করেছিলাম, মনে হয়েছিল রাজ্যের ক্লেদ ধুয়ে ফেলছিলাম, যদিও শেষ পর্যন্ত সে আমার নাগাল পায়নি, তার মুখের ক্ষত সার। কিন্তু এখন শুধু মনে হচ্ছে, এক ডাকাত আমার সর্বস্ব লুটে পুটে নিয়েছে—আগে হোক পরে হোক, সেই নিত—সে-ই নেবে। আশ্চর্য! জ্বালা নয়, যন্ত্রণা নয়, উল্টে কোথাও যেন ভারি একটা শান্তির অনুভূতি।

হঠাৎ কি মনে পড়তে ভিতরটা খুশি হয়ে উঠল। কালকের দিনটা যদি মেলিণ্ডা জারভিসকে মুখ না দেখিয়ে কাটাতে পারি তাহলে বেশ কটা দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। পরশু তরশু উইক্এণ্ড-এর ছুটি। তারপর তিন দিন কি একটা পর্ব উপলক্ষে ছুটি। গেল সোম মঙ্গল বুধ। বোর্ডিংএর মেয়েদের সুবিধের জন্য পরের হু'টো দিন ছুটি দিয়ে এ সপ্তাহের পরের সপ্তাহ পুরো স্কুল বন্ধ থাকবে কিনা মিটিংয়ে আজ নিশ্চয় সে আলোচনাও উঠেছে। ছুটি থাক না থাক, পরশু শালজুড়ি রওনা হয়ে আমি পরের পুরো সপ্তাহটা সেখানে কাটিয়েই আসব।

রয়ের জন্য একটু কষ্ট হবে অবশ্য। কিন্তু যে-রকম পাজি, একটু আক্কেল হওয়াই উচিত। আর এখন মেলিণ্ডা জারভিসের মুখোমুখি পড়া থেকে সবই ভালো। অবশ্য সব নির্ভর করছে কালকের দিনটার ওপর।

না, এই বৃষ্টিতে বারান্দায় কেউ নেই। সবারই ঘরের দরজা বন্ধ। পা, টিপে নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম। রেন কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। গায়ের জামা ছাড়া হল না, ভিজে মুখ মোছা হল না।

না, পাপ তো কিছু করিনি, মনের তলায় অস্বস্তি আছে, কোনরকম পাপ বোধ নেই—বরাত খারাপ হবে কেন? পরদিন মেলিণ্ডা জারভিসকে মুখ দেখাতে হল না তার ক্লাস ছিল না। ডেকেও পাঠায় নি। আর ও-দিকে সামনের সারা সপ্তাহটাই ছুটি। আজ আমার ভেতরটা তরতাজা। একটু বেপরোয়াও। রুক্মিণী তার মেমসায়েবকে ঝড় মাথায় করে আমার আসর কথা আর বৃষ্টির মধ্যেই চলে যাওয়ার কথা বলেছে কিনা—অনেকবার সেই চিন্তা হয়েছে। কিন্তু সামনের কটা দিন ছুটি থাকার দরুণ সে-চিন্তাও মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি। যদি বলেও থাকে কি হবে? মেলিণ্ডা জারভিস কি ভাববে? কত দূর পর্যন্ত ভাবতে পারবে? রয় কি এত কাঁচা যে তার মুখ দেখেই কিছু বুঝে ফেলবে? ওটা এমন পাজির পা-ঝাড়া যে মুহূর্তের মধ্যে ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না সেই মুখ করে ফেলতে পারে। আমাকে পর্যন্ত যন্ত্রপাতি দেখানোর নাম করে ধোঁকা দিতে পেরেছে।

এতগুলো দিনের জন্য শালজুড়ি চলে যাব, ওই দুরন্ত দস্যিটার কাছে একবার যেতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা তক্ষুণি বাতিল। এক মেলিণ্ডা জারভিসের সামনে তাহলে পড়তেই হবে। দুই, ওই শয়তানকে আর একটুও বিশ্বাস নেই। তার থেকে ভাবুক, রাগ করেই আমি দেখা না করে চলে গেছি।

কিন্তু মনের তলায় অন্য একটা অস্বস্তি উঁকিঝুকি দিচ্ছে।...ঈশ্বর, গণ্ডগোল যেন কিছু না হয়। রয় অবশ্য বলেছে, হলেও কোনো ভয় নেই। সে ডাক্তার। দরকার হলে ব্যবস্থা সে-ই করবে। কিন্তু

আমার ভয় সে জন্য নয়। উপরতলার প্রথম আশীর্বাদ যেন জোর করে বরবাদ না করতে হয়। নাঃ, গণ্ডগোল আবার কি হবে। কিচ্ছু হবে না। একদিনে অমন গণ্ডগোল নাটক নভেলে হয়।

এবারে শালজুড়িতে এসে কয়েকটা দিন আমি হাওয়ায় ভেসে বেড়ালাম। অথচ বাবার কাছে শুনলাম, মায়ের মদ খাওয়া বেড়েছে, সেই সঙ্গে বিকৃতিও। ক্লাবে গিয়ে হল্লা করে, ঝগড়া করে। বাবার জন্য সত্যি দুঃখ হয়। এত ভদ্র বলেই মায়ের এত দাপট এত বাড়াবাড়ি। ভবিষ্যতে রয়কে আমি কক্ষনো মদ খেতে দেব না। মায়ের মদ গেলা নিয়ে বাবা যদি গোড়া থেকে শক্ত হতে পারত তাহলে আজ এমন দুর্ভোগ হত না। রয়কে কোনদিন মদ ছুঁতে দেখলে প্রথমেই আমি ওকে ডিভোর্স করার হুমকি দেব।

সাতটা দিন কেটে গেছে। কাল বাদে পরশু আবার কালিম্পঙে। এ ক'টা দিন সমস্তটা দুপুর গ্র্যাণ্ডিব কাছে কাটিয়েছি। কত রকমের ছবি এঁকেছি, কত গল্প করেছি। গ্র্যাণ্ডি বলেছে, এবারে যেন তোর ফুর্তি আর উৎসাহ একটু বেশি মনে হয়েছে?

তার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছি, দিনে দিনে তোমার ওপর ভালবাসা বাড়ছে যে!

জবাবে গ্র্যাণ্ডি আগে কুত-কুত করে আমাকে খানিক দেখেছে। তারপর আমার গালে মুখে বুকে নাক ঠেকিয়ে ঘটা করে শুঁকেছে।

আমি অবাক।—এ আবার কি হচ্ছে?

—কুকুরের স্বভাব-গুণ জানিস না? বাড়ির লোক অন্য কুকুরে ঘাঁটা-ঘাঁটি করলে পোষা কুকুর তার গায়ে সেই কুকুরের গন্ধ পায়। তোর গায়ে আমি তেমনি অন্য পুরুষের গন্ধ পাচ্ছি।

শুনে আমার বুক গুরু গুরু। রাগ দেখিয়ে তার নাক-ঘষা বন্ধ করার জন্য জোরেই ধাক্কা লাগালাম একটা।

সন্ধ্যায় রোজ মীনা মাসির বাড়িতে কাব্য আলোচনায় বসেছি। বলা বাহুল্য, রবিঠাকুরের কবিতা। কত দিন ভেবেছি, ওই মহা কবিকে যদি চোখে একবার দেখতে পারি জীবন ধন্য হয়। সব বয়সের সমস্ত

রকমের মেজাজ যেন তার কলমে ধরা। কালি মধু যামিনীতে খুলে বসেছি প্রায় রোজ। রাতে যে প্রেয়সীর মুখে ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা তুলে ধরা হয়েছে, সকালে তাকেই স্নানের পর সাজিতে পুজোর ফুল তুলতে দেখে প্রেমিক সসম্ভ্রমে চেয়ে আছে। মানা মাসি ঠাট্টার বাণ ছুড়েছে, প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিস যে রে!

আমি কি করে বলি, আমার ঠিক ওই প্রেমিকার মতো হতে ইচ্ছে করে।

শনিবার ছুপুরে গ্র্যাণ্ডির স্টুডিওতে ঢুকেই আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম একটা। চেয়ারে মেলিণ্ডা জারভিস বসে। শুকনো বিরস মুখ। কে যেন খানিকটা জীবনীশক্তি তার ভেতর থেকে টেনে নিয়েছে। আমাকে দেখেও তার মুখে খুশির ছিটে-ফোঁটা দেখলাম না। অদূরের ইজি চেয়ারে গ্র্যাণ্ড মেরি বসে আছে। তারও চিন্তাচ্ছন্ন মুখ। আমার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল।

গ্র্যাণ্ডি ইজিচেয়ারের হাতল চাপড়ে বলল, আয়, বোস্।

সাধারণত আমি প্রথমে এসে চেয়ারের ওই হাতলেই বসি। আজ কেন যেন সেটা পারা গেল না। তার পাশে একটা মোড়া টেনে বসলাম।...মেলিণ্ডা জারভিস আমার দিকে শুকনো চোখে চেয়ে আছে কেন?

স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় জিগ্যেস করলাম, আপনি কবে এলেন?

—আজ সকালের বাসে। তুই কেমন আছিস?

এই প্রশ্ন শুনে আমি আরো নার্ভাস। যে ভাবে বলল, তাতে মনে হল আমার যেন ভালো না থাকার কারণ আছে। শুকনো জবাব দিলাম, ভালো।

—আমি এসেই তোর গ্র্যাণ্ডিকে জিগ্যেস করলাম তোর শরীর কেমন আছে।...সেদিন অত জল-ঝড় মাথায় করে কোয়ার্টার্স থেকে তোর হস্টেলে ফেরার দরকার কি ছিল? সেদিন আমি জানতেই পারিনি, পরদিন তোকে না দেখে রুথ্মিণীর কাছে শুনলাম, আগের সন্ধ্যায় জল-ঝড় মাথায় করে চলে গেছিস। অমন দিনে এসেছিলি

কেন—আর এলি যদি ও-ভাবে চলে গেলিই বা কেন।...আমি ভাবলাম জ্বর-জ্বালা বাঁধিয়ে বসেছিস—ভোরের বাসে তো শুনলাম চলেই গেছিস।

...না, আদৌ কর্কশ নয়, রুক্ষ তো নয়ই। গলার স্বর শুকনো হলেও সাদাসিধে স্নেহের ভাবটাই বেশি। কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিসকে এমন দেখাচ্ছে কেন? মনে হয় দু'রাত ঘুমোয়নি। আর গ্র্যাণ্ডিই বা আজ হাসি-খুশি নয় কেন! আমি ছেড়ে মেলিণ্ডা জারভিস এলেও তো খুশিতে তার মুখের দাড়িসুদ্ধ ঝলমল করে—কি এমন চিন্তার কারণ ঘটল দু'জনের?

মেলিণ্ডার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, আপনার শরীর অসুস্থ নাকি?

—না ভালোই আছি। একটু ঘুরে বসে আমার দিকে সোজা তাকালো।—কালকেই আবার ফিরব, ছুটি নিয়ে রয়ের সঙ্গে কলকাতা যাব, সেখান থেকে ওকে লণ্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা করে তবে ফিরব—এ-সব নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি।

আমি হাঁ। নিজের অজান্তেই গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, রয় লণ্ডন যাবে!...কলকাতায় পড়বে না?

একটু ক্ষোভের সঙ্গে জবাব দিল, না—ওকে লণ্ডনে পড়তে পাঠাচ্ছি!

মেলিণ্ডা জারভিস নিজের ক্লান্ত দেহটাকে যেন চেয়ার থেকে টেনে তুলল। বলল, যাই, ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি।...তুইও কাল সকালের বাসেই ফিরছিস তো?

আমি যন্ত্রের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলাম। ভিতরটা কাঠ হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে কি ঘটে গেল, কি এমন ঘটে গেল যে রয় কলকাতায় পড়তে না গিয়ে একেবারে লণ্ডনে পড়তে চলে যাচ্ছে!

মেলিণ্ডা জারভিস ঘর থেকে বেরুতেই মোড়াটা গ্র্যাণ্ডির কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে উদগ্রীব হয়ে জিগ্যেস করলাম, ছুটি ফুরোবার মুখে উনি হঠাৎ এলেন—কালই চলে যাবেন...কি হয়েছে গ্র্যাণ্ডি?

—কিসের কি হবে?

—রয় লণ্ডনে যাচ্ছে কেন?

—ডাক্তারি পড়তে।

—আগে তো কলকাতায় পড়বে ঠিক ছিল?

—সেটা বেঠিক হয়ে গেল!

—কেন হল? কেন?

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে গ্র্যাণ্ডি জবাব দিল, অত জানি না বাপু। দ্য বিগ লেডির মেজাজ খারাপ দেখে আমিও বেজার মুখ করে বসেছিলাম, আসলে কোনো কিছু নিয়েই অত উতলা হবার কিছু নেই—বুঝলি? বিগ লেডিকেও সে-কথাই বোঝাচ্ছিলাম।

—কিন্তু অত উতলা হবারই বা কি হল?

—হলে ঠেকাব কি করে? একটু রয়ে সয়ে গ্র্যাণ্ডি আবার বলল, তবে এটুকু বুঝলাম, দ্য বিগ লেডি তোকে রয়ের থেকেও বেশি ভালোবাসে···। ও উপযুক্ত হয়ে না ফিরলে কোনো খাতির নেই।

চমকে উঠলাম। মুখ দিয়ে আপনিই পরের প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো।—আমার জন্যেই রয়কে সরে যেতে হচ্ছে নাকি?

—তুই কে? গ্র্যাণ্ডির নির্বিকার মুখ, হাতের পেন্সিল একটা কাগজের ওপর নক্সা কেটে চলেছে।—তার কর্মফল তাকে ঘোরাচ্ছে।···অত জেরা করিস না বাপু, আমি ভালো মন্দ কিছুতে নেই। বেশি জানতে হয় তো বিগ লেডিকে গিয়ে জিগ্যেস কর গে যা—।

মুখ কালো করে উঠে এলাম। সেই সন্ধ্যায় আর মীনা মাসির কাছেও যেতে পারলাম না। সমস্ত রাত ছটফট করে কাটল। এরই মধ্যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে সন্দেহ নেই। সেই রাতের ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে এমন মনে হচ্ছে না। আমার প্রতি মেলিণ্ডার আচরণ তাহলে কিছু অন্যরকম হতই। তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। রয়ই বা কেমন ছেলে—কি হয়েছে না হয়েছে আমাকে একটা চিঠি লিখেও তো জানাতে পারত! এমন কি ফাঁক বুঝে কয়েক

ঘণ্টার জন্য শালজুড়িতেও চলে আসতে পারত। কলকাতার বদলে সে একেবারে লণ্ডন পাড়ি দিচ্ছে এ কি আমাকে জানানোর মতো খবর নয় নাকি!

সকালের বাস।

মেলিণ্ডা জারভিস ডেকে আমাকে তার পাশে বসালো। খুব গম্ভীর। সেই বাসে মীনা মাসি আর আরো কয়েকজন স্কুলের মেয়ে আছে। প্রিন্সিপালকে দেখে সকলেই চুপ। এই বাসে এক আমি ছাড়া তাকে আর কেউ আশা করেনি।

মেলিণ্ডা জারভিস প্রায় অর্ধেক পথ চুপ। মাঝে এক-আধবার শুধু আমার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখেছে। কিন্তু আমি আড়ষ্ট।

খুব মৃদু গলায় একবার বলল, রয় চলে যাচ্ছে বলে তোর খুব দুঃখ হচ্ছে?

কেন জানি আমার কান্না পাচ্ছিল আবার রাগও হচ্ছিল। দাঁতে করে ঠোঁট চেপে আমি বসে রইলাম।

একটু বাদে আমার কাঁধে তার আঙুলের চাপ পড়ল সামান্য। এটুকুও স্নেহেরই প্রকাশ। আমি নিঃশব্দে তার দিকে মুখ তুললাম। মেলিণ্ডা জারভিস তেমনি মৃদু গলায় বলল, রয় যদি তোর এই কষ্টের যোগ্য হয় তাহলে মানুষ হয়ে দু'তিন বছরের মধ্যে ঠিক ফিরে আসবে—না যদি আসে ভাববি যোগ্য নয়—যোগ্য না হলে কষ্টের কি আছে?

এবারে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।—কিন্তু তাকে লণ্ডনে যেতে হচ্ছে কেন?

এবারে গলার স্বর হঠাৎ কঠিন একটু। জবাব দিল, তার সেখানেই যাওয়া দরকার বুঝেছি বলে।

আমি চুপ একেবারে।

পরদিন মেলিণ্ডা জারভিস স্কুলে এসেছে টের পেয়েই এক অসম সাহসিক কাজ করলাম। টিফিন টাইমের পর স্কুল থেকে পালালাম। এর পরেই মেলিণ্ডা জারভিসের ক্লাস। তার ক্লাস আমি কোনদিন কামাই করেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু এখন ভেতরটা বেপরোয়া।

এক মেয়েকে জানিয়ে গেলাম শরীর খারাপ লাগছে, বোর্ডিংএ চলে যাচ্ছি।

বেরিয়ে সোজা মেলিণ্ডার কোয়ারটার্সএ। রয় বোধহয় আমাকে জানলা দিয়ে আসতে দেখেছে। সে-ই এসে বাইরের দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকে হীরা বা তার মেয়ে রুক্মিণীকে দেখলাম না। আরো একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। রয়ের দিকে চেয়ে দেখি, তারও শুকনো পাংশু মূর্তি, চুল উস্কোখুস্কো, চোখের কোলে কালি।

সোজা তাকালাম।—কি হয়েছে?

—ওপরে চলো, বলছি।

স্কুল পালিয়ে এসেছি। রুক্মিণী থাকলে ধরা পড়ব জেনেও পরোয়া করিনি। তখন বলতাম, রয় কেন লণ্ডনে পড়তে যাচ্ছে জানার জন্য শরীর খারাপ সত্ত্বেও এসেছিলাম। কিন্তু রুক্মিণীকে দেখছি না যখন, তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা জেনে হস্টেলে ফেরাই ভালো। কারণ ক্লাস শেষ হলে মেলিণ্ডা জারভিস কোনো মেয়েকে বা টিচারকে কি শরীর খারাপ জানার জন্য হস্টেলে পাঠাতে পারে। বললাম, আমি তোমার আন্টির ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি, কি হয়েছে এখানেই বলো।

রয় বলল, রুক্মিণী তিন দিন হল আসছে না—তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, এসো।

কাঁধ ধরেই আমাকে দোতলায় নিয়ে এলো। সামনের বড় ঘরে ঢুকে দাঁড়ালো। তারপরেই রয়ের দু'চোখে লোভের আঁচ দেখলাম একটু। জিগ্যেস করল, এ ঘরে বসবে, না ওঘরে যাবে?

পুরুষগুলোর এমনি চরিত্র বটে। বিশেষ কিছু না ঘটলে এই চেহারা হয় না, তার মধ্যেও লোভ! আমি ধমকের সুরে বললাম, না—এ ঘরেই! কেন সময় নষ্ট করছ?

বসলাম। একেবারে কাছ ঘেঁষে সোফা টেনে সে-ও। আগের ভাগে জিগ্যেস করল, আন্টি শালজুড়িতে গেছল, তার সঙ্গে সেখানে তোমার দেখা হয়েছে?

-হয়েছে। ফেরার সময় কাল এক বাসে পাশাপাশি বসে এসেছি।

—তুমি কি শুনেছ ?

—তুমি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছ পড়তে ?

—হঁ্যা।

—কলকাতায় নয় কেন ?

—আন্টির হুকুম।

—হঠাৎ এ হুকুম কেন ?

—হয়তো ভেবেছে, ইংল্যাণ্ড থেকে ডিগ্রী নিয়ে এলে আরো সুবিধে হবে, নাম ডাক বেঁশি হবে।

এ-দিকটা আমার চিন্তায় আসেনি। কিন্তু একটু ভাবতেই বিশ্বাস-যোগ্য মনে হল না। তাই যদি হবে, মেলিণ্ডা জারভিসের এমন মুখ কেন? গ্র্যাণ্ডি অমন হেঁয়ালি ভরে কথা বলল কেন? বাসেও মেলিণ্ডা জারভিসের এমন কথা কেন? সব থেকে বেশি, রয়ের এমন পাংশু বিবর্ণ মূর্তি কেন ?

সোজা চোখে চোখ রাখলাম।—সত্যি কথা বলো। আমি একটুও বিশ্বাস করছি না। এ-রকম হলে তোমার আমার দুজনেরই আনন্দের কারণ হত। কি হয়েছে, সেদিনের ব্যাপারটা মেলিণ্ডা জারভিস বুঝতে পেরেছে ?

জবাবে রয় আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক। মনে হল সে ভাবছে কিছু। তারপর আস্তে আস্তে বলল, মনে হয় কিছু বুঝতে পেরেছে।

নিজের বুকের তলার ধপধপানি শুনতে পাচ্ছি যেন। শ্বাস রুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত।—কি করে বুঝতে পেরেছে ?

—রুখ্‌মিণী বলে থাকবে। তাকে হয়তো আন্টি জেরা করেছিল। আমিও তো সেই থেকে এ-কথাই ভাবছি···।

···আমি মনে মনে ভেবে নিলাম একটু। সেদিন আমারও মনে হয়েছিল রুক্মিণী সব জেনেছে, বুঝেছে।···ভেবেছিলাম, হয়তো

দোতলায় উঠে বন্ধ দরজার পর্দা সরিয়ে কাচের জানলা দিয়ে দেখে গেছে, আমরা দু'জনের কেউ এ-ঘরে নেই। মেলিণ্ডা জারভিসের জেরায় পড়লে তার সাধ্য কি, কিছু গোপন করতে পারবে।

—রুক্মিণী কোথায়?

—বললাম তো তিন দিন ধরে আসছে না, ভীষণ হাঁপানি নিয়ে তার মা-ই এসে কাজ করে যাচ্ছে।

এবারে নিঃসংশয় হলাম মেলিণ্ডা জারভিস সব জেনেছে, সব বুঝেছে।

রয় বা আমি ফাঁক মতো জেরা করব এই আশংকাতেই নিশ্চয় এই তুখোড় বুদ্ধিমতী মহিলা তিন দিন ধরে রুক্মিণীর আসা বন্ধ করেছে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় আসছে না, মেলিণ্ডা জারভিস তবু আমার ওপর এত সদয় কেন, কেন সব দোষ রয়ের একলার ঘাড়ে চাপাচ্ছে! কেন ভাবছে না, অমন দুর্যোগের দিনেও রয় নয়—আমিই কেন এ-বাড়িতে চলে এসেছিলাম

অনেকক্ষণ চুপ করে ভেবেও এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলাম না। রয়ের দিকে তাকালাম।—তাহলে?

রয়ের চোখে মুখে হঠাৎ দুরন্ত আক্রোশ। উঠে দাঁড়ালো—তাহলে ও-ঘরে চলো। ধরা যখন পড়েইছি, একবারের যা দোষ, দু'বারেরও তাই। প্লীজ!

—রয়! আমি ধমকে উঠলাম।—ছেলেমানুষি কোরো না! আগে বলো, তোমাকে এখান থেকে সরালেই সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে গেল কিনা—তুমি কি করবে? তুমি ভেবেছ কিছু?

আবারও বেশ চুপসে গিয়ে রয় জবাব দিল, আপাতত আমাকে তো ইংল্যাণ্ড যেতেই হবে।

—তারপর?

—তারপর বড় জোর দু'বছর কি তিন বছর। ডাক্তারির বড় ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসার পর আর আমাদের রুখবে কে? আমার জেদ তো তুমি জানো, মেডিক্যাল ফাইন্যালে ভালো রেজাল্ট করে এক বছর

বাদে কালিম্পং ফিরেছিলাম ভোলোনি নিশ্চয় ?

আমি স্থির খানিকক্ষণ।—রয়, আমি ঠিক এই কথাই তোমার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম। পৃথিবীতে কেউ আমাদের রুখতে পারবে না। আমি খুব খুশি মনে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি মাঝে মাঝে আমাকে শালজুড়ির ঠিকানায় চিঠি দেবে। লণ্ডনে গিয়ে একটা দিনের জন্যও তোমার প্রতিজ্ঞা ভুললে চলবে না—মনে থাকবে ?

রয় পুরুষ মানুষের মতোই মাথা নাড়ল। মনে থাকবে।

…কিন্তু ভাগ্যের হাতে আমি পর পর এত বড় মার খেতে পারি কল্পনার মধ্যেও ছিল না। অনেক অনেক বছর বাদে সেই মার আবার ফিরে এসেছে। মনে হলে সমস্ত অঙ্গ এখনো জ্বলে যাচ্ছে।

মারের কথা মনে হতে চমকে উঠলাম।…বিলি ? বিলি কি করছে ? আমার মারে ভেতর কেটেই চলেছে। কিন্তু বিলির কচি দেহের বাইরের চামড়া অমন কেটে গেল, ফেটে গেল, তবু ওর ভিতরের সেই কীটটা কি ধ্বংস হয়েছে ? বিলি, ওরে বিলি—আমি তোকে মারিনি, তোকে কি আমি মারতে পারি ? তুই জানিস না তোর ভেতরে কি সর্বনেশে জিনিস ঢুকে গেছে যার সঙ্গে আমার সব থেকে বড় যুদ্ধ এখন—মরন বাঁচনের যুদ্ধ।

বসার ঘরের দেয়াল ঘড়িতে টং টং করে তিনটে মাত্র শব্দ হল।

মাত্র তিনটে এতক্ষণে? এখনো দেড় ঘণ্টা বাকি বিলির ফিরতে?… আচ্ছা, ডিকির ওই শখের চাবুকটাতে কি ধুলো বালি লেগেছিল ? নিশ্চয় ছিল। বিলির যদি সেপটিক হয়ে যায় ? রাতে যদি চার পাঁচ জ্বর আসে? জ্বর তো আসবেই, ওই কচি শরীরে…কিন্তু আমি কি করব, রাতে ওর বেশি বাড়াবাড়ি রকমের কিছু হলে আমি কি করব ?

…কিন্তু আমি তো গ্র্যাণ্ডির দেখানো রাস্তা ধরে চলেছি। গ্র্যাণ্ডির পথে চলেছি। সে পথ ধরে এগোলে মায়ের কোলের শিশুর কখনো ক্ষতি হতে পারে ?

প্যারে পারে পারে ?

॥ পাঁচ ॥

সমস্ত কৃতিত্ব গ্র্যাণ্ডি আমাকে দেয়, সেই রাস্তা সেই পথ বিবেকের সিংহ তোরণের হদিস তাকে নাকি আমিই দিয়েছি। তার সেই মাস্টার-পীস এর সে নাম দিয়েছে, 'দি গেট অফ কনসেন্স'—এর ঠিক যুৎসই আর মনে সাড়া জাগানোর মতো বাংলা আমি আজও হাতড়ে বেড়াচ্ছি।

ব্যাপার আর কিছুই না, রবি ঠাকুরের শিশুতীর্থ দীর্ঘ কবিতার সার বুঝিয়ে বুঝিয়ে গ্র্যাণ্ডিকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। তারপর থেকে এক জ্বালাতন শুরু হয়েছিল। কাছে পেলেই ঐ লাইন ধরে ধরে তার কাছে শিশুতীর্থ পড়তে হবে—মুখে মুখে ইংরেজি করতে হবে। অবশ্য বক্তব্য বুঝলে গ্র্যাণ্ডি নিজেই ইংরেজি করে নেবার ব্যাপারে আমার থেকে ঢের বেশি এক্সপার্ট। আমার কাছ থেকে বাংলা মর্ম বুঝে বুঝে সে নিজেই লাইন ধরে ধরে ইংরেজি তর্জমা করে যাচ্ছে। শেষ হতে গ্র্যাণ্ডি তার মাস্টার পীস নিয়ে এসেছে। ছ'মাস ধরে নিবিষ্ট মনে এঁকে গেছে। গোড়ায় আমি কিছু ধরতেই পারিনি। কিন্তু হল-ঘর সমান বিশাল ক্যানভাসে নানা রঙে ছবিটা যখন শেষ হল আনন্দে উত্তেজনায় আমি থর থর করে কেঁপেছি। তারপর থেকে একটা অদ্ভুত সঙ্কল্প আমার ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কখনো সেটা ধরতে পারি। কখনো পারি না।

ছবিটার আভাস দেওয়া সম্ভব কিনা জানি না।—কাতারে কাতারে অদ্ভুত কতগুলো জীব, কিছুটা মানুষের মতো, অনেকটা বা জানোয়ারের মতো, অনেক দূরের একটা জ্যোতির তোরণের দিকে চলেছে। ওখানে কি আছে কেউ জানে না, কিন্তু প্রত্যেকেরই বড় কিছু পাওয়ার উদগ্র আশা যেন। মানুষের মতো সেই জানোয়ারগুলোর নাম লোভ হিংসা রাগ বিদ্বেষ লালসা কপটতা ক্রূরতা হীনতা নীচতা কাম কাঞ্চন মোহ মায়া—এ রকম ছোট বড় অজস্র জীবের মিছিল।

তারা হানাহানি করছে, খাওয়া খাওয়ি করেছে, প্রবৃত্তির আগুন জ্বালছে —আবার কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে ওই তোরণের দিকে—ওই গেট্ অফ কনসান্স-এর দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু যতো এগোচ্ছে, তাদের প্রবৃত্তির মুখোসগুলো যে ফিকে ফিকে হয়ে যাচ্ছে, খসে খসে যাচ্ছে—আর ততো তারা মানুষের আকার নিচ্ছে। শেষে সেই তোরণের সামনে এলো যখন, সকলে তখন সম্পূর্ণ মানুষ—তাদের চোখে মুখে অনির্বচনীয় বিস্ময় আর আনন্দের ছটা। মেয়ে আর পুরুষ, বুড়ো আর বুড়ী, যুবক আর যুবতী, কিশোর আর কিশোরী, বালক আর বালিকা। তোরণের ওধারের জ্যোতির ছটায় তারা সকলে মানুষ। তোরণের ওধারে সারি সারি কুটীর। অদূরে নদী বইছে। বাতাসে গাছ পালা দুলছে। বড় সাধারণ কুটীরগুলো কিন্তু অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন সুন্দর। তোরণ পার হয়ে সকলে মাথা নত করে প্রথম কুটীরের দিকে এগোলো। তারপর মাথা নত করল।

…দাওয়ায় এক মা বসে আছে। উষার কোলে শুকতারার মতো সেই মায়ের কোলে একটি নিষ্পাপ শিশু। সকলের নিঃশব্দ বন্দনায় সেই শিশু খিলখিল হাসছে।

সেই ছবি গ্র্যাণ্ডি আমাকে উপহার দিয়েছিল। কিন্তু আমি আনিনি। এনে কোথায় রাখব? সেই থেকে ওর স্টুডিও ঘরের সমস্ত দেয়াল জুড়ে টাঙানো আছে। আমার ইচ্ছে, সমস্ত শালজুড়ির মানুষ ওটা দেখুক, সমস্ত বাংলার মানুষ সমস্ত ভারতের মানুষ ওটা দেখুক—এসে এসে দেখে যাক—কিছু অনুভব করে যাক।

ছবির কথা পরে।

…পরের কটা বছরে আমার জীবনে ছোটোবড় অনেক বিপর্যয় ঘটে গেছে।

তিন তিনটে বছরে রয় জারভিসের জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষায় কাটিয়েছি। সে আসেনি। প্রথমে গিয়েই একখানা চিঠি দিয়েছিল, তাতে অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রতিজ্ঞার কথা ছিল। মাস চার পাঁচ বাদে আর একখানা। তাতে উচ্ছ্বাস কম। তার পরে আমি অনেকগুলো চিঠি

লেখা সত্ত্বেও আর জবাব পাইনি।

মনের আশার আর ক্ষোভের কথা কেবল গ্র্যাণ্ডিকে জানিয়েছি। সে নির্বিকার মুখে বলেছে, ও-দিক থেকে চিঠি লেখা বন্ধ হবে জানা কথাই।

কথাগুলো আমার একটুও ভালো লাগেনি। বিশ্বাস তো হয়ইনি। পাশ করে বেরুতে দেরি হয়েও যেতে পারে। হয়তো বড় হবার তাড়নায় কোনো হাসপাতালে কাজ নিয়েছে, দিন রাত খাটছে। চিঠি লেখার সময় পাচ্ছে না।

কিন্তু আরো একটা বছর ঘুরতে চলল। আমার ভিতরের সব রঙ ফিকে হয়ে যাচ্ছে, সব স্বপ্ন ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে।

...মেলিণ্ডা জারভিসের ওপর আমার রাগ দিনে দিনে বেড়েছে। রয় চলে যাওয়ার পর থেকেই তার সঙ্গে ঠাণ্ডা বিরোধ শুরু। আমি অবাধ্য হয়েছি। ডাকা সত্ত্বেও আর কোনদিন তার কাছে পড়তে যাইনি। যে ব্যবহার করেছি, ইচ্ছে করলে সে আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারত। দিলেও স্কুলের অভাব নেই বলে পরোয়া করিনি। আমি জানি সমস্ত কলকাঠি সে-ই ঘুরিয়েছে। আমার ওপর দয়া দেখাচ্চে। আসলে নিজের আদরের ভাই-পোকে আমার আওতা থেকে দূরে সরিয়েছে। মনে মনে আমার মতো মেয়েকে মেলিণ্ডা জারভিস নিশ্চয় ঘৃণা করে। রয়ের চিঠি যে পাইনা এর মধ্যেও ওই মহিলার হাত আছে বলেই ধারণা। গ্র্যাণ্ডির কথার সাদা অর্থও তাই ভেবেছি।

আগেই চাকরি থেকে অবসর নিয়ে মেলিণ্ডা জারভিস শালজুড়িতে এসে আমার দিদিমার নামে বাচ্চাদের আগনেস কটেজ স্কুল করে নিজের মহিমা বিস্তার করেছে আর সকলের বাহবা কুড়িয়েছে। আমাকেও স্কুলের কাজে ডেকেছিল, কিন্তু আমি ঘৃণায় দূরে ছিটকে গেছি। কলকাতায় থেকে ভালো অনার্স পেয়ে বি. এ. পাশ করেছি। আর তারপর মায়ের মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য আটকে গেছি।

শেষে কি অবস্থায় পড়ে, গ্র্যাণ্ড জেরির কি কথার পরে আর

মেলিণ্ডা জারভিসের অনুরোধে পড়ে স্কুলের ছেলেমেয়েদের ড্রইং শেখানোর ভার নিয়েছিলাম আগেই বলেছি। বলেছি, কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমিই কোথাও ভুল করে বেড়াচ্ছি। সে-সময়ে আমার বয়েস তেইশ পার হতে চলেছে। পাঁচ বছরের মধ্যে রয়ের আর কোনো খবর নেই।

মায়ের বিকৃতি বেড়েই চলেছিল। রাগ হলে মদ খাবে, আনন্দ হলে মদ খাবে। আমার জন্য একটা ভালো ছেলে আবিষ্কার করতে পারলে মদ খাবে, আর আমি তাকে বাতিল করলেও মনের দুঃখে মদ খাবে। শেষে এমন দাঁড়ালো মা-কে নিয়ে আমি আর বাবা কাউকে মুখ দেখাতে পারি না। মা মদ খেয়ে রাস্তায় বেরোয়, হল্লা করে, গান করে, আমাকে আর বাবাকে গাল মন্দ করে। আবার শিগগীরই সে বিছানা নেবে বুঝতে পারছি। এবার পড়লে আর উঠবে না বোধ হয়।

চব্বিশ বছর বয়সে আমার জীবনে আর একটি পুরুষ এসেছে। সে ডিকি ডেটন। খুব আকস্মিক ভাবেই এসেছে। আটচল্লিশ সালের নভেম্বর মাস। ঠিক একবছর তিন মাস আগে ভারত স্বাধীন হয়েছে। এই শালজুড়ির জঙ্গলে বা চা বাগানে স্বাধীনতার তেমন বড় ঢেউ কিছু লাগেনি। কিন্তু চা বাগান ছেড়ে কিছু ইংরেজ দেশে চলে গেছে। কারণ এ-রকম একটা রটনা অথবা সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল, স্বাধীনতা পাবার পর ভারতীয়রা আর ইংরেজদের আদৌ বরদাস্ত করবে না। কারো ওপর কোনো বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা হবে না, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর এই ঘোষণা সত্ত্বেও কারো আস্থার অভাব ঘটেছিল। বিশেষ করে চা বাগানের যে ইংরেজ কর্মচারীরা নেটিভদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি, অনেক সময় অত্যাচারও করেছে, তারাই ছায়া-ভয়ে আগে সরেছে। তাছাড়া দুই এক বছরের মধ্যে যারা যাবে যাবে করছিল তারাও এ-সময়েই সরে গেছে। এই স্বাধীনতার আমি কিন্তু নিজেকে অংশীদার ভেবেছি। স্বাধীনতার দিন আমার দারুণ আনন্দ হয়েছিল। আর মায়ের তেমনি রাগ হয়েছিল। মোট কথা সে-সময়ে সাদা চামড়ার নতুন মুখ আর দেখা যেত না।

কিন্তু যে নতুন মুখখানা দেখলাম সে খাঁটি ইংরেজ না হলেও এ-দেশের সাদা চামড়ার একজন মনে হয়েছিল। ইংরেজের মতো লালচে রং নয়,ধপধপে সাদা। সামান্য লালচে চুল, আর চোখও তেমন কালো নয়। লম্বা দোহারা চেহারা।

নাম ডিকি ডেটন। আমার থেকে বছর দুই আড়াই বড় হতে পারে। আবার সমান বয়সীও হতে পারে। কাঁচা মুখের বয়েস বোঝা শক্ত।

যাক এই অতি সাধারণ একজনের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়, ছিলও না। আগ্রহের কারণ পরে বলছি। সেদিন রাতে ড্রইংরুমে বাবা আর আংকল ডাকুয়া চা-বাগানের নতুন এক আমদানির কথা বলে হাসছিল। মা মদে আধা বে-হুঁস, মনোহর ডাকুয়া গেলাস নিয়ে তাকে সঙ্গ দিচ্ছে—বাবা তখন মদ ছেড়েই দিয়েছে। আসলে মায়ের মন অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা। আংকল্ ডাকুয়া বলল, লোকটার মাথায় বোধহয় একটু ছিট আছে, নইলে ক্লাবের সকলকে ছেড়ে বাইরের দাওয়ায় একলা বাঁশি বাজাতে শুরু করে দেয়! সকলে ছোটাছুটি করে দেখতে এলো তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

কোন লোকের কথা হচ্ছে আমার মাথাতেই ঢোকেনি। বা জানার কৌতূহলও বোধ করিনি।

বাবা মন্তব্য করল, লোকটা বাজাচ্ছিল কিন্তু ভারী মিষ্টি, সাম ইণ্ডিয়ান মিউজিক পারহ্যাপস।

ও-দিক থেকে মা টেনে টেনে বলে উঠল, ব্লাডি ইণ্ডিয়ান মিউজিক —আই ডোণ্ট ল'ইক্!

ঠিক এই সময় সকলেই আমরা সচকিত একটু। বিশেষ করে মা ছাড়া আমরা বাকি তিনজন। রাতের এ-সময় একমাত্র ক্লাব ছাড়া শালজুড়ির সর্বত্র স্তব্ধ নির্জন। হঠাৎ মনে হল জঙ্গলের দিক থেকে কে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। বাঁশির এ-রকম অচেনা মিষ্টি সুর আমি কখনো শুনিনি। তিন জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

আমি উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মনে হল শালজুড়ির জঙ্গলের ভিতর থেকে বাইরের দিকে আসছে সুরটা। ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল। কেমন অস্বস্তি বোধ করছি, তাড়াতাড়ি ঘরে এসে বললাম, তোমাদের সেই লোকটাই বোধহয়, জঙ্গলের ভিতর থেকে বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে—

মনোহর ডাকুয়া মন্তব্য করল, ডিকি ডেটন ছাড়া আর কে! জঙ্গলের জানোয়ারের হাতেই বেঘোরে মারা পড়বে দেখছি!

মা বলে উঠল, রাবিশ! তার যেন নেশায় বিঘ্ন ঘটছে।

বাবা তক্ষুনি মন্তব্য করল, এ তো ইংলিশ মিউজিক—তোমার ভালো লাগছে না?

সঙ্গে সঙ্গে মা ঠাণ্ডা একটু। টেনে টেনে বলল, লে-ম্মি লিসন··· সু-ড্ বি গুড!

আমি বললাম, নতুন এসেছে, এ-ভাবে রাতে জঙ্গলে ঢুকতে বারণ করে দাওনি—এখন ঠাণ্ডা পড়ছে, সাপে না কাটলেও সত্যি তো কত রকমের বিপদ হতে পারে!

মনোহর ডাকুয়া বলল কি পাগল বলোতো!

বাঁশির সুর যেন এদিকেই আসছে। ইংলিশ মিউজিক তো নয়ই—কিন্তু শুনতে অদ্ভুত করুণ অথচ মিষ্টি লাগছে। কেউ যেন খুব অসহায় বিপন্ন, সেই বিপদ থেকে তাকে টেনে তোলার আকুতি আর আবেদনের মতো লাগছে। সুরটা কাছে থেকে আরো কাছে আসছে, আমি আবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে।···বাড়ির সামনের রাস্তা ধরেই বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে। বাইরে জমাট অন্ধকার। মানুষটাকে দেখতে পেলাম না। আমি বারান্দার আলোয় দাঁড়িয়ে। সে আমাকে দেখেছে কিনা জানি না।

ভিতরে এলাম। সুরটা তখনো শোনা যাচ্ছে। ভিতরে এসে আংকল ডাকুয়াকে জিগ্যেস করলাম, এই পাগলাটে লোকটা চা-বাগানের কাজে নতুন লেগেছে?

—হ্যাঁ, সামান্য জুনিয়র অফিসারের পোস্ট, এখন অনেকে চলে

গেছে বলে আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে সহজে চাকরি পেয়েছে। কিন্তু বাঁশি-বাজিয়ে চাকরি কত করবে বুঝতেই পারছি। ক্লাবেই থাকে কিন্তু কারো সঙ্গে মেশে না।

আমার এমন অদ্ভুত মিষ্টি লেগেছে সুরটা, কানে তার আকুতি যেন লেগে আছে। ভিতরে ভিতরে কি লোকটা সত্যি খুব অসহায় নাকি রে বাবা! অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এমন মিষ্টি ইণ্ডিয়ান সুর বাজায় যখন, নিশ্চয় জন্ম থেকে এ-দেশেই আছে।

পরদিনটা রবিবার। সেই দিনই অভাবিত যোগাযোগ ডিকি ডেটনের সঙ্গে। শীতের এই ছুটির দুপুরগুলিতে বেড়াতে আমার বরাবরই দারুণ ভালো লাগে। মা-কে দেখার জন্য বাড়িতে বাবা আছে। বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার বেড়ানো তো কালজানি নদী, জঙ্গল আর পাহাড়ী ঝরণার দিকে।

নদীর পাশ ছেড়ে জঙ্গল আর ঝরণার দিকে এগিয়েছি, হঠাৎ দু'পা থেমে গেল। ঝরণার দিকে সেই বাঁশির সুর! এই দুপুরেও বাঁশি। কিন্তু সুরটা বড় অদ্ভুত তো! উঠছে নামছে—যেন থেকে থেকে ডাকছে কাউকে।

পায়ে পায়ে এগোলাম।

খানিক দূর থেকে তাকে দেখেই আবার থেমে যেতে হল। কি আশ্চর্য! এই লোক! একে তো আমি ক'দিন স্কুলের সামনে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছি! লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, একদিকে সামান্য ঝুঁকে-ঝুঁকে চলে। হয়তো ডান পায়ে খুঁত আছে একটু। স্কুল ছুটির পরেও এক-আধদিন দেখি। নতুন মুখ বটে। কিন্তু লোকটার এ-রকম ঘুরঘুর করার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝতে পারি মনে হয়েছে। শালজুড়ির অমন কত ছেলে কত সময় ঘুর ঘুর করে ঠিক নেই, আর মীনামাসি এ নিয়ে আমাকে কম ঠাট্টাও করে না। আবার কখনো বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলে, যাকে মন সঁপে দিয়ে বসে আছিস সে-তো বেপাত্তা, দেখে শুনে আর কাউকে বেছে নে না! কত ভালো ভালো ছেলে তো তোর জন্যে বুক চাপড়ে শেষ হয়ে গেল!

শুনে কখনো হাসি, কখনো বিরক্ত হই।...এ-ও সেই বুক-চাপড়ানো দলের একজন ধরে নিয়েছিলাম। স্কুলে যাতায়াতের পথে আমি আমার ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য, নিয়ে চলি। এ-ও একদিন সুবিধে না পেয়ে আপনা থেকেই সরে পড়বে। এদের নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

কিন্তু এই লোকই ডিকি ডেটন—বাবা আর মনোহর ডাকুয়া যাকে পাগলাটে বলে। ঝরণার ধারে সেই বড় পাথরটায় বসে বাজাচ্ছে।

এগিয়ে চললাম। দশ গজের মধ্যে আমাদের দেখেই সে বাজানো থামিয়ে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো। বাঁশিসুদ্ধু দু'হাত জুড়ে ভারতীয় প্রথায় মাথা নুইয়ে স্পষ্ট বাংলায় বলল, নমস্কার।

আমি সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। প্রতিনমস্কার ভুলে চেয়ে আছি। লোকটা তেমনি শশব্যস্তে পকেট থেকে রুমাল বার করে সশব্দে পাথরটা দু'চার বার ঝেড়ে তেমনি পরিষ্কার বাংলায় আবার সবিনয়ে বলল, এসেছ যখন, অনুগ্রহ করে বোসো—

ইংরেজিতে 'ইউ' বললেই হয়, কিন্তু বাংলায় আপনি তুমির প্রভেদ আছে। এই লোক এটা জানে কিনা বুঝলাম না। আমিও তুমি করেই কথা শুরু করলাম। বিস্ময়ের ভাবটুকু কাটানোর চেষ্টা।—তুমি ডিকি ডেটন?

—হ্যাঁ। ভারী খুশি। আমার নামটা জানো দেখছি। তুমি শীলা স্মিথ আমি অবশ্য আগেই জানি।

আমি গম্ভীর।—তুমি চা-বাগানে চাকরি করো?

সে মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, সামান্য চাকরি, তাই পেয়েই বর্তে গেছি।

—তোমার ডিউটি আওয়ার্স্ কখন?

অবাক একটু।—কেন, ন'টা-চারটে...।

—তাহলে তুমি বেলা একটার সময়ে আগনেস কটেজের সামনে ঘোরাঘুরি করো কি করে?

একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো হাসল।—সাড়ে বারোটা থেকে

দেড়টা আমাদের লাঞ্চ টাইম—সেই ফাঁকে ঘুরে আসি। কাঁচু মাঁচু মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি।

আমি হাসব না রাগ দেখাবো? এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, যেন ঘোর লাগা স্বপ্নালু চোখ দুটো। জিগ্যেস করলাম, তুমি এ-রকম বাংলা জানো কি করে?

—আমি বাংলা ইংরেজি হিন্দী পাঞ্জাবী সব ভাষাই তর-তর করে বলতে কইতে পারি। আমার ছেলেবেলায় বহুদিন ক্যালকাটায় কেটেছে, তারপর তামাম ভারত চষেছি। আবার লাজুক হাসি।—তুমি বাংলা খুব ভালো বাসো আর বাঙালীর মতোই বাংলা বলতে কইতে পারো শুনে প্রথমেই বাংলা বললাম···

—কোথা থেকে শুনে?

—তোমাকে আমার চোখে দেখেই খুব ভালো লেগেছে জেনে ক্লাবে আমার বয়সি ছেলেরা তোমার সম্পর্কে কত কথা বলে, তাদের কাছেই শুনেছি···আর আজ সকালে গ্র্যাণ্ড জেরির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল—সে দেখলাম তোমাকে দারুণ ভালোবাসে—তার কাছেও শুনলাম—

এই বয়সের কোনো লোক সত্যি এত সরল হতে পারে বিশ্বাস করা শক্ত।—ক্লাবের ছেলেদের কাছে কি শুনেছ?

মুখে আবার সলাজ হাসি। বলল, ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা ঠাট্টা করে। বলে এখানকার একখানা পাথর ভজনা করলে বরং সাড়া পাবে—ওই মেয়ের কাছ থেকে কোনো সাড়াই পাবে না। ওরা বোঝে না, আমার ভালো লাগা দিয়ে কথা, তুমি উটকো একজনকে সাড়া দিতে যাবেই বা কেন!—কাল রাতে আমার বাঁশি শুনে তুমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলে আমার দারুণ আনন্দ হয়েছিল। তুমি দেখতে পাওনি, আমি অন্ধকারে ছিলাম বলে তোমাকে দেখেছি।

—বাঁশি বাজিয়ে তুমি জঙ্গল থেকে বেরুচ্ছিলে?

—হ্যাঁ।

—ওই জঙ্গলে কত রকমের হিংস্র জানোয়ার আছে জানো?

সচকিত একটু।—তা তো কেউ বলেনি। তারপরই নিশ্চিন্ত

হাসি।—তা থাকলেই বা, আমি তো বেহাল। বাজাচ্ছিলাম, ঠিক মতো বাজাতে পারলে ওটা জানোয়ারেরও মন ছুঁয়ে যায়।

এমন অদ্ভুত কথা কি জীবনে শুনেছি। লোকটার আবার অনুনয়, এসেছ যখন একটু বোসো না—

—এই পাথরে বসলেই আমার মনোহর ডাকুয়ার বিকৃত মুখ মনে পড়ে। বসলাম। ওকে বললাম, তুমিও বোসো—

ও কৃতার্থ হয়ে যথেষ্ট ফারাক রেখে পাথরটার অন্য ধারে বসল। জিগ্যেস করলাম, বেহাগ সুরটা কি ব্যাপার?

—ওটা একটা ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকাল সুর।···কিন্তু কি ব্যাপার কি করে বোঝাব।···ধরো, কেউ মাঝ নদীতে পড়ে গেছে, তার তখন আকুতি কি হবে? কেউ এসো, আমার হাত ধরো, হাত ধরে আমাকে পার করো—তাই না?

ক'টা মুহূর্তের মধ্যে এ-রকম কি হয়—কাউকে ভালো লেগে যেতে পারে? মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবার জিগ্যেস করলাম, তারপর ওই সুর কোন্ পর্যন্ত যায়···কেউ এসে হাত ধরে?

প্রশ্ন শুনে ভারী খুশি। মাথা নাড়ল। বলল, বেহাগের অবশ্য এটাই শর্ত, একজনকে আসতে হবে, হাত ধরতে হবে।

তারপর এমন ভাবে চেয়ে রইল যেন আমিই তার হাত ধরার একজন। কানের কাছটা সামান্য গরম। জিগ্যেস করলাম, আর আজ কি বাজাচ্ছিলে?

—এটা একটা ইণ্ডিয়ান গ্রাম্য সুর, ভাটিয়ালি। এতে অনেক মজার কথা থাকে—ফোক মিউজিক জানো তো?

—কি রকম?

—যেমন ধরো যেটা বাজাচ্ছিলাম, পুরুষ তার প্রেমিকাকে বলছে, সকাল গেল দুপুর পেরুলো, কাজের ঠমক দেখিয়ে দূরে সরে সরে আছ—এবার তো রাত আসছে—এখন যদি আমি মুখ ফিরিয়ে থাকি? কিন্তু তা পারব না জানো বলেই তোমার এত দেমাক।

হেসে ফেললাম। আর এটুকুই' যেন ডিকির মস্ত পাওয়ার মতো।

—এর আগে তুমি কোথায় থাকতে, কোথায় কাজ করতে ?

—কত জায়গায় থেকেছি কত রকমের কাজ করেছি, আমি যাকে বলে একটা ছন্নছাড়া মানুষ—কেউ কোথাও নেই। এই বাঁশির জ্বালায় কোনো কাজে টিকে থাকতে পারি না, ভালো না লাগলে বাঁশি নিয়ে পালাই। হাসছে।—কিন্তু এখান থেকে চট করে পালাতে পারব না বোধহয়…।

বুঝেও প্রশ্রয়ের সুরে জিগ্যেস করলাম, কেন পারবে না ?

বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ল একটু।—শুনলে তুমি যদি রেগে যাও ?

—কেন রাগব, তুমি কি রেগে যাবার মতো কিছু বলবে ?

—তা না…আসলে কি জানো, আমি কোথাও ভালো লাগার মতো কাউকে পাই না, তাই পালাই! এখানে এসে তোমাকে আমার ভালো লেগে গেছে…

বলেই সশঙ্ক চোখে তাকালো।

ভিতরে কি রকম নতুন স্বাদ পাচ্ছি। মজাও লাগছে। নিস্পৃহ মুখে বললাম, তোমাকেও আজ এই এক দিনেই আমার ভালো লেগে গেল—ভালো লাগতে দোষের কি…।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো। একটু এগিয়ে এলো।—সত্যি ? সত্যি বলছ ?

—খামোখা মিথ্যে বলতে যাব কেন ? বোসো—

এবারের বসাটা কাছে হল।

—আচ্ছা…বাঁশি বাজিয়ে তুমি আমার মায়ের মন ভালো করে দিতে পারো ? …মা ড্রিংক-অ্যাডিক্ট, এখন মাথার বেশ বিকৃতি দেখা দিয়েছে।

উৎসাহে উঠে দাঁড়ালো।—নিশ্চয় পারি! তোমার মায়ের কথাও আমি শুনেছি, এক্ষুণি চলো সে-রকম বাজাতে পারলে কারো মন ভালো না হয়ে পারে! না যদি পারি তো আমার বাজানোর দোষ—

—বোসো। আমি গম্ভীর।

একটু ঘাবড়ে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল।

—আমার মা ইণ্ডিয়ান মিউজিক শুনলে নাক সিঁটকোবে, তোমাকেও পাত্তা দেবে না—তাঁকে বলতে হবে ইংলিশ মিউজিক।

—তার কি দরকার আছে। আমি ইংলিশ মিউজিকই বাজাবো, তা ও কি কম জানি নাকি!

—বাজিয়ে শোনাও তো একটু।

শুরু করল। একটু বাদেই আমি থামিয়ে দিলাম।—ইণ্ডিয়ান মিউজিক শুনলে এ আর ভালো লাগে না। তুমি ইণ্ডিয়ান মিউজিকই বাজাবে, মা-কে যা বলবার আমি বলব। ধীরে সুস্থে আমি উঠলাম। —সামনের রোববার নাগাদ এসে শুনিয়ে যেও।

মুহূর্তে মাটিতে খুঁড়ে আছাড় খাওয়া মুখ —আজ রোববার··· আর সেই সামনের রোববার?

হাসি চাপা দায় প্রায়। সাদা মুখ করে বললাম, সামনের রোববার সুবিধে না হলে তার পরের রোববারে এসো···।

এবারে আর্তনাদের মতো শোনালো কথাগুলো। —আমি এতদিন তোমাকে না দেখে তোমার সঙ্গে কথা না বলে থাকব?

নিস্পৃহ জবাব দিলাম, কথা বলার কি আছে, এতদিন তো শুধু তোমার দেখেই ভালো লাগছিল···দেখা না দেখা তো তোমার মর্জি।

অভিমানাহত গলায় বলে উঠল, তুমি তাহলে আজ আমাকে এতটা প্রশ্রয় দিলে কেন?

এবারে আমার স্বভাবসুলভ গম্ভীর দু'চোখ তার মুখের ওপরে স্থির হল। —আজ এতটা প্রশ্রয় কি দিলাম?

মুখ কাঁচুমাচু তক্ষুণি। চোখ মাটির দিকে নামিয়ে বলল, এ-রকম বলা আমার খুব অন্যায় হয়েছে···আসলে এতটুকু সহানুভূতিও তো কারো কাছ থেকে কোনদিন পাইনি···।

হেসে ফেললাম। বললাম, আচ্ছা আজই এসো—

ডিকি ডেটন মায়ের কাছে এতটুকু পাত্তা পায়নি। কিন্তু ওর দিক থেকে মায়ের মন পাওয়ার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

ওকে নিয়ে যখন বাংলোয় উঠে এলাম তখন বাবাও বাড়িতে। সে ওকে দেখা মাত্র চিনল আর সঙ্গে করে নিয়ে আসতে দেখে অবাকও হল। কিন্তু বাংলোর বারান্দায় ওঠার ফাঁকেই আমি বাবাকে চোখের ইশারায় চুপ করে থাকতে বলেছি। সঙ্গে নতুন মানুষ দেখে মা ড্যাব-ড্যাব করে খানিক তার দিকে চেয়ে রইল। ডিকিকে আগে সমঝে দিই নি, তাই গোড়াতেই ও একটা ভুল করে ফেলল। প্রথমে মা পরে বাবার উদ্দেশে এদিশি ঢংএ দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো। বাবা প্রতিনমস্কার করল, কিন্তু মা দিশি সৌজন্যের ধার ধারে না। ডিকি পরনে ট্রাউজারস বা গায়ে টুইলের শার্ট—নেহাতই সাদামাটা বেশ বাস। মায়ের উৎসাহ বোধ করার কোনো কারণ নেই, উল্টে সন্দেহ তার নেশা ছাড়ানোর চেষ্টার জন্য নতুন কাউকে ধরে নিয়ে আসা হল কিনা। বার কয়েক শিলিগুড়ি থেকে মানসিক চিকিৎসক এনে এ-চেষ্টা আমরা করেছি। ডিকির হাতের বাঁশি তার প্যাণ্টের পকেটে গোঁজা, পকেটের ওপর দিয়ে পাঁচ ছ' আঙুল বেরিয়ে আছে। মায়ের চোখ ওটার দিকে পড়েছে কিনা জানি না, পড়লেও লোকটাকে ঠাওর করতে পারছে না বোঝা যায়।

মায়ের চোখে ডিকি ডেটনকে বিশিষ্ট এক জন করে তোলার চেষ্টা আমার। প্রথমে ডিকিকে বললাম, আমার মা, আমার বাবা। তারপর মায়ের দিকে ফিরে জিগ্যেস করলাম, ইনি কে আঁচ করো দেখি মা?

—আমি কি করে জানব, দেখলে তো ভ্যাগাবণ্ড মনে হয়। নির্লিপ্ত নিরুত্তাপ জবাব।

মায়ের সম্পর্কে ডিকিকে কিছু আভাস দেওয়াই ছিল, সে একটুও রাগ করল না বা অপ্রস্তুত হল না। মুখে কাঁচা হাসি, আমার দিকে চেয়ে বলল, দেখলে, মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ? ঠিক ধরেছেন। তারপর আবার মায়ের দিকে। —মাদার ওটাই আমার খাঁটি পরিচয়···একবার আমার মাথায় খেয়াল চেপেছিল পায়ে হেঁটে বাঁশি হাতে সমস্ত পৃথিবী ঘুরব—সেটা সম্ভব নয় বলে মনে মনে তাই ঘুরি।

আমার তবু ওকে বড় করে তোলার চেষ্টা। বললাম, তুমি চিনলেই না মা—ও যে মস্ত আর্টিস্ট একজন, বাঁশি বাজিয়ে বনের পশু বশ করতে পারে—ওর নাম ডিকি ডেটন।

সঙ্গে সঙ্গে আমার উচ্ছ্বাসে মা বাসন-মাজা জল ঢেলে দিল। চোখ গোল করে আর একবার ডিকির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে স্পষ্ট বিরক্তির সুরে বলল, মনোহর ডাকুয়া যে পাগলাটার কথা বলছিল·· রাতে বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়—সে? তা ওকে তুই ধরে এনেছিস কোন্ আক্কেলে-এখানে বনের পশুটা কে আছে যে বশ করবে!

ডিকি নিঃশব্দে হেসে চলেছে। ও যেন মজাই পাচ্ছে! বাবা বরং অপ্রস্তুত। আমার এখনো ডিকির মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা।—কি যে বলো মা ঠিক নেই—বাঁশী শোনার জন্য সমস্ত শালজুড়িতে ডিকিকে নিয়ে কাড়াকাড়ি এখন—আমরা একটু শুনব বলে ওকে বলে কয়ে ধরে আনলাম—মিস্টার ডেটন, তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোসো—আমার মা খুব ফ্র্যাংক, তুমি কিছু মনে করছ না তো?

ডিকি ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকালো, সে কিছুই মনে করছে না—কারণ মাদারকে তার দেখেই ভালো লেগে গেছে—আর সে-ও ফ্রাংক মানুষই পছন্দ করে। এখন মাদারের যদি তার বাঁশি পছন্দ হয় তবেই বাজানো সার্থক ভাববে।

মা-কে এভাবে তোয়াজের চেষ্টাটা আমি খুব সাদা চোখে দেখে অভ্যস্ত নই। কারণ মায়ের মন কেড়ে আমার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা দেখে-দেখে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আবার ডিকি ডেটনকে কে জানে কেন ওই গোছের ছেলেদের সগোত্রও ভাবতে ইচ্ছে করল না। মরুকগে, একে নিয়ে ভাবাভাবির কি আছে, জোর দিয়ে বলেছে বাঁশি বাজিয়ে মায়ের মন ফেরাতে পারে—সেটা কিছুটাও যদি সম্ভব হয় তাহলে বাবা মেয়ে দুজনেই একটু হাঁপ ফেলে বাঁচি।

কিন্তু বাঁশি শোনারও সময় আছে। শীলা দুপুরে যখন শুনেছে তখন জঙ্গল ঘেরা কালজানির একটা পরিবেশ ছিল। এখন এসে হুট করে এই বিকেলে বাজানো শুরু করলে মাই বিরক্ত হয়ে সবার আগে

উঠে চলে যাবে। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে শুরু করে মায়ের বোতলের তৃষ্ণা খানিকটা পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও লাভ। তাছাড়া লোক-টাকে বাড়িতে ডেকে এনেছে যখন একটু আপ্যায়নও করা উচিত। রঙিলাকে ডেকে চা-জলখাবার দিতে বললাম। প্রথম ইশারা থেকেই বাবা বুঝেছে আমার মাথায় বিশেষ কোনো মতলব আছে। তাই সে-ও সরে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে বসল। মায়ের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি বিরক্ত হচ্ছে। ডিকিকে বললাম, এই বাড়ি ঘর যা কিছু দেখছ সব মায়ের—আমি আর বাবা তার আশ্রিত বলতে পারো, তুমি যত বড় গুণীই হও মা-কে খুশি করতে না পারলে নিজে তো তার কাছে পাত্তা পাবেই না, সময় নষ্ট করার জন্য আমাদেরও কথা শুনতে হবে—ডেয়ার টু অ্যাকসেপ্ট দি চ্যালেঞ্জ ?

মায়ের সম্পর্কে ডিকিকে যেটুকু তৈরি করে এখানে নিয়ে এসেছি, তাতে তার বোঝা উচিত মায়ের মন ভেজানোর জন্যই এরকম বলছি। কিন্তু ও যে জবাব দিল সেটা তেমনি সরল বলেই শুনতে ভালো লাগল। হেসে বলল, মেয়ে হয়েও তুমি মাদারদের সাইকোলজি জানো না দেখছি—হেরে যাওয়া ছেলেকে মা রাগ করে বেশি শাসন করে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যোগ্য ছেলের থেকেও সে বেশি পাত্তা পায়—আই অ্যাম শিওর, আমাকে দু'পাঁচ দিন দেখলে মাদার আমার বাঁশি থেকে আমাকে বেশি পছন্দ করবেন। হাসতে লাগল।

কথাগুলো আমার মতো মেয়ের নিছক চাটুকারিতা ভাবার কথা। লাঞ্চ-টাইমে আর ছুটির পরে আমাকে দেখার জন্য স্কুলগেটের সামনে হাঁটাহাঁটি করে, আমাকে শোনাবার জন্যে রাতে নির্ভয়ে জঙ্গলের পাশ দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে যায়, এমনও হতে পারে ছুটির দিনে আমি কালজানির দিকে গিয়ে বসি এটা জেনে বা লক্ষ্য করেই আজ দুপুরে সেখানে গিয়ে বাজাচ্ছিল। আর এখনো হয়তো আমার দিকে লক্ষ্য রেখেই মা-কে এ-ভাবে খুশি করার চেষ্টা। কিন্তু বলার ধরনটা এমন সহজ আর সেই সঙ্গে মুখের হাসি এমনি কচি কাঁচা যে কিছুই উদ্দেশ্য-পূর্ণ মনে হয় না।

মায়ের মন কিন্তু একটুও ভেজেনি। ড্যাব ড্যাব করে ডিকিকে দেখছে। গম্ভীর প্রশ্ন ছুঁড়ল, তুমি চা-বাগানের অফিসার?

মাথা নেড়ে সায় দিলেই চুকে যেত। কারণ ওর চাকরির সম্পর্কে বাবাতে আর আংকল ডাকুয়াতে কি কথা হয়েছিল মায়ের মনেও নেই। জবাবে চোখ বড় বড় করে ডিকি রসিকতা করতে গেল, অফিসার! বড় কোম্পানির ঝাড়ুদার যদি অফিসার হয় তাহলে আমিও মস্ত অফিসার!

মায়ের মুখ একটুও প্রসন্ন নয়। চালচুলো নেই, বড় অফিসারও না— এমন এক ভ্যাগাবণ্ড-মার্কা ছেলেকে আদর করে বাড়ি নিয়ে আসাটা তার সংশয়ের কারণ হতেই পারে। আমার মতিগতির ওপর তার একটুও আস্থা নেই।

রঙিলা কি করছে দেখার নাম করে ঘরে এসে চট করে আংকল ডাকুয়াকে একটা ফোন করলাম। তাকে জানালাম, বাঁশি-অলা ডিকি ডেটন তার বাঁশির গুনে-মায়ের মন মেজাজ ভালো করে দিতে পারে জোর দিয়ে বলতে তাকে বাড়িতে ধরে আনা হয়েছে—কিন্তু মা তাকে সে-রকম পাত্তা দেবে বা সুযোগ দেবে মনে হয় না, তাই আংকল যেন চট করে আমাদের বাংলোয় চলে আসে, আর তারপর ডিকি ডেটনকে এখানে দেখে, বেশ অবাক হয় আর খুশির ভাব দেখায়—মোট কথা মায়ের যেন মনে হয় একজন বড় গুণীকে বাড়িতে ধরে আনা হয়েছে।

সন্ধ্যার পর এমনিতে প্রায় রোজই মনোহর ডাকুয়াকে মায়ের সঙ্গে গেলাস নিয়ে বসতে হয়। আজ তাকে একটু আগে আসতে বললাম। বাঁশি শুনিয়ে মাকে যতটুকু আটকে রাখা যায় ততটুকুই লাভ ভাবছি।

চা জলখাবারের পাট শেষ হবার মধ্যেই প্রথমে মীনামাসি আর তার দু'পাঁচ মিনিট বাদে আংকল ডাকুয়া হাজির। আর বোঝা গেল আমার ফোন পেয়ে মনোহর ডাকুয়া মাথা খাটিয়ে ডিকি ডেটনের মর্যাদা আরো একটু বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। কারণ, মীনা মাসি এসেই সকলের অলক্ষ্যে আমার দিকে চেয়ে একবার চোখ টিপে বলল, বেড়াতে বেড়াতে তোর গ্র্যাণ্ডির ডেরায় একবার ঢুকেছিলাম, আজ সমস্ত

দিনের মধ্যে তুই একবারও যাসনি বলে সে ভাবছে দেখলাম, আমারও তাই মনে হল দিদি ভালো আছে কিনা একবার দেখে যাই—

মীনা মাসি এলে মা খুব একটা খুশি হয় না, খুশির ভাবও দেখায় না। বিকেল শেষ হয়ে আসছে, অদূরের শালজুড়ির মাথায় অন্ধকার নেমেই এসেছে। এ-সময় গেলাসের সমজদার নয় এমন লোকজনের পদার্পণ মায়ের খুব পছন্দ হবার কথা নয়। গোমড়া মুখ করে বলল, আমার জন্য তো ভাবনা চিন্তায় সব অস্থির একেবারে—আমি খারাপটা কোথায় আছি।

আমি খুব খুশি মুখ করে বললাম, খুব ভালো সময়ে এসেছ মীনা মাসি—এক্ষুণি দারুণ জিনিস শুনতে পাবে। আগে পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি মিস্টার ডিকি ডেটন—যাঁর বাঁশির নাম-ডাক এর মধ্যে তুমি নিশ্চয় শুনেছ—আর মিস্টার ডেটন, ইনি আমার মাসি মিসেস মীনা ডাকুয়া। মীনা মাসি বোসো—

বাংলোর বারান্দায় উঠে আসার ফাঁকে ডিকি ডেটনকে দেখে মীনা মাসির দু'চোখ একপ্রস্থ হোঁচট খেয়েছিল আমি লক্ষ্য করেছি। এই লোকটাকেই লাঞ্চ টাইমে আর ছুটির পরে স্কুল গেটের বাইরে ঘুর ঘুর করতে দেখে মীনা মাসি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ারকি করেছে। বাঁশির শিল্পী হিসেবে আজ তাকেই এখানে উপস্থিত দেখে অবাক তো হবেই। কিন্তু চতুর মীনা মাসি ডিকির পরিচয় শুনে যেন বসতেই ভুলে গেল। তার চোখে মুখে খুশির উত্তেজনা উপছে উঠল।—ও···আপনিই বাঁশি বাজিয়ে রাতের বাতাস পর্যন্ত সুরে ভরাট করে দেন! কি ভাগ্যি এসে গেছি—আমার দিকে ফিরল, এখন বাজনা হবে তো

আমি মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলাম, হবে। এমন সমাদর দেখে ডিকিই ঘাবড়ে যাচ্ছে মনে হল। দু'বার করে বলে উঠল, আমি এত প্রশংসার যোগ্য নই—এত প্রশংসার যোগ্য নই।

এর মধ্যে মনোহর ডাকুয়া হাজির আর পরের দফা নাটক। নিজের স্ত্রীকে আর ডিকি ডেটনকে দেখে যেন ভারী অবাক। প্রথমে ডিকিকে বলল, হ্যালো ডিকি, তুমি এখানে—কি ব্যাপার!

বিব্রত মুখে ডিকির তৎপর হয়ে ওঠার চেষ্টা। চা বাগানের কর্মী হিসেবে মনোহর তার অনেক ওপরের অফিসার। আমাকে দেখিয়ে বলল, আমার বাঁশি এর ভালো লেগে গেল তাই আসার সুযোগ পেলাম।

এক মুখ হাসি মনোহর ডাকুয়ার।—তোমার বাঁশি কার আর না ভালো লাগে, এরই মধ্যে শালজুড়িতে তুমি তো একজন ফেমাস ম্যান —আজ সন্ধ্যেটা তাহলে দারুণ জমবে দেখছি—বাঁশি এনেছ তো? বোসো বোসো—

স্ত্রীর দিকে ফিরল, তুমিও যে এখানে, বাঁশির টানে নাকি!

মীনা মাসি হাসিমুখে খোঁটা দিল, যার সত্যিকারের টান সে এসেই পড়ে, তুমি তো এসেছ গেলাসের টানে।

বাঁশি বাজিয়ের এই কদর দেখে মা যেন একটু ফ্যাসাদেই পড়েছে। মীনা মাসির কথা শুনে গজগজ করে ওঠার সুযোগ পেল। বলল, গেলাসের ওপর যদি তোর এত ঘেন্না তাহলে আবার ধরালি কেন—মনোহর তো ছেড়ে দিতেই চেয়েছিল।

প্রায় দশ এগারো বছর আগে মুখের ওই ক্ষতর যে কারণে অনুতাপে মনোহর ডাকুয়া মদ খাওয়া ছেড়েই দিতে চেয়েছিল সেই কারণ মীনা মাসি বা মা না জানলেও এতদিনের অভ্যাস একেবারে ছেড়ে দিলে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পাবে এই আশংকার কথা শুনে মীনা মাসিও ঘাবড়েছিল। তা জানে বলেই মায়ের এই ঠেস।

এরপর বাঁশি শুরু করার প্রস্তাব শুনেও মায়ের দিক থেকেই প্রথম বাধা। বলে উঠল, যে-জায়গা, ভালো বাঁশির সুরে সাপটাপ এসে হাজির হয় শুনেছি।

ভারী-মজার কথা যেন। ডিকি ডেটন খুব হাসতে লাগল। বলল, মাদার, সে-রকম হলে একজন ভালো শ্রোতা বাড়বে শুধু, কারো কোনো ক্ষতিই করবে না।

আমি ডিকিকে বললাম, মা ইণ্ডিয়ান মিউজিক কিন্তু একদম পছন্দ করে না, ইংলিশ মিউজিক বাজাবে।

যা-ই বাজানো হোক মা-কে ইংলিশ মিউজিক বলা হবে এ-তো শেখানই ছিল। পকেট থেকে বাঁশি বার করে মুড আনার জন্তই ডিকি শোনা যায় কি যায় না এমনি মৃদু একটু তালিম দিয়ে নিল। তারপর শুরু হতে বুঝলাম সেই বেহাগই ধরেছে। কারণ সুরে সুরে সেই রকম আকুতিই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই সুরের তাৎপর্য ভারী সুন্দর করে বুঝিয়েছিল বটে…মাঝ নদীতে ডুবতে চলেছে কেউ, সে করুণ স্বরে ডাকছে, কেউ এসো, হাত ধরে আমাকে পার করে দাও।

নিজের অগোচরে আমি ডিকির মুখের দিকে চেয়ে আছি। বারান্দায় আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘরের আলোগুলো রঙিলা জ্বেলে দিয়েছে, পর্দার ফাঁক দিয়ে সেই আলোর আভাস শুধু আসছে। বাশির সুর এ-রকম আলো-আঁধারিতেই যেন আরো বেশি মূর্ত হয়ে ওঠে। আমার মনে হচ্ছিল, তিন হাতের মধ্যে বসে বাজালেও ডিকি ডেটন যেন ভাবের ঘোরে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ ছন্দপতন। খটাস করে বারান্দার জোরালো আলো জ্বলে উঠল। মা সুইচের সব থেকে কাছে বসেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে আচমকা আলোটা সে-ই জ্বালিয়েছে। কষ্ট বিরক্ত দু'চোখ ডিকি ডেটনের মুখের ওপর। তার বাঁশি যেন একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। সে-ও বিমূঢ় মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে।

—এর নাম ইংলিশ মিউজিক? মায়ের ঝাঁঝালো গলা, হয় তুমি মিউজিকের কিচ্ছু জানো না, নয়তো তুমি আমাদের ভাঁওতা দিচ্ছ! এ-রকম কাঁদ-কাঁদ সুরের রেকর্ড ছেলে-বেলায় অনেক ইণ্ডিয়ানের বাড়িতে আমি শুনেছি!

ডিকি ডেটনের মুখের দিকে চেয়ে আমার অদ্ভুত লাগল। কেউ যেন এক সুরের তন্ময় রাজ্য থেকে হঠাৎ ওকে টেনে তুলে মাটিতে আছাড় মারল। আংকল ডাকুয়া আর মীনামাসির অপ্রস্তুত মুখ। গলা খাঁকারি দিয়ে বাবা বলল, আ-হা, ইংলিশ মিউজিকে বিষাদের সুর নেই…?

—থামো তুমি। মায়ের পাল্টা ধমক, জঙ্গল চষে তুমি তো একজন

সুর বিশারদ হয়ে উঠেছ। ও নিজেই বলুক এটা ইংলিশ মিউজিক কি না!

মদ পেটে না পড়লে মা-কে ভাঁওতা দেওয়া সহজ নয় দেখছি। বাবা তবু আপোসের সুরে বলল, কিন্তু তুমি বাধা দিলে কেন, শুনতে তো বেশ লাগছিল···

—ভালো লাগুক না লাগুক ও ভাঁওতা দেবে কেন?

এবারে ডিকি ডেটন মায়ের দিকে তাকালো। একটু হাসতেও চেষ্টা করল। কিন্তু এ-যেন হতাশার হাসি। বলল, আপনার মেয়ে আমাকে ইংলিশ মিউজিক বাজাতে হুকুম করেছিল মাদার—কিন্তু আমি তো বলিনি ইংলিশ মিউজিকই বাজাচ্ছি···আপনি ঠিকই ধরেছেন; এটা খাটি ইণ্ডিয়ান মিউজিক, আমি ভেবেছিলাম আপনার ভালো লাগবে—

—সেটা বলে নিলেই পারতে! আমার একটুও ভালো লাগেনি, গান শুনে লোকে আনন্দ ফূর্তি করে—শোকে কে ভাসতে চায়?

ডুবন্ত লোকের খড়কুটো ধরার মতো চেষ্টা ডিকি ডেটনের।—আচ্ছা, এবার একটা ইংলিশ মিউজিক বাজাচ্ছি, দেখুন কেমন লাগে।

আর শোনার উৎসাহ মায়ের নেই, তবু বসল।

হাল্কা ওঠা-নামার একটা বিদেশী সুরই বাজালো এবার। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে শেষও হয়ে গেল। তেমন একটা জমল না। সব থেকে বিষন্ন মুখ ডিকি ডেটনেরই। প্রথম বারের ওই ধাক্কায় তার মনের সুর-তাল কেটে গেছে।

মা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর গম্ভীর মুখে মন্তব্য করল এটা তবু একরকম হয়েছে··আমার কান কড়কড় করছে। অসহিষ্ণু দু'চোখ মনোহর ডাকুয়ার দিকে।—আমি এখন ঘরে গিয়ে বসব, গলা-বুক শুকিয়ে গেল—তোমার আসার ইচ্ছে আছে?

সাদা কথায় মা ডিকি ডেটনকে এখন বিদায় হতে বলছে। মনোহর ডাকুয়া কিছু বলার আগে ডিকিই উঠে দাঁড়ালো, বলল, আমিই যাচ্ছি, আপনাকে আর বিরক্ত করব না··

মায়ের ওপরেই হঠাৎ আমার বিচ্ছিরি রাগ হয়ে গেল। ডিকিকে বাধা দিয়ে বললাম, বোসো! তারপর আংকল ডাকুয়াকে তেমনি রাগত গলায় বললাম, যাও – মায়ের সঙ্গে বোতল নিয়ে বোসো গে— মায়ের কান কড়কড় করছে যখন দরজা বন্ধ করে দিতে পারো—আমরা এখন ইণ্ডিয়ান মিউজিকই শুনব!

এর জবাবে ডিকি যা বলল তা আদৌ আশা করিনি। আমার দিকে ফিরে অল্প মাথা নাড়ল। বলল, এরপর আর বা-না হবে না··· আসবে না।

আমার এ কথাতেও রাগ। বলে উঠলাম, খুব আসবে—মা কি মিউজিকের মস্ত সমজদার নাকি যে তার পছন্দ হল না বলে –

মুখের কথা শেষ হল না। কারণ ঢ্যাঙা মানুষটা লম্বা পা ফেলে মন্থর গতিতে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িতে নেমেছে। কাউকে একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত জানায়নি। লোকটার বিষণ্ণ ব্যথাতুর মুখ যদি আমার মনে দাগ না কাটত তাহলে হয়তো রেগেই যেতাম। এ-ভাবে আমাকে অবজ্ঞা করার লোক শালজুড়িতে নেই। কিন্তু স্পষ্টই মনে হয়েছে এটা অবজ্ঞা নয়–উল্টে অপ্রত্যাশিত একটা আঘাতে লোকটার ফর্সা মুখ বিবর্ণ। মায়ের চাপা মন্তব্য কানে এলো, ওঃ, মস্ত শিল্পী, ভদ্রতা জ্ঞান পর্যন্ত নেই!

ডিকি ডেটন নেমে ফটকের দিকে এগোচ্ছে। মনোহর ডাকুয়া আর মীনা মাসি দু'জনেই আমার দিকে চেয়ে আছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দা থেকে নেমে পা চালিয়ে ফটকে পৌঁছনোর আগেই পিছন থেকে ডাকলাম, ডিকি!

দাঁড়িয়ে গেল। আস্তে আস্তে ফিরে তাকালো। বেশ কাছে না এলে অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। এক হাতের মধ্যে এসে একটু রাগত সুরেই বললাম, মায়ের বাজনা পছন্দ হয়নি বলে তুমি এভাবে অভদ্রের মতো চলে যাচ্ছ যে?

ও আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।—অভদ্রের মতো কেন বলছ··· আমি যখন সুরের মধ্যে ডুবে যেতে থাকি তখন ও-ভাবে কেউ ধাক্কা

মেরে থামিয়ে দিলে মাথায় ডাণ্ডা বসানোর মতো যন্ত্রণ' হয়···তোমরা অবাক হবে বলেই পালিয়ে আসছিলাম।

এ-ও অবাক হবার মতো কথা। তবু বললাম, তোমাকে তো আগেই বলেছি মায়ের মাথার ঠিক নেই, তার ওপর এটা তার ড্রিংকের সময়—তাছাড়া সকলের সব ভালো লাগবে তারই বা কি মানে!

ডিকি আবার আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।—তুমি ভুল করছ, ভালো না লাগাটা তোমার মায়ের একটুও দোষ নয়, দোষ আমার, বাজানোর মতো বাজাতে পারলে পাথরও সাড়া দেয়—বাঁশি শুনিয়ে আমি তোমার মায়ের মন ফেরাব চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিলাম—এই বাঁশি আমার ভেঙে দু'টুকরো করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাওয়া উচিত!

রাগ হতে লাগল আর সেই সঙ্গে মনে হল এক পাগলের ভালো করতে গিয়ে আর এক পাগল নিয়ে পড়লাম। অন্ধকার সত্ত্বেও এই মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে মায়াই হবার কথা। কিন্তু মেজাজ বিগড়লে আমারও অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলাম, যাও তাহলে, উচিত কাজ করে ফেলো, বাঁশি বাজিয়ে মা-কে বশ করতে পারলে না যখন তোমার সব আশা ভরসাই তো একেবারে জলে!

হন হন করে ফিরলাম। সিঁড়ির কাছে এসে একবার ঘুরে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না।

বারান্দায় শুধু মীনা মাসি বসে। আংকল ডাকুয়া আর মা গেলাস নিয়ে বসে গেছে নিশ্চয়, বাবাও হয়তো তাদের সঙ্গ দেবার জন্যেই সরে গেছে। মীনা মাসির মুখে টিপটিপ হাসি। আমি কাছে আসতে ভুরু কুঁচকে বলল, এই তাহলে সেই বাঁশিওয়ালা?

সামনে বসে ফিরে জিগ্যেস করলাম, এই আর সেইটা কি?

—আমি কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছি, স্কুল গেটের সামনে এই ছেলেটাই হ্যাংলার মতো তোর জন্যে ঘুর ঘুর করে কি না?

হেসেই জবাব দিলাম, আমিও তাই জানতাম, এখন দেখছি আমার জন্য নয়, মায়ের জন্য—মায়ের কাছে তার বাঁশির কদর হল না দেখে

দুঃখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল দেখলে না ?

মানা মাসিকে বিশদ করে বলতে হয় না, মুখ খুললেই যেটুকু বোঝার বুঝে নেয়। হেসে জবাব দিল, মরণ দশায় লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে তোর মা-তো জলজ্যান্ত একটা মানুষ···কিন্তু ও মা-কে ধরে মেয়ের নাগাল পেয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না !

ভালো মুখ করে জিগ্যেস করলাম, কি মনে হচ্ছে ?

—দুই টোপ গিললি কবে থেকে ?

—গিললাম কোথায়, সবে তো আজই ঠুকরে দেখলাম, জোর গলায় বলেছিল বাঁশি শুনিয়ে মায়ের মেজাজ-পত্র ভালো করে দেবে।

মানা মাসি ডিকির দিক টেনে বলল, যা ই বলিস, বাজাচ্ছিল বড় সুন্দর, তোর মায়ের জন্য সব পণ্ড হয়ে গেল। হ্যাংলার মতো স্কুল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তার ভিতরে এত গুণ কে জানত—

আর না বাজিয়ে ডিকি ডেটন ও-ভাবে উঠে চলে যেতে আমার রাগ হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে মনে হয়েছে লোকটার ভিতরে সত্যি-কারের শিল্পীর মন না থাকলে মায়ের আচরণে অতটা আঘাত পেত না। দুটো দিন ভিতরে ভিতরে একটু উতলাও থাকলাম। বাশি আছড়ে ভেঙে বাউণ্ডুলে মানুষটা শালজুড়ি থেকেই উধাও হয়ে গেল কিনা কে জানে। পরের তিনটে দিন কাছে-দূরে কোথাও থেকে বাঁশির সুর কানে এলো না। টিফিন টাইমে বা ছুটির স্কুল গেটের সামনে ওই মুখ দেখা গেল না। একদিনে অতটা হৃদ্যতা হয়ে যাবার পর আগের মতোই ডিকি ডেটন ওখানে চোখ-মন জুড়তে আসবে এ অবশ্য আশাও করিনি। বাড়িতে আসা সহজ হয়ে গেছে যখন, বিকেলের দিকে তাই আসবে ধরে নিয়েছিলাম। তিন দিনের মধ্যেও এলো না। গত সন্ধ্যায় এসে আংকল ডাকুয়া জিগ্যেস করল, ডিকি ডেটনের সঙ্গে আর দেখা-টেখা হয়েছে ?

আমার ভিতরে একটু অপরাধ বোধ ছিলই। ···মায়ের জন্য দুঃখ পেয়েছে, তার ওপর ও-ভাবে রেগে ওঠাটা আমার ঠিক হয়নি। আংকল ডাকুয়া এলে আমিই [illegible] ডিকির খবর জিগ্যেস করব ভেবেছিলাম।

সে জিগ্যেস করতে জবাব দিয়েছি, না···কেন ?

মনোহর ডাকুয়া বলল, ওর সেকশন অফিসার কমপ্লেন করছিল, তিন দিন যাবত লোকটার অফিসে পাত্তা নেই, কোনো খবরও নেই··· কাজ কর্মে মন নেই বলে ভদ্রলোক এমনিতেই ডিকির ওপর খুশি নয়, খবর না দিয়ে ডুব দিয়ে আছে বলে এখন একেবারে খাপ্পা—সে কেবল ডিউটি বোঝে, শিল্পী টিল্পীর খাতির নেই।

এ-রকম কিছু আশংকাই মনের তলায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। লোকটাকে কতটুকু আর চিনি, তবু শালজুড়ির আর দশটা লোকের থেকে যে অন্যরকম সেটা অন্তত একদিনের ওইটুকু সময়ের মধ্যেই বোঝা গেছে। বললাম, ক্লাব হাউসেই তো থাকে, সেখানে একটা খবর নিলে না কেন ?

মুখ দেখে মনে হল এ রকম বলব আংকল ডাকুয়া ভাবেনি। না ভাবারই কথা। সে ডিকির ওই সেকশন অফিসারেরও ওপরওয়ালা নিশ্চয়, নইলে তার কাছে কমপ্লেন আসবে কেন। নির্লিপ্ত মুখেই আমাকে একটু লক্ষ্য করার চেষ্টা। জবাব দিল, না, ক্লাব হাউসে অবশ্য খবর নেওয়া হয়নি, আচ্ছা কালও না এলে লোক পাঠাব'খন।

অর্থাৎ, আমার ইন্টারেস্ট আছে বুঝছে যখন, অনেক ওপরওয়ালা হলেও এটুকু করতে আর আপত্তি নেই। ফলে আবার বাধা দিতে হল। বললাম, যাকগে, সে নিজে থেকে অমন গাফিলতি হলে তোমার অত কি দায়···সেদিন বাড়িতে এসে এভাবে অপদস্থ হয়ে গেল বলেই বলছিলাম।

পরদিন আমার স্কুল কি একটা কারণে ছুটি ছিল। তা বলে সকলের ছুটি নয়। কোন একটা উপলক্ষ থাকলেই তো স্কুল ছুটি। সকালের দিকে গ্র্যাণ্ডির কাছে চলে এলাম। ফুরসত পেলে হামেশাই যাই। গ্র্যাণ্ডি তার ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে হাঁটু দোলাচ্ছে। এখন বুঝতে পারি এটা তার বসে আরাম করা নয়, মাথায় আঁকার কিছু বিষয় ঘুরপাক খেতে থাকলে ওই রকম বসে হাঁটু দোলায়। আমাকে দেখে যেন ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেল। এক মুখ হেসে মোটা

লোকটা একটা হাত তুলে অভ্যর্থনা জানালো, আয়, বুড়ো বয়সে আমাকে ভালো রোগে ফেলেছিস, দু'তিন দিন তোকে না দেখলেই মনে হয় দু'তিন বছর দেখিনি।

মোড়াটা তার হাঁটুর সামনে টেনে এনে হাসি মুখে বসলাম। এই ধরণের রসিকতা এত শুনেছি যে এখন তার জবাবও দিই না। বললাম, মাথায় কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে মনে হচ্ছে?

—আর বলিস না, সক্কাল বেলা এসে ছোঁড়াটা আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেল—এমন একটা ব্যথিত আইডিয়া মাথায় ঢোকালো ...পাহাড় আর জঙ্গল ধরে সে পালাচ্ছে, পিছনে এক দঙ্গল মানুষ নেকড়ে ওকে তাড়া করেছে, আর ও প্রাণপণে পালাচ্ছে কেন জানিস? নিজের প্রাণ বাঁচাতে নয়, ওদের কাছ থেকে তার হাতের বাঁশিটা বাঁচাতে!

বাঁশি শোনার পর বোঝা গেল কার কথা বা কার আইডিয়া। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ডিকি ব্রাটন? সে সকালে এখানে এসেছিল?

মুখ মচকে গ্র্যাণ্ডি জবাব দিল, শুধু আজ সকালে কেন, এসে এসে ক'দিন ধরেই তো সে আমার হাড়পিত্তি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, বাশি নিয়ে এখন শুধু তার রাধা নাম সাধার মতলব বোধ হয়—আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, ও-দিকে চোখ দিও না, ওই রাধাটি একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আমার—তা তোর মতো রাধায় মজলে ভালো কথা কেউ শুনবে। উল্টে বাঁশিতে রাধার মানভঞ্জনের আকুতি শুনিয়ে আমার চোখে যমুনা টেনে আনে।

হিন্দুদের রাধা-কৃষ্ণের গপ্প গ্র্যাণ্ডিকে আমিই শুনিয়েছি। তাকে ছবির রাধা-কৃষ্ণও দেখিয়েছি। ওই থেকে আইডিয়া নিয়ে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের লুকোচুরির কয়েকটা ছবিও এঁকেছে। এই জন্যেই এভাবে গড়গড় করে উপমা দিতে পারল। গ্র্যাণ্ডির দাড়ির ফাঁক দিয়ে হাসি চুয়ে পড়ছে, কিন্তু কুতকুতে চোখে রাগ রাগ ভাব। গলায়ও রাগের ঝাঁঝ, তোর ব্যাপারখানা কি, রাধার মতো আনফেথফুল হবার কারসাজি শুরু হয়েছে?

ডিকি ডেটন এর কাছে এসে কি হ্যাংলামোর কথা বলেছে যার জন্য এই ছদ্ম রাগ! বিরক্তি চেপে আমিও রসিকতার আমেজটুকুই বজায় রাখলাম।—কারসাজি শুরু হয়েছে তোমার কাছে কে ফাঁস করল?

—যে ফাসির দড়ি গলায় পরতে চায় সে নিজেই। প্রথম দিনের আলাপের পরেই তুই নাকি মা-কে বাঁশি শোনানোর নাম করে তোদের বাংলোয় এনে তুলেছিলি?

মিথ্যে নয় বটে, কিন্তু নিখাদ সত্যিও নয়। আলাপের দিনেই বাংলোয় আসার তাগিদ ডিকির নিজেরই বেশি ছিল। জবাব না দিয়ে ফিরে জিগ্যেস করলাম, মা-কে বাঁশি শোনানোর ফলখানা কি হয়েছিল তা বোধহয় আর তোমাকে বলেনি?

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্র্যাণ্ডি জবাব দিল তা-ও বলেছে, আমার যত হিংসেই হোক ছেলেটা সরল বটে—বলেছে, বাঁশি শোনানোর মাঝখানে তোর মায়ের হাতে গালে বিষম এক থাপ্পড় খেয়ে থেমে যেতে হয়েছিল …কি-রকম থাপ্পড় তা-ও বেশ রসিয়ে বলেছে।…তার নাকি দারুণ মন খারাপ হয়ে গেছল, কিন্তু আসার আগে তোর কাছ থেকে পুরস্কার পেয়ে মন ডবল ভালো হয়ে গেছে। গ্র্যাণ্ডি এবারে তির্যক চোখে তাকালো, তা কি পুরস্কার দিলি…গালে চুমুটুমু খেয়ে থাপ্পড়ের দাগ মুছে দিলি?

ডিকি ডেটন পুরস্কারের কথা বলুক বা না বলুক, মায়ের ব্যবহারে এখনো যে মন খারাপ করে বসে নেই এটুকু বোঝা যাচ্ছে। হেসেই ফিরে বললাম, ওই ভেবে তোমার খুব হিংসে হচ্ছে?

…হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে।

মোড়া ছেড়ে কাছে এসে দু'হাতে তার দাড়ির গোছা ধরে দু'গালে দুই চুমু খেলাম।—হল?

—একটুও না, ওই চুমু তো হতভাগা দাড়ির ওপর গিয়ে পড়ল!

হেসে উঠলাম।—দাড়ি কামিয়ে ফেলো তাহলে। আর শোনো, আমার ব্যাপারে ও-রকম সেন্টিমেণ্টাল লোককে বেশি প্রশ্রয় দিও না—

আমার কাছে ধাক্কা খেলে হয়তো কালজানিতে গিয়ে ঝাঁপ দেবে।

গ্র্যাণ্ডি হাসতে লাগল। আমার প্রশ্রয়ের অপেক্ষায় সে বসে নেই, সে এখন তোকে নিয়ে স্বর্গ রচনা শুরু করে দিয়েছে।…তবে, আমার লোক চিনতে খুব একটা ভুল হয় না, এই কাঁদিনের মধ্যেই ছেলেটাকে ভালো লেগে গেছে, তবে একটু পিকিউলিয়ার বটে…

পরে ভেবে দেখেছি, গ্র্যাণ্ডির এই মন্তব্যই ঠিক। একটু পিকিউ-লিয়ার বলেই খারাপ লাগে না। মনের কথা বা চোখের ভাষা খুব গোপন করতে পারে না।

ছুটির দিনে বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ আমার কালজানিতে আসাই চাই। ও-সময়ে এখানকার নির্জনতা আমাকে টানে। কাল-জানির ধার ধরে ধরে পাহাড়ী জঙ্গলের দিকে এগোলাম। তারপর পাহাড়ী নালার পাশে সেই পাথরটার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলাম।

পাথরটার ওপর ডিকি ডেটন বসে।

আমাকে দেখে সে ও হাসি হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। যেন আমার আসার কথা ছিল আর আমার প্রতীক্ষায়ই ও বসে আছে। এলাম দেখে খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো।

পায়ে পায়ে এগোলাম। নির্লিপ্ত গম্ভীর থাকার চেষ্টা। কাছে আসতে ডিকি পকেট থেকে রুমাল বার করে পরিষ্কার পাথরটাই এক-দফা ঝেড়ে দিল। হেসে আপ্যায়ন জানালো, বোসো, আমি ঠিক জানতাম আজ ছুটির দিনে তুমি ঠিক এখানে আসবে—

চেষ্টা করে ভুরুতে ভাঁজ ফেললাম একটু।—ছুটির দিন মানে, তোমাদেরও ছুটি নাকি?

—না, আমাদের কেন, সকালে গ্র্যাণ্ড জেরির মুখে শুনলাম আজ তোমাদের ছুটি, তাই আজ আর অফিস করা হল না—

ওকে একটু ঘাবড়ে দেবার জন্যেই গম্ভীর দু'চোখ মুখের ওপর ফেলে রাখলাম একটু।—আজ কেন, আজ নিয়ে চার দিন ধরে তুমি অফিসে যাচ্ছ না—চাকরিটা আর আছে কি নেই খবর নিয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ কপালে।—কি সর্বনাশ, এখন চাকরি গেলে তো মারা পড়তে হবে—ক্লাব হাউসেও আর থাকতে দেবে না—কিন্তু এই শালজুড়ি ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে আমি থাকব কি করে এখন! প্লীজ, ডাকুয়া সাহেবকে একবার ফোনে বলে দিও মাইনে কেটে নিক, কিন্তু চাকরিটা যেন না যায়।

আমি ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছি। এর সম্পর্কে গ্র্যাণ্ডির সকালের মন্তব্যও মনে পড়ছে।···পিকিউলিয়ারই বটে। যা বলল তার সাদা অর্থ, চাকরি যাওয়াটা উদ্বেগের কারণ নয়, শালজুড়ি ছেড়ে এখন আর কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে না সেটাই ভীষণ সমস্যা। আর, 'এখন' কথাটার সাদা অর্থ শালজুড়ি ছাড়া মানেই আমাকে ছাড়া। কিন্তু আশ্চর্য, এই শোনার পরেও আমার রাগ হচ্ছে না, উল্টে ভিতরে ভিতরে হাসিই পাচ্ছে।

গম্ভীর মুখে পাথরে বসে আবার মুখের দিকে তাকালাম।—তিন দিন ধরে অফিসে যাচ্ছ না কেন—গ্র্যাণ্ড জেরির কাছে তো রোজ যাচ্ছ?

তাকে আমার দারুণ ভালো লাগে যে—একজন জাত শিল্পী। তারপরই মুখে লজ্জা-লজ্জা হাসি। বলল, তাছাড়া তার কাছে গেলে তোমার অনেক গপ্প শুনতে পাই—ছেলেবেলায় তুমি নাকি তাকেই বিয়ে করবে বলেছিলে?

এবারেও রাগ হল না, আর চেষ্টা করেই ঠোঁটের হাসি গিলে ফেললাম। অপলক চোখে চেয়েই আছি।

আমার কথার জবাব দেওয়া হয়নি খেয়াল হল। মাঝে হাতখানেক ফাঁক রেখে পাথরটার ওপর বসল। মুখে বিব্রত হাসি। বলল, আগের তিন দিন অফিসে যাইনি, কারণ মনের ওই অবস্থায় গেলে কাজে এত ভুল হত যে তার ফলেই চাকরিখানা যেত···।

এবারে কৌতূহল হল একটু। জিগ্যেস করলাম, মনের কোন অবস্থায়···মায়ের ব্যবহারে মন-মেজাজ খুব খারাপ ছিল?

—তা কেন, সঙ্গে সঙ্গে সাদা-সাপটা জবাব, মায়ের অমন

ব্যবহারের ফলে তোমার কাছ থেকে এমন একখানা পুরস্কার পেলাম—মন-মেজাজ আর খারাপ থাকতে যাবে কেন! উল্টে এই তিন দিন যাবত এমন আনন্দে ডুবে আছি যে অফিসের কথা ভাবতেই গায়ে জ্বর!

আমি দস্তুর মতো অবাক। গ্র্যাণ্ডিও পুরস্কার দেবার কথা বলছিল আর আমি সেটা ঠাট্টা ভেবেছিলাম। বললাম, আমার কাছ থেকে আবার কি পুরস্কার পেলে?

—বাঃ, মায়ের অমন ব্যবহারের ফলে তোমার মুখে যে কত দরদ সে-কি আগে দেখেছি! রাগ করে তুমি যখন বললে, বাঁশি বাজিয়ে মা-কে বশ করতে পারলে না যখন তোমার সব আশা-ভরসাই তো একেবারে জলে—ওই কথা শুনে আর রাগ দেখে আমার গাধার মতো মাথাটাও সাফ হয়ে গেল—তারপর এই ক'দিন ধরে আমি কেবল বাতাসে ভাসছি।

ভিতরে ভিতরে আমি সতর্ক হতে চাইলাম।···গ্র্যাণ্ডি বলেছিল লোক চিনতে তার খুব একটা ভুল হয় না, এই ক'দিনের মধ্যেই একে তার ভালো লেগে গেছে।···যে-কথার আঁচ পেলেও আমার রাগ হয়ে যেত, সে-রকম কথা পাশে বসে স্পষ্ট বলা সত্ত্বেও আমার রাগ হচ্ছে না কেন, নির্দয়ভাবে ভুল ভেঙে দিতে পারছি না কেন! আর চাই বা না চাই, ভালও লাগছে কেন? এই লোকের মধ্যে ঠিক কোন্ জিনিসটা গ্র্যাণ্ডির ভাষায় পিকিউলিয়ার? খুব সরল? খুব সরল হলে আমার ওই কথার কোনো মোক্ষম অর্থ ধরে নেয়—আনন্দে বাতাসে ভেসে বেড়ানোর কথা বলে? খুব নির্লিপ্ত মুখ করেই জবাব দিলাম, হাজার হোক সেদিন তুমি ছিলে আমার অতিথি, মায়ের ব্যবহারে তোমার মুখের অবস্থা যা হয়েছিল তাতে সকলেরই মায়া হবে, তাই তোমাকে বোঝাতে গেছলাম।···আর তোমার অবুঝপনা দেখে ওই কথা বলে ছিলাম···কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম ওই কথা শোনার পর সত্যি সত্যি তুমি বাঁশি ভেঙে এই কালজানির জলেই ফেলে দিয়েছ···তার বদলে কিনা আনন্দে বাতাসে ভাসছ!

ডিকির মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি। বলল, মাঝে মাঝে আমি একেবারে

গাধা বনে যাই বটে ; বিশেষ করে বাঁশি বাজানোর সময় বিচ্ছিরি গণ্ডগোল হয়ে গেলে—তা বলে তুমি আমাকে অত বোকা ভেবেছ ! তোমার মুখে অমন দরদের কথা এই শালজুড়িতে আর কেউ কোনদিন শুনেছে ?

সত্যিই অস্বস্তি বোধ করছি। মনে হচ্ছে এই পাগল দরকার পড়লে নিজেকে এমন সঁপে দিতে জানে যাকে ঠেলে দূরে সরানো খুব সহজ নাও হতে পারে। মুরুব্বির সুরে সব ঝেড়ে ফেলে দেবার মতো করে বললাম, যাক, চাকরিটা খোয়াতে না চাও তো কাল থেকে মন দিয়ে অফিস করো, বেশি বাতাসে ভাসলে নির্ঘাৎ মাটিতে আছাড় খেতে হয়—তোমার সেকশন অফিসার তোমার ওপর ক্ষেপে আছে।

ডিকি ডেটন মিটিমিটি হাসতে লাগল।—ওই ফার্নানডেজ ব্যাটা একটা কলের মানুষ, কিন্তু আমার আসল মুরুব্বি সে নয়, আসল মুরুব্বি মনোহর ডাকুয়া—আমাকে তুমি বোকা ভাবো নাকি, তার সাধ্য আছে তুমি থাকতে আমার চাকরি যায় !

সঙ্গে সঙ্গে মনে এলো, এই পাথরটার ওপরেই নাটকের চরম ঘটে গেছে একদিন যার ফলে আজও মনোহর ডাকুয়ার সুন্দর মুখে ওই বীভৎস ক্ষত চিহ্ন। কিন্তু সে-তো শুধু আমি আর মনোহর ডাকুয়া ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ জানে না। তবু এই লোক এমন কথা বলে কি করে ! মনোহর ডাকুয়া কোনদিন আমার কোনো অনুরোধ ঠেলে দিতে পারবে না এ কেবল আমিই জানি—কিন্তু এই লোক এমন কথা বলে কি করে ! একে বোকা কে বলবে ? গম্ভীর হয়ে জবাব দিলাম, অন্যায় বুঝলেও তোমার জন্য আমি থাকব এমন ভরসা পেলে কোত্থেকে ?

ডিকি ডেটন হাসতে লাগল। তারপর পকেট থেকে বাঁশি বার করে বলল, যেতে দাও, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আজ তোমাকে একটা নতুন জিনিস শোনাব ঠিক করে রেখেছি।

ধাক্কা দিয়েও ওকে সজাগ করার এই সময় মনে হল। পাথর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নিরুত্তাপ গলায় বললাম, একলা বসেই মন্ত্র করো

তাহলে, এখন আমাকে উঠতে হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে ফর্সা মুখ ছাই-সাদা। নিজের চোখ দুটো আর কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। গলা দিয়ে একটা আকৃতি বেরিয়ে এলো যেন।—কিছু না শুনেই চলে যাবে!

অকারণ ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিলাম, এ আবার তোমার কি-রকম জুলুম···তোমার ইচ্ছেমতো আমাকে বাঁশি শুনতে হবে নাকি!

তেমনি বিবর্ণ মুখে চুপচাপ বসে রইল একটু। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, তা না···আচ্ছা যাও।

কিন্তু এই মুখের দিকে চেয়ে ঠিক দরকারি মুহূর্তটিতে আমি অকরুণ হতে পারলাম না। মনে হল মায়ের কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে সেদিন যেমন মুখ হয়েছিল তার সঙ্গে এই মুখের তফাৎ নেই। একটা বড় প্রত্যাশা যেন চূর্ণ করে দিয়েছি। হালছাড়া গলায় বললাম, আচ্ছা পাগল নিয়ে পড়লাম তো···আমার কোনো দরকারি কাজ থাকতে পারে না? বললাম, নতুন জিনিস কি শোনাবে···দারুণ কিছু?

তেমনি বিবর্ণ মুখেই ডিকি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, না তুমি যাও, আজ আর সুর আসবে না···।

আমার রাগ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ ঘেঁষে ধুপ করে আবার পাথরটার ওপর বসে পড়লাম। ঝাঁঝালো গলায় বললাম, সুরের বাবা আসবে—না এলে আমার আসাও জীবনের মতো শেষ জেনে রেখো!

আমার মুখের ওপর চাউনিটা গভীর। একটু একটু করে ঠোঁটে আর সমস্ত মুখে হাসি ছড়াতে লাগল। বলল, তোমার মধ্যে এত দরদ কিন্তু চেষ্টা করে এত কঠিন হতে চাও কেন?

জবাব হাতড়ে পেলাম না। থতমত খেলাম একটু। মায়ের ব্যবহারে আঘাত পাবার পর আমার যে-রাগ আর যে-কথা শুনে এই লোক তিন তিনটে দিন আনন্দে বাতাস সাঁতরে বেড়িয়েছে—সেই গোছের আনন্দেরই যেন ইন্ধন যোগানো হল কিছু। বললাম, বাজে কথা ছেড়ে নতুন জিনিস কি শোনাবে আগে বলে নাও।

আগে বলে নিলে বুঝতে আর রস পেতে সুবিধে। চোখে চোখ

রেখে ডিকি হাসি হাসি মুখে পকেট থেকে বাঁশি বার করল। হাসছে অল্প অল্প। ইণ্ডিয়ান মিউজিকের কত রূপ, কত রাগ-রাগিণী তুমি জানো না—ঠিক ঠিক রস পেলে দেখবে সবই সর্বদা নতুন। কলকাতায় আমার একজন বাঙালা গানের গুরু ছিল। অনেক বয়েস, কি ন্তু কেমন নাম ডাক হল না। এই সব রাগ-রাগিনী সে আমাকে বোঝাতো, আমার চোখের সামনে তাদের রূপ তুলে ধরত। গেয়ে গেয়ে সেই সব রূপ বিস্তার করত, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম, তারপর বাঁশিতে সেই সব সুর তুলে নিতে চেষ্টা করতাম। তোমার কথা শুনে আর তোমাকে দেখে এক-একসময় ছটো রূপ আমার চোখে ভাসে—একটা বেশি একটা কম—তার মধ্যে বেশি যেটা মনে আসে তার নাম বড়হংসিকা (বড়হংসিকা)—সেটাই বাজাচ্ছি।

মিউজিকের এ-সব কথা আমার কাছে একেবারে ছর্বোধ্য। অথচ শুনতে ভালোই লাগছে। জিগ্যেস করলাম, বড়হংসিকা এক্সপ্লেন করো।

জবাবে মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল। চাউনিটুকু এত গভীর যেন স্পর্শের মতো গায়ে লাগছে। অথচ লোকটা যেন আমাকেই দেখছে না, আমার মধ্যে আর কাউকে দেখছে। বলল, তোমার মতো কিছুটা দেখতে এক মেয়ের চেহারা কল্পনা করো, তার পরনে শাড়ি, একটা বাগানের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে…আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে ঘাসে লুটোচ্ছে—সেই মেয়ে নিজের মধ্যে ভরপুর হয়ে এগিয়ে আসছে। হাসছে অল্প অল্প…মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তার মাধুর্য ভরা চঞ্চল দৃষ্টি, সে জানে শিগগীরই তার প্রিয় সঙ্গ লাভ হবে, সে যেন নেপথ্যে কোথাও থেকে দেখছে আর তার কাছে আসার অপেক্ষা করছে—বড়হংসিকা তাই হৃষ্টচিত্ত—বড়হংসিকা বিলাসী, ক্ষণে ক্ষণে সর্বাঙ্গে তার অকারণ রোমাঞ্চের ঢেউ—বড়হংসিকার এই রূপের সর্বত্র খ্যাতি, সর্বত্র সমাদর।

বুকের তলায় আমারও এক অজানা আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে, ভিতরটা ছলে ছলে উঠতে চাইছে। ডিকির চোখে চাপা দেবার জন্ম

ছদ্ম কোপে বলে উঠলাম, ফ্ল্যাটারি করা হচ্ছে কেমন? আমার মধ্যে তুমি এই রূপ দেখো!···আর একটা কোন্ রূপ মনে আসে শুনি?

টিপটিপ হাসতে লাগল। বলল, শুনলে তুমি রেগে যাবে···মালবী।

—সেটা ক?

—ওই বড়হংসিকার মতোই সুন্দর, কিন্তু বাইরে বড় গম্ভীর, প্রিয়জন কাছে নেই বলে তার মেজাজ-পত্র খারাপ, খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না, ইয়ে মানে, এক কথায় মালবী অতি কামাতুরা—

রেগে উঠব কি, আমার বুকের ভিতরটা কেন যেন ঢিপ ঢিপ করে উঠল। কে যেন আমার সংগোপনের এক দুর্বল জায়গায় হাত রেখেছে। রয় জারভিস আর আসবে না জানি, কিন্তু আজও যে সে আমার অস্থি মজ্জা দখল করে আছে অস্বীকার করব কি করে। সমস্ত বাসনা নিয়ে যৌবনের শূন্য তটে বসে আছি বলেই বাইরে এত প্রতি-রোধের বর্ম—কাউকে বরদাস্ত করতে চাই না, কাউকে কাছে আসতে দিই না। কিন্তু এই লোক আমার মধ্যে সেই বাসনার মূর্তি দেখল কি করে!

—রাগ করলে? অপ্রতিভ প্রশ্ন।

—করব ভাবছি। তার আগে বাজাও—

—কোন্‌টা···বড়হংসিকা না মালবী?

—একে একে দুটোই।

বাজালো। আমি কান পেতে শুনছি। কি বাজাচ্ছে জানার ফলেই আরো ভালো লাগছে কিনা জানি না। বড়হংসিকা নিজের আনন্দে ভরপুর, নিজের মধ্যে দেবার অনেক ঐশ্বর্য জানে বলেই হৃষ্ট-চিত্ত। তার প্রিয় আসবে, আসছে···না এসে পারে কখনো! কিন্তু পরের বাজনা অর্থাৎ মালবী শুনতে শুনতে আমার মুখ লাল হয়ে উঠছে কিনা জানি না, কিন্তু কান দুটো গরম হয়ে উঠছে।···এক রমণী যেন কখনো বিরহে ফুঁসে উঠছে, কখনো বা বিষাদে ডুবছে। আবার ধৈর্যে মন বাঁধছে, প্রিয় আসবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে···প্রিয় সন্নিধান কল্পনা করছে, আর যৌবনের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে ঢেলে দেবার উন্মুখ

মুহূর্ত গুণছে। নিরানন্দ বিষণ্ণ মালবী নিভৃতে তখন নির্লজ্জ অভিসারিকা, জ্বলন্ত বাসনার প্রতিমূর্তি। যেমন ভাবছি ডিকি ঠিক সেই অর্থ করেই বাজাচ্ছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার মনে এই রকমই একটা ছবি ভেসে উঠছিল।

বাজানো শেষ হতে ডিকি ডেটন আমার মুখের ওপরে দু'চোখ রেখে অল্প অল্প হাসতে লাগল। জিগ্যেস করল, কেমন···?

জবাব দিলাম, আমার মনে হচ্ছে ভিতরে ভিতরে তুমি একটি অসভ্য···আমি সব ধরতে পারব না বুঝে বাঁশির সুরে সুরে কিছু কুকার্য করছিলে।

শুনে ডিকি ডেটন খুব হাসতে লাগল। এই হাসি সরল সুন্দর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলল, যাক, আমার বাজানো সার্থক, আসলে তুমি সবই ধরতে পেরেছ, আর আরো কি মনে হচ্ছে জানো? ···মনে হচ্ছে এখন অন্তত তুমি বঢ়হংসিকার থেকে মালবীকেই বেশি পছন্দ করছ।

ভিতরটা টান-টান হয়ে উঠল একটু। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক আমি কি একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেললাম? নিজেকে গোটানো দরকার। রাশ টেনে ধরা দরকার। কিন্তু ভিতর থেকে সে-রকম কোনো তাগিদ অনুভব করছি না। মনে হল, নিজেকে নিয়ে ভিতরে ভিতরে আমি যেন ক্লান্ত, স্রোতের বিরুদ্ধে এত না যুঝে, একটু গা ছেড়ে দিলে কি হয়···।

হাসি মুখেই পাথর ছেড়ে উঠলাম, বললাম, আমার পছন্দের খুব একটা রকম ফের নেই···তবে এ কথা থেকে তোমার মন বোঝা যাচ্ছে বটে।

ডিকিও উঠে পড়ল।—এরই মধ্যে যাবে?

—এরই মধ্যে কি, বিকেলের আলোয় টান ধরেছে খেয়াল আছে

চার দিকে চেয়ে কতটা টান ধরেছে দেখে নিয়ে ডিকি সখেদে বলল, আমার শত্রুতা করতে কেউ ছাড়ে না, এরই মধ্যে বিকেল শেষ হওয়ার

কি দরকার ছিল। আবার কবে দেখা হচ্ছে ?

হেসেই জবাব দিলাম, কি করে বলব।

—বিকেলে অফিস ছুটির পর যদি তোমার বাড়ি যাই···রাগ করবে ?

বাসনা বা ইচ্ছের এই সহজ অভিব্যক্তি তেমন খারাপ লাগছে না। হেসে জবাব দিলাম রাগ কেন করব, আমাকে না পাও মাকে পাবে।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, ও বাবা···। সামলে নিল, তোমার মায়ের নিন্দে করছি না, কিন্তু ফের তাঁর মুখোমুখি হলে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।···তোমাকে না পেলে মানে বিকেলে সব দিন তুমি বাড়ি থাকো না ?

—না, এ-পর্যন্ত না হোক ও-ধারে কালজানির দিকে প্রায়ই আসি, নয়তো গ্র্যাণ্ডি বা মীনা মাসির বাড়ি যাই।

কালজানির ধারে প্রায়ই আসি শুনে মুখখানা খুশিতে টইটুম্বুর। কিন্তু প্রায়ই আমি কেন বলে ফেললাম সেটা বোধহয় নিজের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। স্কুল থাকলে কমই আসা হয়, তবে একটু হাঁটা চলার জন্য মাঝে মাঝে আসি এ মিথ্যে নয়। গ্র্যাণ্ডি বা মীনা মাসির বাড়ি যাওয়াটা অবশ্যই সত্যি। তবে তা-ও মায়ের মন মেজাজ আর শরীর বুঝে।

কিন্তু এরপর কালজানির দিকে আসাটা একটু অদৃশ্য তাগিদের মতো হয়ে উঠতে লাগল। এক দিন না এলে ভিতরটা খচখচ করে, চুপচাপ বসে একজন অপেক্ষা করে। আমি এলে দারুণ খুশি। না এলেও অভিযোগ নেই। সুরের জাল কাউকে এমন টানতে পারে জানা ছিল না। ডিকি রাগ-রাগিণীর কত কি জানে ঠিক নেই। সোৎসাহে গল্প করে। রূপ আর মহিমার কথা শোনায়। কখনো একটু আধটু বাজিয়ে মোহড়া দেয়। বিকেলে এলে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন আমার ওঠার তাড়া। ডিকি ধরে রাখতে চায় না, আর একটু বসার জন্য অনুরোধ করে না। চোখে শুধু পরদিনের প্রতীক্ষা উঁকিঝুঁকি দেয়।

রাগ-রাগিণীরা সব যেন তার ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। আমার সব মনে থাকে না। যখন শুনি ভালো লাগে, আবার ভুলে যাই। অন্য কোনো কথা হয়ই না প্রায়। ডিকি আমাকে তার সুরের জগতে টেনে নিয়ে যায়। পরের সপ্তাহেও মাঝখানে একদিন হঠাৎ ছুটি পেয়ে গেলাম। দুপুর গড়াবার আগে এসে দেখি যা ভাবছিলাম তাই। ডিকি ডেটন সেই পাথরটার ওপর বসে কারো আসার পথ চেয়ে আছে যেন। কাছে এসে গম্ভীর মুখে বললাম, ফের অফিস কামাই।

—কামাই কোথায়, হাফ ডে করেছি—

রাগের ভান করে বললাম, এরপর শুধু রোববার ছাড়া আমি আর এদিকে আসছি না।

চোখে চোখ রেখে ডিকি টিপটিপ হাসতে লাগল। অন্য দিনের মতো ব্যস্ত হয়ে আমাকে বসতে বলল না। পকেট থেকে বাঁশি বার করে নিজেরই ভিতর থেকে খানিকটা সুর টেনে তুলল যেন। অপলক দু'চোখ আমার মুখের ওপর।

বাঁশি থামিয়ে হাসতে লাগল।

—কি ?

টেনে টেনে আবৃত্তির মতো করে বলল, গরজি ঘটা ঘন কারেরি কারে—

—তার মানে ?

তেমনি চোখে চোখ রেখে বলল, আকাশটা চারদিক থেকে কি ভীষণ কালোয় ছেয়ে গেল···

ঠিক না বুঝে চারদিকে তাকালাম একবার।—কোথায়, নীল আকাশ তকতক করছে।

জবাব না দিয়ে ডিকি তেমনি বলে গেল, পাওস রুড আয়ো, দুলহন মন ভায়ো—

—এর মানে ?

—এর মানে, যত বর্ষাক না কেন, পাওয়ার ঋতুও তো এসেইছে··· দুলহন মন ভায়ো···প্রিয়কে যে মনে ভালো লেগেছে।

ডিকির দু'চোখের চাউনি একটা স্পর্শের মতো লাগছে হঠাৎ, দূরে ঠেলে দেবার মতো নয়, আবার টেনে নিতেও ভয়। বাঁশিটা মুখে ঠেকিয়ে আবার গভীর দরদে ওই সুরটুকু বাজালো।

হাসি মুখে এবারে পাথরটায় বসে পড়লাম। বললাম, এই কঠিন বাস্তব দুনিয়ায় নিজের একটা জগৎ নিয়ে আছ বেশ—কি বাজালে এটা ?

ডিকির ঠোঁটে সামান্য হাসি।—এর নাম মেঘ।...কিন্তু প্রিয়কে যতই ভালো লাগুক, পরিণামে বিচ্ছেদ...প্রিয়কে ভালো লাগলেও পাওয়া শেষ পর্যন্ত কপালে নেই।

এমন কথায় অভিভূত হবার মতো ভেতরটা কচি কাঁচা নয় আব। কিন্তু তবু খারাপ লাগছে না। ঠাট্টার সুরেই বললাম, কেন, তোমার প্রাণের জিনিস তো বেহাগ—যতই মাঝ নদীতে ডোবো—হাত ধরার জন্য কেউ না কেউ আসবেই—

ঠোঁটে বিমনা হাসি দেখা গেল। অল্প অল্প মাথা নাড়ল। বেহাগ আমার প্রাণের জিনিস নয়, প্রাণের বিশ্বাস। প্রাণের জিনিস হল ললিত—যে রাগ জীবনের সব কিছুর মধ্যে লালিত্য খোঁজে, সব রুক্ষতা ঢেকে দিতে চায়।...আমি রূপ খুঁজি, সুন্দর খুঁজি।

আমি একটু চমকে উঠলাম কেন ? ও কি কোনভাবে আমার মনেব কথা বুকের তলার কথা জানতে পেরেছে ? আমাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাবার জন্যেই ঠিক এই কথাগুলো। ভালো করে তাকালাম। এই মুখে কোনো ছলনা দেখলাম না।

আমার ভিতরে একটা অজানা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে বুঝতে পারি। একটা মন সব কিছুর ওপর বিমুখ হয়ে আছে এখনো, আর একটা মন যেন তার থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে চাইছে। নিজেকে কেন বোঝা দরকার, যাচাই করে নেওয়া দরকার ভাবছি জানি না। দু'দিন পরের রবিবারে আর গেলাম না। বিকেলে মীনা মাসির ওখানে চলে গেলাম। আমাকে দেখেই মীনা মাসির উৎসুক চোখ।—নতুন নাটক জমছে ?

কথাটার মধ্যে খোঁচা ছিল না, তবু নতুন শব্দটা খচ করে কানে

বাজল। ওতে পুরনো বাতিল করার ইঙ্গিত আছে মনে হল। সাদা মুখ করেই বললাম, জমাটি নাটক দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছ মনে হচ্ছে ?

মীনা মাসি জবাব দিল, নাটক তুই জমিয়ে তুললে আমরা উদগ্রীব হব না কেন—তোর আংকল বলছিল, বিকেলের দিকে তুই রোজই প্রায় বেরোচ্ছিস অথচ জেরি সাহেবের রাগ তোর ইদানীং দেখাই পাওয়া যায় না।···কোথায় যাস ?

সাদামাটা জবাব দিলাম, বাঁশি শুনতে।

—বাঃ, আসর কোথায় বসে ?

—কেন, তুমি যাবে ?

—নাঃ, আপাতত এই আসরে বাড়তি লোক না থাকাই ভালো ···বাঁশির মতো বাঁশি বাজলেই মরণ, প্রার্থনা করি তোর সেই মরণ তড়িঘড়ি এগিয়ে আসুক।

মীনা মাসির কাছ থেকে বেরিয়ে গ্র্যাণ্ডির ওখানে যাব ভাবলাম। তার পরেই সে ইচ্ছা বাতিল করলাম। রবিবারে আমাকে না পেয়ে ডিকি নির্ঘাৎ সেখানেই যাবে।

রবিবারের পর ফিরে আবার রবিবার না আসা পর্যন্ত একদিনও আর কালজানির দিকে পা বাড়াইনি। খুব নির্লিপ্তভাবে নিজেকে যাচাই করার এটাই যেন একমাত্র উপায়।···ডিকি ডেটনের সঙ্গ খারাপ লাগে না, কিন্তু এ ক'দিনের অদর্শনে ভিতরটা খুব একটা উন্মুখও হয়ে উঠল না। আর একটা কারণেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এই ন'দশ দিনের মধ্যে ডিকি কোনো অছিলায় আমার দেখা পেতে চেষ্টা করেনি। স্কুলের রাস্তায় আসেনি, বাড়িতেও না।

পরের রবিবারে বেশ আত্মস্থ চিত্তেই কালজানির সেই নালা আর জঙ্গলের দিকে গেছি। বিকেল তখন সাড়ে তিনটে হবে। পাথরের ওপর কনুইএ ঠেস দিয়ে আধা আধি বসে। আমাকে দেখে সোজা হল। কাছে আসতে মনে হল মুখের দিকে চেয়ে ভিতরের মেজাজ বুঝতে চেষ্টা করছে। আরো কাছে এগিয়ে দাঁড়াতে জিগ্যেস করল,

গেল রবিবারের আগের রবিবারে এখানে বসে গল্প করার সময় আমি কি কোনো অপরাধ করেছিলাম।

হাল্কা চোখে তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বললাম, অতদিনের কথা মনে করতে পারছি না···কেন?

ডিকি বলল, তাহলে তেমন কিছু অপরাধ করিনি নিশ্চয়···তবু এ-রকম শাস্তি কেন? বোসো—

সেই অস্বস্তিটা গুটিগুটি এগোচ্ছে। পাশে বসে হেসেই তাকালাম। —শাস্তি মানে এ ক'দিন এদিকে আসিনি বলে?

ডিকি দু'চোখ টান করে বলল, ক'দিন! দশ-দশটা দিন, আমার মনে হচ্ছিল দশটা বছর—

তেমনি হালকা করেই বললাম, দশটা দিন না দেখলে সেটা যদি শাস্তির মতো হয় তাহলে তো ভাবনার কথা—

—দারুণ ভাবনার কথা, আর সে-জন্যেই এ-ভাবনার এসপার ওসপার হওয়া দরকার। খপ করে এই প্রথম আমার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে চোখে চোখ রেখে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—কি? আমার গলার স্বর একটু নীরস কিনা জানি না।

—তোমার আপত্তি হয় কিনা দেখছি।

রয় জারভিসের ছোঁয়া কি আজও আমার সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরে বসে আছে। নইলে এই স্পর্শে ভেতরটা বিমুখ হয়ে উঠতে চাইছে কেন। সোজা চেয়ে আছি, অল্প অল্প হাসছিও হয়তো। কঠিন হওয়ার দরকার হলে আমি চোখ মুখ কঠিন করে তুলতে চাই না। বললাম, ধরো এটুকুতে আপত্তি হল না, তারপর···?

—তার পরের কথা তুমি জানো। তোমার গ্র্যাণ্ডি আজ সকালে আমার মাথাটা বিগড়েই দিয়েছি—আমাকে বেল্লিক পর্যন্ত বলেছে!

গ্র্যাণ্ডির নাম করতে আমি সচকিত একটু। চেয়ে আছি। শুরু যখন করেছে বেল্লিক বলার কারণও নিজেই বলবে। বলল।—আজ সকালে তার কাছে গিয়ে একটু কাব্য করে আক্ষেপ করছিলাম।···ওই কথাই বলছিলাম যে মনে হচ্ছে দশ দিন নয়, মনে হচ্ছে দশ বছর

তোমাকে দেখিনা।...আর তারপর বলেছিলাম, এই না-দেখাটা দারুণ যন্ত্রণার মতো আবার সেই যন্ত্রণার ফাঁকে ফাঁকে কোথায় যেন একটু আনন্দও আছে। তাই শুনে তোমার গ্র্যাণ্ডি আমাকে পিটপিট করে দেখল খানিক, তারপরেই বলে উঠল, তুমি একটা আস্ত বেল্লিক, ওই কাব্য করেই ক্ষিদে মেটাওগে যাও—আর তারপর এখানে না এসে একেবারে জাহান্নমে যাও!

আমার হাতটা তখনো ডিকির দু'হাতের মধ্যে। সে একটু চেপেই ধরে আছে, আমিও টেনে নিইনি। পরের টুকু শুনলাম। গ্র্যাণ্ডি তাকে বলেছে, এ-ভাবে বাতাসে ভেসে না বেড়িয়ে সোজা চড়াও হয়ে জেনে বুঝে নাও শেইলার মনে কি আছে—যদি দেখো আশা আছে তাহলে একভাবে চলো—আর যদি বোঝো নেই—তাহলে দশ দিনকে ঠিক দশদিন ভাবার মতো রাস্তা বার করে নাও—এসপার কি ওসপার! হাতের চাপ আর একটু বাড়িয়ে ডিকি বলল, গ্র্যাণ্ডির ওই কথা শুনেই আমি আজ মরিয়া হয়ে উঠেছি। তুমিও সোজা জবাব দাও, তুমি শুধু আমার সুরের জগতে থাকবে না আমার জীবনে আসবে?

দশদিন বাদের দেখায় এই পরিস্থিতিতে পড়ব না। মনে হচ্ছে আমি নয়, জারভিসের স্মৃতিই যেন ওই হাত দুটোকে ঠেলে সরাতে চাইছে। ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিলাম, তোমাকে দেখেই হয়তো গ্র্যাণ্ডিব এই পাগলামির কথা। তোমার সুরের জগতটাই শুধু আমি একটু আধটু চিনেছি, ভালোই লাগে।...তা বলে তোমাকে আমি কতটুকু জানি?

এই সামান্য কথায় ডিকির মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখলাম। আচমকা কেউ যেন ঘা বসিয়েছে একটা। হাত টেনে নিতে হল না। নিজেই ছেড়ে দিল। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, এই সুরের জগতে আমাকে যতটুকু দেখছ তার বাইরে আমার খুব একটা অস্তিত্ব নেই শীলা। আমার পিছনের যে অতীত সেটা যেমন দুঃখের তেমনি ব্যথার আর তেমনি অপমানের। সেই অতীত আমাকে কিচ্ছু দেয়নি, কেবল আমার অস্তিত্ব গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

কিন্তু বিশ্বাস করতে পারো সেই অতীত নিয়ে আমার কোনো অপরাধ বোধ নেই, কোনো লজ্জাও না। এই সুরের জগতে ঢুকে পড়তে পেরে আমি প্রাণে বেঁচেছি, আর হাত বাড়িয়ে চাঁদের নাগাল পাওয়ার মতো আশা করেছিলাম এই সুরের জগৎ তোমাকেও আমার কাছে এনে দিয়েছে।

আমি নির্বাক। এই গভীর কথাগুলোও কানের ভিতর দিয়ে মনের গভীরে পৌঁছচ্ছে না। নাড়া দিচ্ছে না। খানিক অপেক্ষা করে ডিকি আবার বলল, পিছনের সব আমি পিছনেই ফেলে রাখতে চাইছি, রাখতে চাইছি, রাখতে চেষ্টা করছি। আমার মন বলছে, তুমিও তাই করলে সুখী হবে।...রয় জারভিস তোমাকে ছেড়ে গেছে সেটা আমার ভাগ্য কিনা জানি না, কিন্তু তার যে কত বড় দুর্ভাগ্য সেটা আমি পুরুষ বলেই অনুভব করতে পারি। কথা দিতে পারি তার কথা টেনে আমি তোমাকে কোনদিন এতটুকু বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলব না—

নিজের কানেই নিজের গলা তীক্ষ্ণ শোনালো একটু। বলে উঠলাম, তোমার কাছ থেকে এ আশ্বাস কে শুনতে চেয়েছে—রয় জারভিসের কথাই বা তোমাকে কে বলেছে? গ্র্যাণ্ডি?

হকচকিয়ে গেল একটু। এ-রকম ছন্দপতনও আশা করেনি হয়তো। খুব অনুনয়ের সুরে বলল, রাগ কোরো না, আমার মনে হয়েছিল নিজের কথা যেমন বললাম, তেমনি এ-কথাও তোমাকে বলা দরকার। আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি।...না, গ্র্যাণ্ডি কিছু বলেনি, এখানকার অনেক ছেলেই তোমার অনেক কথা জানে, তোমার সম্পর্কে অনেক কথা বলে। আমাকে তোমার দিকে ঝুঁকতে দেখে তাদের কেউ কেউ রয় জারভিসের কথা বলে আমাকে সমঝে দিতে চেয়েছে—হয়তো তারা অনেক বাজে কথা বলেছে, এখন ওদের সঙ্গও ভালো লাগে না বলে অনেকেরই আমার ওপর রাগ।

রাগ করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু ভিতরের একটা ক্ষোভের উৎসর মুখ থেকে কেউ যেন ঢাকনা খুলে দিয়েছে। খানিক গুম হয়ে

থেকে নিজেকে আত্মস্থ করতে চেষ্টা করলাম। তারপর নির্লিপ্ত সুরেই বললাম, ডিকি, তোমার আমার দু'জনেরই পিছনের কথা পিছনেই থাক—ও-সব সামনে টেনে আনার মতো পরিস্থিতি এখনো কিছু হয়নি। কিন্তু তোমার কথার জবাব আমি এক্ষুনি দিতে পারছি না, কারণ ঠিক ঠিক জবাব আমি নিজেই এখনো জানি না। জানতে পারলে তোমাকে খোলাখুলি বলতে আমার আপত্তি হবে না—

ডিকি ব্যগ্র মুখে চেয়ে রইল একটু। তারপর বলল, জানতে পারলে সে-জবাব যদি আমার আশা-ভঙ্গের কারণ হয় তবু আমার সুরের জগৎ থেকে তুমি সরে যাবে না তো? সেখানে তোমাকে পাব তো?

শুনে মায়াই হল এবারে। তবু প্রশ্রয়ের দিকে এগোলাম না। হেসেই জবাব দিলাম, তখন দশ দিনের না দেখাটা যদি তোমার দশ বছরের মতো শাস্তি না হয়ে ওঠে তাহলে সরে যাব না—পাবে।

…এর তিন দিনের মধ্যে শালজুড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গেল। জায়গাটা ছোট বলে তার চমকটা বড়। আর তার ফলে আমার বিচার বিবেচনা যেমন শেষ, ডিকি ডেটনের প্রতীক্ষারও তেমনি শেষ।

যাদের কেন্দ্র করে এই চমক তারা একটা মণিপুরী নাচের পার্টি। পার্টির সর্বেসর্বা লোকটি তার নাম দেওকী নায়ক। জাতে বৈষ্ণব। পোশাক-আশাক আচার আচরণে অতি আধুনিক—পুরোদস্তুর সাহেব। কিন্তু জাতছুট নয় তা বলে। ফর্সা কপালে চওড়া তিলক, নাকে রসকলি। দিল-দরিয়া হাসি-খুশি মানুষ। এখন বছর বিয়াল্লিশ হবে বয়েস। বারো তেরো বছর হয়ে গেল প্রায় ফি বছর তার নাচের পার্টি নিয়ে এই শীতের মৌসুমে শালজুড়িতে আসে, নানা জায়গা হয়ে কলকাতা পর্যন্ত যায়। কোথাও দু'দিন কোথাও বা তিন চার দিন নাচের আসর বসে। দেওকী নায়েকের এটা পেশা তো বটেই, নেশাও। অন্য কোনো কাজ ভালো লাগে না। নিজেই হেসে হেসে বলে, আই অ্যাম ডেডিকেটেড টু দিস আর্ট। তার দলের আর্টিস্টদের

দেখলেও বোঝা যায় এই.ব্যবসাটি থেকে আয় প্রচুর। তা না হলে এত জাঁক-জমকের সঙ্গে সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়।

এই নাচিয়ে দলে চার পাঁচটি সুন্দরী মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে সকলের সেরা যে তার নাম রাঙ্কী। সে মণিপুরেরই মেয়ে। মেয়ে নয়তো যেন আগুনের ফুলকি একখানা। যেমন রূপ, তেমনি তার নাচ। হাসলে মুক্তোর মতো দাঁতের সারি ঝিকমিক করে ওঠে। নিজেদের ভাষা ছেড়ে টগবগ করে ইংরেজি বলে, হিন্দী বলে। আমার ধারণা দেওকীর এত পসার রাঙ্কীর দৌলতে। ওর মতো মেয়ে সঙ্গে থাকলে লক্ষ্মী সেধে এসে পায়ে শিকল পরবে।

রাঙ্কী আমারই বয়সী হবে। কিছু ছোটও হতে পারে। এত বার আসার ফলে পুরুষদের সকলের সঙ্গেই যেমন দেওকী নায়েকের ভাব-সাব হয়ে গেছে মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদেরও তেমনি হয়েছে। এর মধ্যে রাঙ্কীর সঙ্গে হয়তো আমারই একটু বেশি খাতির হয়ে গেছল। এখানে এলে সে প্রত্যেক বারই আমাদের বাংলোয় আসে, গল্প করে, যা খেতে দিই আনন্দ করে খায়। নাচের সময় বোঝা যায় না, কিন্তু মেয়েটা এমনিতে একটু অশান্ত ছটফটে গোছের।

দলের সঙ্গে প্রত্যেকবার দেওকী নায়েকের স্ত্রী-ও আসে। স্বামী কর্তা আর স্ত্রী কর্ত্রী। নাম লছমী নায়েক। তার হাবভাব স্বামীর মতো নয়। শান্ত ঠাণ্ডা গোছের মহিলা। দেখতেও তেমন সুশ্রী নয়। এই পার্টির কর্ত্রী বলে মনেই হয় না। কিন্তু রাঙ্কী বলে মিসেস নায়েক না থাকলে কবেই দল ভেসে যেত, তাদের বস্‌ তো একখানা রোলিং স্টোন্‌—মিসেস নায়েকের সব-দিকে আর সকলের দিকে কড়া চোখ। রাঙ্কীর জিভের কোনো লাগাম নেই। পর পর চার বছর এই শালজুড়িতে আসার ফলে আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে যেতে নিজের কথা কিছু কিছু বলেছিল। লছমী নায়েক খুব ভালো গান করত। নিজের গানের স্কুলে ছোট মেয়েদের গান শেখাত। বাচ্চা বয়েস থেকে রাঙ্কী তার গানের ছাত্রী ছিল। সেই স্কুলে নাচও শিখত। স্ত্রীর দৌলতেই দেওকী নায়েক সেই নাচ গানের স্কুল করতে পেরেছিল। রাঙ্কীর

এগারো বছর বয়সে তার মা সাপের কামড়ে মারা যায়, আর বাবা থাইসিসে মারা যায় ওর পনের বছর বয়সে। ব্যস, এর পর বিশ্বাসের লোক যারা ছিল তারাই ওর বাবার ব্যবসার সব লুটেপুটে খেল, আর রাঙ্কীকে নিয়েও তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি। লছমী নায়েক ওকে টেনে না নিয়ে এলে এত দিনে ওই হায়নার দল তার হাড়-মাংসসুদ্ধু চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। রাঙ্কী হেসে হেসে বলেছিল, পুরুষ মানুষের মতো লোভী আর হাড়বজ্জাত ছুনিয়ায় নেই—বুঝলে? সর্বদা আমাকে কোমরে কুকঠ গুঁজে রাখতে হত।

আমি সাদা মুখ করে বলেছিলাম, তোমার বাসুদেব কি তাহলে পুরুষ মানুষ নয়?

রাঙ্কীর খিলখিল হাসি। তারপর চটুল জবাব, হুঁঃ, ওটা আবার পুরুষ, ও তো মেনি বেড়াল একটা—তবে কেউ ওকে আমার কোল থেকে সরাতে চাইলে ফোঁস করে আঁচড়ে কামড়ে দিতে চায়।

বাসুদেব ওর নাচের দোসর। বিশেষ করে এই জুড়ির নাচ দেখিয়েই দেওকী নায়েকের টাকার থলে ফুলে ফেঁপে উঠছে। এই জুড়ির নাচ দেখিয়েই প্রোগ্রাম শুরু হয়, আর শেষও হয় এই জুড়ির নাচ দিয়েই। ফলে মাঝে আর যারা তারা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তবে প্রোগ্রামের মাঝে মাঝেও ওর বিচ্ছিন্ন ভূমিকা থাকে, তা-ও খারাপ লাগে না।

খুব ফর্সা নয়, কিন্তু ভারী সুন্দর আর মিষ্টি চেহারা ছেলেটার। ছেলেটা বলছি কারণ দেখতে একেবারে ছেলেমানুষ। রাঙ্কী বলে বাসুদেব তার থেকে তিন বছরের বড়, কিন্তু ছেলেটার কচি-কাঁচা মুখ দেখে সমবয়সীই মনে হয় ছুজনকে। নিজে মেয়ে হয়ে বলতে পারি, লম্বা দোহারা বাসুদেবের ঠোঁটের হাসি আর টানা-টানা ডাগর চোখের সেই গভীর কটাক্ষ দেখে অনেক সেয়ানা মেয়েরও মনে হতে পারে পঞ্চশরের তূণের হদিস এ ছেলের ভালোই জানা আছে। অন্তত রাঙ্কী-আর বাসুদেব জুটির নাচের সময় এ-কথা বার বার মনে আসবেই।

…গেল বছরটা দেওকী নায়কের নাচের পার্টি এখানে আসেনি।

তার আগের বারে এসেছিল। সেবারই রাঙ্কী তার মনের কথা আমাকে বলেছিল। বাসুদেবকে ও দারুণ ভালবাসে। তাকেই বিয়ে করবে। মিসেস নায়েকও এটা জানে, তারও সায় আছে। রাঙ্কীর ইচ্ছে বিয়ের পরে বাসুদেবকে নিয়ে নিজের একটা নাচের দল গড়বে। কিন্তু এটা সকলের কাছে গোপন। কারণ, ফাঁস হয়ে গেলে ওদের বস্ চোখে সর্ষে ফুল দেখবে।

শালজুড়ির মতো জায়গায় উৎসব আনন্দের ব্যাপারটা এমনিতেই কম। তাই দেওকী নায়েকের নাচের পার্টি এলে দস্তুর মতো সাড়া পড়ে যায়। এবারে এই পার্টি একটা বছর বাদ দিয়ে এলো বলে এখানকার মানুষের উৎসাহ আরো বেশি। পার্টি এলে চা-বাগানের ক্লাব হাউসে ওঠে। কর্মকর্তারা সানন্দে সেখানেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করে। অসুবিধে কিছু নেই, তিন দিকে বিশাল বিলডিং, সারি সারি অনেক ঘর তো খালিই পড়ে থাকে। একদিকের গোটা কতক ঘর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়! মাঝখানে ফাঁকা লন। সেখানেই স্টেজ বেঁধে নাচের আসর বসে। গেল বারে আসেনি, এবারে তাই দেওকী নায়েককে বলে কয়ে আর বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে তিন দিনের প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শনি রবি সোম এই তিন সন্ধ্যার আসব। কিন্তু পুরুষ আর্টিস্টদের মধ্যমণিটি অর্থাৎ বাসুদেব যে এবারে অনুপস্থিত তা প্রোগ্রাম শুরু হবার আগে পর্যন্ত কেউ জানে না।

শনিবারেও স্কুল ছুটি বলে দুপুরের দিকে ক্লাব হাউসে রাঙ্কীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বছরে ওই এক আধ দিনই হয়তো ক্লাব হাউসে আসি। রাঙ্কীর দেখা পেলাম না। একজন জানান দিল, তার শরীর ভালো নেই, তাই সে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে বিশ্রাম করছে, হয়তো ঘুমুচ্ছে। ফেরার আগে মুখোমুখি দেওকী নায়েকের সঙ্গে দেখা। সপ্রতিভ ভদ্রলোক আধখানা ঝুঁকে আমার উদ্দেশে বো করল। নমস্কার জানিয়ে হাসি মুখে তার কুশল জিগ্যেস করলাম, বললাম, রাঙ্কীর খোঁজে এসেছিলাম, শরীর ভালো নেই বলে সে বিশ্রাম করছে শুনলাম—

দেওকী নায়েক মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, আসার ধকল গেছে, তাছাড়া রাতে অতবড় প্রোগ্রাম, তাই বিশ্রাম নিচ্ছে।

—মিসেস নায়েক ভালো আছেন? তিনি কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের বিমর্ষ মুখ। জবাব দিল, মিসেস নায়েক এক বছর হল মারা গেছেন…সেই জন্যই গত বছর কোথাও আর প্রোগ্রাম করাই হল না।

মহিলার বেশ ভালো স্বাস্থ্য, বয়েসও এমন কিছুই নয়। এর মধ্যেই মারা গেল শুনে খারাপ লাগল। রাঙ্কী তাকে সত্যি ভালবাসত। আসার সময় পুরুষ আর্টিস্টদের মধ্যে বাসুদেবকে দেখলাম না। ভাবলাম সে-ও হয়তো বিশ্রামই করছে।

রাতের আসরে আমি আর বাবা এসেছি। এক মা ছাড়া কেউ বোধহয় আর ঘরে বসে নেই। বোতল বাতিল করে মা আসতে রাজি নয়। আমি আর মীনা মাসি পাশাপাশি বসেছি, অন্য দিকের বো-তে বাবা আর আংকল ডাকুয়া। মীনা মাসি ফিসফিস করে বলল, তোর বাঁশিওয়ালাকে দেখছি না, তার তো এদিকেই এসে ঘুরঘুর করার কথা।

ক্লাব হাউসের অনেক ছেলের চোখই আমার দিকে। কিন্তু তাদের মধ্যে ডিকি ডেটনকে দেখছি না বটে।

মীনা মাসি আবার ঠাট্টা করল, রাত জেগে বাঁশি বাজায় শুনেছি, আর অন্য ছেলেগুলো অতিষ্ঠ হয়—হয়তো এসময় ঘুমিয়ে নিচ্ছে…একবার ঘরে গিয়ে দেখে আয় না।

জবাব দিলাম, আমার দায় পড়েছে…তাছাড়া সে কোন্ ঘরে থাকে আমি জেনে বসে আছি।

মীনা মাসি হাসি মুখে অবাক হবার ভান করল, বলল, কোন্ ঘরে থাকে এখনো তা পর্যন্ত জানিস না—তাহলে তুই জানিস কি?

ঘন্টি বাজল। স্টেজের পর্দা উঠল। দেওকী নায়েক এসে আধখানা সামনে ঝুঁকে সকল দর্শকের উদ্দেশে অভিবাদন জানালো, শুভেচ্ছা প্রার্থনা করল। সেই সঙ্গে শোক সংবাদও জানালো। তার স্ত্রী অর্থাৎ এই ডান্স পার্টির কর্ত্রী লছমী নায়েক অকালে মারা যাবার

ফলেই সে গতবছর দল নিয়ে এসে সকলকে আনন্দ দেবার সুযোগ পায়নি।

নাচ শুরু হতে শুধু আমরা নয়, সমবেত সকলেই অবাক! রাঙ্কী চোখ ধাঁধাঁনো সাজসজ্জা করে নাচতে নাচতে যেমন স্টেজে ঢোকে, তেমনি ঢুকল। কিন্তু সকলে অবাক তার সঙ্গে আর যার আসার কথা তাকে দেখে। বাসুদেব নয় তার বদলে আর একজন। এও মোটামুটি সুশ্রী কিন্তু বাসুদেবের ধারে কাছে নয়।

একটু বাদে নাচের মধ্যেই দর্শকের আসন থেকে মিলিত গলার চিৎকার উঠল, বাসুদেব—বাসুদেব! বাসুদেবকে চাই!

নাচে ছেদ পড়ল। দেওকী নায়েক আবার হন্তদন্ত হয়ে স্টেজে এলো। দু'হাত জোড় করে জানান দিল, খুবই দুঃখের কথা যে বাসুদেব এই দল ছেড়ে চলে গেছে—আসলে সে নাচ ছেড়ে ব্যবসা করছে—কিন্তু তার বদলে এখন যে রাঙ্কীর মতো আর্টিস্টের সঙ্গে নাচতে এসেছে বাসুদেবের থেকে সে কোনভাবে কম যায় না—দরদী দর্শকরা ধৈর্য ধরে দেখলে খুশি হবেন তাতে কোনো ভুল নেই।

খবরটা কারোই ভালো লাগল না। আমার তো না-ই। কিন্তু কি আর করা যাবে, ধৈর্য ধরে চুপচাপ দেখতে লাগলাম। চোখের ভুল কি ভাবনার ভুল জানি না, একাগ্র মনে নাচ দেখতে দেখতে মনে হল, বাসুদেবের সঙ্গে নাচার সময় যেমন দেখতাম, রাঙ্কীর মধ্যে সেই উত্তাল উচ্ছল প্রাণের জোয়ারে কোথায় যেন ভাঁটা পড়েছে। ছেলেটাও নাচছে মন্দ না, কিন্তু নাচ যেন সে রকম জমছে না। আরো মনে হল নাচের মধ্যেই রাঙ্কীর যেন কিছু অসহিষ্ণু ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে, তার জুটির মুখের ওপর বার বার সেই ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে।

বিমনা হয়ে পড়ছিলাম। রাঙ্কি মেয়েটা একটু প্রগলভ বটে কিন্তু তার ভেতরটা সাদাসিধে। বাসুদেবকে সে কত যে ভালোবাসে সেটা আমার বুঝতে সময় লাগেনি। তার সাধ ছিল বিয়ের পর বাসুদেবকে নিয়ে নিজে নাচের দল গড়বে। লছমী নায়েকেরও নাকি তাতে সায় ছিল। কিন্তু এর মধ্যে লছমী নায়েক অকালে মারা গেল, বাসুদেব এই নাচের

দল ছেড়ে ব্যবসায় ঢুকল…। কোনটাই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমার মনে খটকা বাঁধল।…বাসুদের নাচের দল ছেড়ে অন্য ব্যবসা করতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওদের ভালবাসারও কি শেষ হয়ে গেল! অন্তত রাঙ্কীর নাচ আর মুখের অভিব্যক্তি দেখে আমার বার বার মনে হতে লাগল, সাদা মুখ করে দেওকী নায়েক যা বলে গেল সেটুকুই সব নয়।

যাই হোক, এ আসরে মেয়ের থেকে পুরুষ দর্শক দ্বিগুণেরও বেশি। আর চোখের ভোজে তাদের জমিয়ে রাখা রাঙ্কীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। বাসুদের নেই বলেই হয়তো দেওকী নায়েক রাঙ্কীর প্রোগ্রাম বাড়িয়েছে। একক নাচ ছাড়াও আরো অনেক বারই অন্য আর্টিস্টদের সঙ্গে স্টেজে আসতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমার মেয়ের চোখ। তার মধ্যে একমাত্র আমিই বোধহয় রাঙ্কীর সঙ্গে বাসুদেবের সম্পর্কটা জানি। রাঙ্কীর দিকে চেয়ে চেয়ে আরো বিশেষ মনোযোগে তার নাচ লক্ষ্য করে আমার চোখে কিছু ব্যতিক্রম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাঙ্কী সেই নাচ নাচতে পারছে না বা নাচছে না। সেই স্বতঃস্ফূর্ত রাগ অভিমান আর খুশির অভিব্যক্তিতে ঘাটতি দেখছি। তার থেকে ক্ষোভ আর অসহিষ্ণুতাই বেশি চোখে পড়ছে।

কিন্তু আমাদের সকলের জন্য এর থেকে ঢের ঢের বড় নাটক অপেক্ষা করছিল। নাচের আসর শেষ হতে তখনো ঘণ্টাখানেক বাকি। হঠাৎ কিছু একটা ঘটে গেল। পিছন দিক থেকে একটা গুঞ্জন উঠল। দর্শকরা সচকিত হয়ে উঠতে লাগল। সামনে তাকিয়ে দেখি স্টেজ ফাঁকা। এদিকে আসন ছেড়ে দর্শকরা উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। মীনা মাসি বার বার বলতে লাগল, কি হল—কি আবার হল?

তারপরেই লক্ষ্য করলাম সামনের লোক ঠেলে মনোহর ডাকুয়া তাড়াতাড়ি বেরুতে চেষ্টা করছে। তার দায়িত্ব আছে, এই ফাংশানে চা-বাগানের তরফ থেকে সে একজন বড় মুরুব্বি। একটু বাদে লোকের মুখে মুখে একটাই শব্দ বার বার কানে ভেসে এলো—পুলিশ! পুলিশ পুলিশ পুলিশ পুলিশ!

বেশির ভাগ মানুষ আরো বিমূঢ়। কোথাকার পুলিশ? কেন পুলিশ? নাচের আসরে এই চা-বাগানের গেস্ট হাউসে পুলিশ কেন?

মিনিট পাঁচ সাত বাদে মনোহর ডাকুয়া হন্তদন্ত আমাদের বলে গেল, খুব গণ্ডগোলের ব্যাপার, দু'ট্রাক বোঝাই পুলিশ গেস্ট হাউসে চড়াও হয়ে দেওকী নায়েকের দল-বল ঘিরে ফেলেছে, অফিসাররা ওদের ঘর সার্চ করছে—ফাংশান হয়ে গেলে—তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো।

চলে গেল। কেউ কিছু বুঝছে না বলেই উত্তেজনা বাড়ছে। এই শালজুড়িতে একসঙ্গে পাঁচজন পুলিশ দেখা যায় না, সেখানে দু'ট্রাক বোঝাই পুলিশ গেস্ট হাউসে চড়াও হয়েছে—তাজ্জব ব্যাপার বইকি। হুড়োহুড়ি চেঁচামিচি ছোটাছুটি বাড়ছে। খানিক বাদে বাবা এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো। বলল, এখন বেরুনো যাবে না, পুলিশ ক্লাব হাউস থেকে বেরুনোর সব পথ আগলে আছে। ট্রাক বোঝাই পুলিশ এসেছে শিলিগুড়ি থেকে।

ক্লাব হাউস থেকে বেরুনোর সব পথ আগলে থাকা সহজ নয় খুব, সারি সারি অনেক ঘরের দরজা খুলেও রাস্তায় নেমে পড়া যায়, আর তারপরেই জঙ্গল। কেউ পালাতে চাইলে আটকানো শক্ত।

মনোহর ডাকুয়া প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে ফিরল। আমরা তখন ক্লাব হাউসের এক দিকের দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে দু'জন পুলিশ অফিসার। তাদের কোমরে রিভলভার গোঁজা। মনোহর ডাকুয়া আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে তাদের একজন আমাকে জিগ্যেস করল, এই নাচের দলের স্টার অ্যাট্রাকশান ওই রাঙ্কী মেয়েটাকে আপনি চেনেন শুনলাম?

প্রশ্ন শুনে মনে মনে ভেবাচাকা খেয়ে গেলাম। জবাব দিলাম, অনেক বছর ধরে এখানে আসছে···সকলেই চেনে।

মনোহর ডাকুয়া ব্যাপারটা বোঝাবার মতো করে বলল, তা না, রাঙ্কীকে কোথাও পাওয়া গেল না দেখে এঁরা খোঁজ করছিলেন, সে যেতে পারে ধারে কাছে এমন চেনাজানা কারো বাড়ি আছে কিনা

তাতে দেওকী নায়েকই বলে দিলে, এখানে বাচ্চাদের স্কুলের এক টিচারের বাড়িতেই শুধু রাঙ্কী বার কয়েক গেছে—আর কোথাও না। তাইতে ক্লাব হাউসের একটি ছেলে তোমার নাম করল

সেই পুলিশ অফিসারটিই আবার জিগ্যেস করল, মেয়েটি আপনার বাড়ি যেত ?

বললাম, দু'বার এসেছিল···

—এবারও গেছল ?

—না।

—আপনার বাড়ি এখান থেকে কদ্দূর ?

—মাইল খানেক হবে।

—কোনদিক দিয়ে বেরুতে পারলে আপনার বাড়ি চিনে চলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ?

—একটাই সোজা রাস্তা, চেনা অসম্ভব নয়।

—গেলে রাস্তা দিয়ে যাবে না, জঙ্গল ধরেও যাওয়া যায় তো ?

আমারও মাথাটা গুলিয়েই যাচ্ছে। এই রাতে রাঙ্কী অজানা জঙ্গলে সেঁধিয়ে আমার বাংলোয় পালাতে পারে এমন ভাবনা কারো মাথায় আসে কি করে। মাথা নাড়লাম, যাওয়া যায়।

—চলুন, আমাদের সঙ্গে জিপ আছে, একবার দেখে আসি।

তাদের সঙ্গে আমরা জিপে উঠলাম। বহুলোকের জোড়া জোড়া চোখ আমাদের ছেঁকে ধরেছে। অফিসার ভদ্রলোক দু'জন সামনে, ড্রাইভারকে তারাই হয়তো আস্তে চালাতে নির্দেশ দিয়েছে। আমি আর বাবা পিছনে। বাবা এবার তাদের হয়তো কিছু জিগ্যেস করত, সেটা বুঝেই তার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে চুপ করে থাকতে ইশারা করলাম। কেন করলাম জানি না। আমারও ভেতরটা ধুকধুক করছে কেমন। আদৌ সম্ভব নয়, তবু গিয়ে দেখব না তো রাঙ্কী আমাদের বাংলোর কোথাও বসে আছে!

রাতে দু দু'জন রিভলভার ঝোলানো পুলিস অফিসারকে বাংলোর আনাচ-কানাচ এমন কি পিছনের বাগান পর্যন্ত তল্লাস করতে দেখে

রঙিলা হ্যাঁ। ইশারায় আমি চুপ করে থাকতে বলেছি। মা ঘুমিয়ে পড়েছে বলেই চেঁচামিচি হল না, আর অফিসার দু'জন তাদের কাজ সেরে চলে গেল, বাবাকে বলে গেল, রাতের মধ্যে বা কাল যদি কখনো আসে তক্ষুনি ফোনে যেন ওমুক ফাঁড়িতে সেটা জানানো হয়। দু'কথায় শুধু বলে গেল এই দলটা ড্যান্স পার্টি মোটেই নয়, সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্য এই নাচ গান—আসলে এরা একটা ডেনজারাস স্মাগলারের দল—পুলিশ অনেক বছর ধরে এদের হদিস খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

রাতে ভালো ঘুম হল না। রাঙ্কীর মতো সুন্দর একটা মেয়ে আর এত চমৎকার নাচে—সে কিনা এত বছর ধরে এমন একটা বিপজ্জনক দলের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে এই কাজ করে বেড়াচ্ছে! কতটুকুই বা জানি মেয়েটাকে। তবু বিশ্বাস করতে পারছি না যেন। আরো অবাক ব্যাপার, পাঁচ মিনিট আগেও যে মেয়ে স্টেজে এসে নেচে গেল পুলিস চড়াও হয়েছে জানা মাত্র অজানা অচেনা জায়গায় কোথায় সে উবে যেতে পারে! একমাত্র জঙ্গলে গিয়ে ঢোকা ছাড়া যেখানেই যাক—ওর মতো রূপসী নাচিয়ে মেয়েকে কে না চিনবে? পালিয়ে যাবে কোথায়? থেকে থেকে রাগও হচ্ছিল, যত রূপসী হোক আর যত ভালোই নাচুক এমন একটা গ্যাঙের সঙ্গে যুক্ত যখন পুলিসের হাতে পড়াই উচিত।

পরদিনটা রবিবার। মনোহর ডাকুয়া আর মীনা মাসি খুব ভোরে আমাদের বাংলোয় এসে হাজির। মীনা মাসি বলল, ফোনে আর এসব আলোচনা কতটুকু হবে, তাই চলে এলাম—রাতেই একবার ফোন করে খবর নেব ভেবেছিলাম, তোর আংকল ডিসটার্ব করতে বারণ করল—পুলিস এসে বাংলো সার্চ করল নাকি?

যা করেছে বললাম। মায়ের ঘুম ভাঙতে আরো দেড় দু'ঘণ্টা বাকি। রঙিলাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে তাদের দু'জনকে নিয়ে আমি আর বাবা বারান্দাতেই বসলাম। মনোহর ডাকুয়া এরপর সবিস্তারে ব্যাপারখানা বলল।

মণিপুরের জঙ্গলে প্রচুর গাঁজার গাছ হয়, তাছাড়া গাঁজার চাষও হয়। বাইরে নাচের দল রেখে বছরের পর বছর ধরে দেওকী নায়েক এই গাঁজা চোরাচালানের কারবার চালিয়ে আসছে। ভারতের বহু জায়গায় তার এজেন্ট আছে—সারা বছর ধরে নাচের দল নিয়ে সে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। রাঙ্কীর মতো মেয়ে থাকাতে ড্যান্স প্রোগ্রাম করেও তার ভালোই লাভ হয়, কিন্তু দলকে খুশি রাখার জন্য দরাজ হাতে সে লাভের কড়ি তাদেরই বিলিয়ে দেয়—তার নিজস্ব আসল কারবার এই গাঁজার চোরাই চালান। ওই দলেরই একজন ইনফরমার হয়ে এবারে পুলিশ লেলিয়ে দেয়। সেই ইনফরমারের নাম বাসুদেব। কি নিয়ে বস্‌এর সঙ্গে তার মনোমালিন্য মনোহর ডাকুয়া তা অবশ্য জানে না।

...পুলিশ এসে এবারে দেওকী নায়েককে হাতে নাতে ধরেছে। মেয়েদের আর ছেলেদেরও নাচের পোশাক-আশাকের তিন-তিনটে মস্ত স্টীল ট্রাঙ্ক সার্চ করে পুলিশ ওপরের দিকে শুধু পোশাক পেয়েছে, বাক্সর আধা-আধি পরেই একটা করে স্টীল প্লেট—তার নিচে গাঁজার কলিতে বোঝাই। তিনটে ট্রাঙ্কেই তাই। ধরা পড়েও দেওকী নায়েক অবশ্য বুক ফুলিয়ে সাফাই গেয়েছে, ট্রাঙ্কে গাঁজার অস্তিত্বের কথা সে ঘুণাক্ষরেও জানে না—ওই সব ট্রাঙ্ক তার আর্টিস্ট রাঙ্কী আর বাসুদেবের তত্ত্বাবধানে থাকত। গত সপ্তাহে বাসুদেবকে বিদায় করার ফলে আপাতত শুধু রাঙ্কীর দায়িত্বে ছিল ট্রাঙ্ক তিনটে—এখন দেখা যাচ্ছে আর বোঝা যাচ্ছে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে রাঙ্কী আর বাসুদেব গাঁজার চোরাচালানের ব্যবসা করেছে।

কে কি করছে না করছে পুলিশ সব জেনেই এখানে এসে চড়াও হয়েছে। দলকে দল ট্রাকে তুলে নিয়ে গেছে। শুধু রাঙ্কী নিখোঁজ। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মনোহর ডাকুয়াকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ সমস্ত ক্লাব হাউস এমন কি চাকর বেয়ারাদের ঘর আর ডাইনিং হল্‌ বা হেঁসেলে পর্যন্ত ঢুকেছে। এখন তাদের ধারণা মেয়েটা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়েই কোথাও পালিয়েছে

—এ পরিস্থিতিতে সেটাই সব থেকে সহজ।

বাবা মন্তব্য করল, জঙ্গলে যদি ঢুকে থাকে তবে তার ডেডবডিও সেখানেই পাওয়া যাবে—রাতে একটু ভিতরে ঢুকলে জন্তু জানোয়ারেই মেরে দেবে।

শুনে গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু এমন সুন্দর মেয়েটা এভাবে বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে পারে তা কিছুতেই মনে হচ্ছে না।

বিকেলের দিকে পায়ে পায়ে কালজানির দিকে এলাম। ক্লাব হাউসে গত রাতে এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল অথচ সারাক্ষণের মধ্যেই ওই মূর্তির একবার দেখাও পেলাম না মনে হতে একটু অবাক লাগছিল। আমার সেদিনের স্পষ্ট কথায় হয়তো বা একটু আহত হয়েছে ওর সুরের জগৎ থেকে আমি সরে আসব না এই প্রতিশ্রুতি ওর শেষ প্রত্যাশা না হওয়াই স্বাভাবিক।

দূর থেকে দেখলাম ডিকি ডেটন পাথরে বসে নেই, পাহাড়ী নালার পাশ ঘেঁষে পায়চারি করছে। ডিকি ডেটন ধীর ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, ঢিলেঢালা হাঁটা চলা। কিন্তু দূর থেকে ওকে দেখে আজ আমার কেমন মনে হল ওর ভিতরটা খুব সুস্থির নয়। আমাকে দেখেই সাগ্রহে দশ-বিশ গজ এগিয়ে এলো। চোখে মুখে খুশি উপছে পড়ছে মনে হল। হয়তো বা একটু উত্তেজনাও। কাছে আসতে বলল, তোমার জন্যেই সেই থেকে অপেক্ষা করছি, আর একটু দেরি হলে আজ ঠিক তোমার বাড়ি চলে যেতাম—

হালকা বিস্ময়ে ফিরে জিগ্যেস করলাম, কেন, আজ-কি ব্যাপার?

ডিকি থমকালো একটু। মুখে কাঁচা হাসি। জবাব দিল, ব্যাপার কিছু না, শুধু মনে হচ্ছিল তোমার কাছে আমার কিছুক্ষণ থাকা দরকার।

বলার মধ্যে চাতুরির মিশেল না থাকলে শুনতে খারাপ লাগে না। ওর প্যান্টের আর জামার পকেট লক্ষ্য করলাম। তারপর জিগ্যেস করলাম নতুন কোনে৷ সুরের জালে তো আটকা পড়োনি দেখছি, বাঁশি কই?

আগে আগে পাথরটার ওপরে গিয়ে বসল। রুমাল বার করে আমার জায়গাটা একদফা ঝেড়ে দিল। নিষেধ করলেও এটুকু করবেই। হাসি-হাসি মুখে বলল, বাঁশি আনিনি, কাল রাত থেকে যে সুরের মধ্যে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছি অন্য সব সুর মাথায় উঠে গেছে।

পাশে বসে আমি মুখখানা ভালো করে দেখলাম একটু। আবারও মনে হল কিছু একটা উত্তেজনার কারণ ঘটেছে। জিগ্যেস করলাম, কাল রাতে ক্লাবে এত কাণ্ড হয়ে গেল, তুমি ছিলে কোথায়?

—ক্লাবেই ছিলাম।...ও-সব নাচ-ফাচ আমার ভালো লাগে না, তাছাড়া ছেলেদের মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাগ নাচ তো খুব বোঝে—কেবল মেয়ে দেখার জন্য ভিড়।

হেসে ফেললাম।—বেশ সুন্দর মেয়েই তো ছিল, তুমি ঘরেই বসেছিল—এসে দেখোওনি?

—ওই শেষের দিকে একবার এসেছিলাম, একটু বাদে পুলিশ হানা দিতে ফিরে গেলাম।...তা মিস্টার ডাকুয়া কি বললেন, তিনি তো ক্লাব-হাউস সার্চ করার ব্যাপারে পুলিসকে সাহায্য করছিলেন দেখলাম।

—কি আর বলবে, পেল না। ওদের ধারণা জঙ্গলের পথেই মেয়েটা পালিয়েছে।

শুনে আমার মুখের দিকে চেয়েই ডিকি নিঃশব্দে হাসতে লাগল। যেন কিছু মজার কথা শুনছে। ওই হাসি দেখেই আমার খটকা লাগল। জিগ্যেস করলাম, হাসছ যে?

. —ওদের বুদ্ধি দেখে। অজানা অচেনা জায়গার জঙ্গলে ঢুকে একটা মেয়ে পালাবে কোথায়!

কেন যেন এই মুখের দিকে চেয়ে আমার খটকা আরো বেড়ে গেল। জিগ্যেস করলাম, মেয়েটা তাহলে কোথায় পালিয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

জবাবে তেমনি ছেলেমানুষি মজার হাসি হেসে ডিকি যে জবাব দিল শুনে ঝাঁকুনি খেয়ে পাথর ছেড়ে আমার দাঁড়িয়ে ওঠার দাখিল।

বলল, মনে হওয়ার ব্যাপার কিছু নেই, রাত তিনটের পর বোর্ডারদের একজনের সাইকেল হাতিয়ে রাঙ্কীকে পিছনের ক্যারিয়ারে বসিয়ে আমিই তাকে উজলবাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছি।...তার আগে রাঙ্কী অবশ্য তাকে তোমার বাড়িতে তোমার কাছে রেখে আসতে বলেছিল... ওর বিশ্বাস তুমি ওকে যেভাবে হোক রক্ষা করবে।

আমি তাজ্জব, বিমূঢ়।—রাত তিনটের সময় রাঙ্কীকে তুমি পেলে কোথায়?

ডিকির মুখে সেই কচিকাঁচা হাসি।—রাত তিনটের সময় কেন, পুলিশ হানা দিয়েছে টের পেয়েই রাঙ্কী নাচের পোশাক পরা অবস্থাতেই ছুটে বেরিয়েছিল। সেই থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত সে আমার ঘরেই ছিল।

আমার মুখে কথা সরে না। হাঁ করে চেয়ে আছি।

এর পরেও সমস্ত ব্যাপারটা শুনে বিশ্বাস করব কি করব না ভেবে পাচ্ছিলাম না।

...পুলিশ হানা দিয়েছে টের পেয়েই ডিকি আসরের কাছ থেকে চলে এসেছে। নিজের ঘর খোলা ছিল, আলো জ্বলছিল না। কি ব্যাপার হল বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু বুঝতে চেষ্টা করে সে তার ঘরে চলে এলো, পুলিশের সংস্রব তার ভালো লাগে না। দরজা দুটো ভেজিয়ে ঘরের আলো জ্বালতেই হতভম্ব। ঘরের এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে নাচের ঝকমকে পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে রাঙ্কী। তার হাতে ঝক্‌ঝকে একটা বাঁকানো ছোরা, ফর্সা মুখে যেন আগুন লেগেছে, দু'চোখ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। ডিকি সত্যি দেখছে কি স্বপ্ন দেখছে জানে না।

হিস্‌হিস্ গলায় রাঙ্কী বলল, ভয় পেও না, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না, আমাকে বাঁচতে হবে—ওদের কাছ থেকে আমাকে রক্ষা করতে হবে—না যদি পারো তাহলে পুলিশ এসে ধরার আগেই এ দিয়ে আমি নিজেকে শেষ করে দেব—কিন্তু আমাকে বাঁচতেই হবে, আমাকে ওরা ধরতে পারলে আর একটা লোক প্রাণে বাঁচবে না, ওই

দেওকী নায়েকের চরেরা তাকে কুকুরের মতো পিটিয়ে মেরে ফেলবে—তুমি বিশ্বাস করো আমি নির্দোষ, নাচের পার্টির প্রায় সকলেই নির্দোষ—গাঁজার চোরাই চালান দেওকীর একলার ব্যবসা, এই দলের দু'জন মাত্র তার সঙ্গে আছে, বাদ বাকি কেউ তার সঙ্গে যুক্ত নয়—দয়া করে আমাকে বাঁচিয়ে দাও—পরে সব শোনার পর যদি আমাকে দোষী মনে হয় তো ধরিয়ে দিও—বাঁচাতে না পারলে তোমার সামনেই আমি আত্মহত্যা করব।

ডিকির মনে হল ও একবার মাথা নেড়ে আপত্তির আভাস দিলে ওই হাতের লক্‌লকে ধারালো ছোরা মেয়েটা নিজের বুকের তলায় বসিয়ে দেবে। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই ডিকির কাঁপুনি ধরে গেছে, এই কড়া শীতেও কপাল ঘেমে ওঠার দাখিল। সেই মুহূর্তে তার একটাই প্রাণের তাগিদ, চোখের সামনে যেন কোনো রক্তাক্ত কাণ্ড দেখতে না হয়।

বোকার মতো রাঙ্কীকেই জিগ্যেস করল, তোমার খোঁজে পুলিশ এদিকে আসবে নাকি?

রাঙ্কী বলল, দেওকীকে যখন ধরতে পেরেছে আমার খোঁজে তারা সব জায়গায় আসবে, জায়গা তন্ন তন্ন করে দেখবে।

মাথায় যা এলো ডিকি পলকের মধ্যে তাই করল, করে গেল। সুইচ টিপে ঘরের আলোটা নেভালো প্রথম। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই ছুটে গিয়ে বাথরুমের আলো জ্বালল। বাথরুমটা যেখানে, ঘরের একেবারে ভিতরে এসে না দাঁড়ালে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। রাঙ্কীকে এনে বাথরুমে ঢোকালো—ওদিকের দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল। বাথরুমের আলো নিভিয়ে বাইরে থেকে সেটার দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ঘরের আলো জ্বেলে রেখে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এলো। দরজা দুটো খোলাই থাকল। সামনের তাঁবু ছাওয়া লনে তখনো বেশ লোক, তবে তাড়াতাড়িই খালি হয়ে যাচ্ছে।

ডিকির বুকের তলায় হাতুড়ির ঘা পড়েই চলেছে। গলা শুকিয়ে

কাঠ। আয়নায় না দেখেও কেবলই মনে হচ্ছে তার মুখের অবস্থা স্বাভাবিক নয়।

...বারো চৌদ্দটা মিনিট নয়তো যেন বারো চৌদ্দ ঘণ্টা। বারান্দায় কয়েক জোড়া ভারী পায়ের শব্দে ঘুরে তাকালো। আবছা অন্ধকার বারান্দা ধরে এদিকেই আসছে কোমরে রিভলভার গোঁজা দু'জন পুলিশ অফিসার, তাদের সঙ্গে মনোহর ডাকুয়া। এই সারির তিন চারটে তালাবন্ধ খালি ঘরের পরই ডিকির ঘর। ঘরের দরজা খোলা, আলো জ্বলছে। ওদের দেখা যতটা সম্ভব অবাক মুখ করে দুই এক পা এগিয়ে এলো। মনোহর ডাকুয়া আসতে আসতেই ওদের ডিকির পরিচয় দিল, বলল, আমাদের স্টাফ। তারপর কাছে এসে হাসিমুখে বলল, কি মিস্টার ডেটন, কেমন মজা দেখছ?

বিমূঢ় মুখে ডিকি জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার মিস্টার ডাকুয়া?

কাজের জায়গায় ওপরঅলা হিসেবে তাকে স্যার বলে, এখন মুখ দিয়ে মিস্টার ডাকুয়া বেরুলো।

মনোহর ডাকুয়া বলল, ব্যাপার পরে হবে, কোনো মেয়েকে পালাতে দেখেছ?

ডিকির ভেবাচাকা-খাওয়া মুখ। —মেয়ে...!

মনোহর ডাকুয়া হেসে উঠল, জবাব দিল, হ্যাঁ হে, মেয়ে কাকে বলে জানো না—এই ড্যান্স পার্টির সেরা মেয়ে রাক্ষীকে খুঁজছেন এঁরা —তোমার ঘরে লুকিয়ে টুকিয়ে রাখোনি তো?

ঠাট্টা বুঝে এবারে ডিকিও ঠোঁটে হাসি ফোটাতে পারল একটু। বলল, ভিতরে এসে দেখে যান তা হলে।

একজন অফিসার হয়তো অভ্যাস বশতই ঘরের চৌকাঠের এদিক থেকে একবার ভিতরে গলা বাড়ালো—অন্য দু'জন তখন দু'তিন পা এগিয়ে গেছে। সে-ও তাদের সঙ্গ নিল।

ডিকি ডেটন সেদিকে চেয়ে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে। নিঃসংশয়ে ভাবতে পারছে না ফাঁড়া কেটেছে।

আরো মিনিট কুড়ি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর পায়ে

পায়ে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল। জানালা দুটোর একটা খোলা ছিল, সেটাও বন্ধ করে দিল। তখনো এমন অবস্থা যেন তার ওপর দিয়েই মস্ত একটা ঝড় বয়ে গেছে। স্নায়ুগুলো এখনো টান-টান।

বাথরুমের দেয়ালের কোণে রাঙ্কী কাঠের মতো দাঁড়িয়ে। ডিকিকে দেখেই ফিস্‌ফিস্ করে জিগ্যেস করল, ওরা চলে গেছে?

অভয় দিয়ে ডিকি তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে এলো। একটাই চেয়ার ঘরে, সেটাতে বসতে দিল। বলল, তাহলে ড্যান্স পার্টির আড়াল দিয়ে গাঁজার চোরাই চালান চলেছে?

রাঙ্কী অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, আমরা না—আমরা নাচ ছাড়া আর কিছু জানি না—সব ওই দেওকী নায়েক করছে—আমরা কেউ এ-সব চাই না, আমি না, বাসুদেব না, দেওকী নায়েকের স্ত্রী পর্যন্ত না —এ নিয়ে বউয়ের সঙ্গে তার খটাখটি লেগেই ছিল—

ডিকি জিগ্যেস করল, ওরা এখানে সার্চ করে গাঁজা পাবে?

—পাবে কেন, এতক্ষণে পেয়েই গেছে—আমাদের পোশাকের তিন ট্রাঙ্কের তলায় আধখানা করে গাঁজা বোঝাই।

শুনে ডিকির মুখ শুকালো। বলল, আমাকে সুদ্ধ কি ফ্যাসাদে ফেললে বলো তো—এখন তুমি এখান থেকে বেরুবে কি করে— পালাবে কি করে?

একটু ভেবে রাঙ্কী জিগ্যেস করল, এখানকার বাচ্চাদের স্কুলের টিচার শীলা স্মিথকে তুমি জানো? চেনো?

ডিকি মাথা নেড়ে সায় দিতে রাঙ্কী ব্যগ্র গলায় বলে উঠল, আমাকে তাহলে তার কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো—শীলা আমাকে ঠিক রক্ষা করবে, আর একজনের জন্য আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাতেই হবে—যত দেরী হবে তার ততো বিপদ।

এ-কথা শোনার পর ডিকিকে আবার নতুন করে ভাবতে হল। চিন্তা করে বলল, দু'আড়াই ঘণ্টার আগে এখান থেকে বেরুলেই তুমি ধরা পড়বে…তাছাড়া পুলিশ ঠিক খোঁজ নেবে এখানে তোমার

চেনা-জানা কে আছে—জানতে পারলে সেখানেও তোমার খোঁজ করতে ছাড়বে না।

ডিকি যে খুব বুদ্ধিমানের মতো ভেবেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু কেন যেন একটু রুক্ষ স্বরে বললাম, সর্বনাশ হতে পারে জেনেও নিজের ঘরে তাকে তুমি লুকিয়ে রাখলে, রাত তিনটে পর্যন্ত তাকে আগলে রেখে অন্যের সাইকেল হাতিয়ে ক্যারিয়ারে বসিয়ে তাকে সেই উজলবাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলে? তোমার এত দরদ পাবার আশায় অমন সুন্দরী মেয়ে তোমাকে কিছু পুরস্কার টুরস্কার দেয়নি?

বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে এ আমি কি যাচ্ছে তাই কথা বললাম। কিন্তু আশ্চর্য, ডিকির মুখ দেখে মনেও হল না ও আমার কথার কোনো কদর্থ ধরেছে। ঠোঁটের হাসি মুখে ছড়াচ্ছে। বলল, উজলবাড়ি পৌঁছে আমার হাত দুটো ধরে প্রায় কেঁদে ফেলে বলেছিল, যদি প্রাণে বাঁচি আর বাসুদেবকে প্রাণে বাঁচাতে পারি—তোমাকে কোনদিন ভুলব না…এটুকুই আমার পুরস্কার। একটু থেমে বলল, দুটো কারণে ভয়-ডর সব ভুলে আমি এত বড় রিস্ক নিতে পেরেছি—এক সে যখন তোমার নাম করে বলল, যে ভাবে হোক তুমি তাকে রক্ষা করবেই—তাতেই মনে হল খারাপ মেয়ে হলে কক্ষনো তোমার কাছে প্রশ্রয় পেত না। আর দ্বিতীয় কারণ, একটা ভালবাসার অপমৃত্যু ঠেকাবার মতো মনে হঠাৎ অদ্ভুত একটা জোর পেলাম।

ডিকির মুখের দিকে চেয়ে আছি।

ডিকি বলে গেল, ও একটা ছেলেকে ভালবাসে, আর সেই ছেলেও রাঙ্কীকে তেমনি ভালবাসে। তার নাম বাসুদেব। তাই নিয়েই দেওকী নায়েকের ওদের দুজনের সঙ্গে আর নিজের স্ত্রীর সঙ্গে গণ্ডগোল। এই বয়সেও রাঙ্কীর প্রতি দেওকী নায়েকের জঘন্য লোভ, অনেক দিন ধরেই ওকে সেই লোভের ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করেছে। তার বউ পর্যন্ত ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়। সেই থেকে দু'জনের তুমুল ঝগড়াঝাঁটি। লছমী নায়েক নিঃশব্দে চেষ্টা করেছে রাঙ্কী আর বাসুদেব যাতে পালিয়ে যেতে পারে—কিন্তু দেওকীর মতো

ধূর্তর চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। গেল বছর রাঙ্কীকে নিয়ে দেওকীর সঙ্গে লছমী নায়েকের তুমুল হয়ে গেল। দেওকী বুক ফুলিয়ে বলে দিলে, রাঙ্কী তার, রাঙ্কীর দিকে যে চোখ দেবে তাকে প্রাণে বাঁচতে হবে না—বউয়ের যদি সেটা সহ্য না হয় সে যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারে।

লছমী নায়েক চলেই গেছে। সে আত্মহত্যা করেছে।

তাতেও দেওকী নায়েকের এতটুকু অনুশোচনা হওয়া দূরে থাক, তার পথের কাঁটা দূর হল যেন! টাকার জোরে বউয়ের আত্মহত্যা নিয়ে পুলিশ একটুও ঘাঁটাঘাঁটি করল না। বেগতিক দেখে রাঙ্কী তার কোমরের ছোরা দেখিয়ে ঘোষণা করল, আরো একটা আত্মহত্যা দেখতে দেওকীর বাকি আছে—তার গায়ে একটা আঙুল ছোঁয়ালে সেটা তাকে দেখতে হবে—আর সেই সঙ্গে পুলিশও সব জানবে।

…দেওকী নায়েক মনে মনে সমঝেছে একটু। এ অবস্থায় জোর করার মতো বোকাও নয় সে। বলেছে, তার ভালবাসার মেয়ের অনিচ্ছায় এমন কাজ কক্ষনো করবে না সে। বলেছে, রাঙ্কী একদিন তার ভুল বুঝে নিজেই কাছে আসবে, ততদিন এই বিচ্ছেদ সে দয়ালু ঈশ্বরের পরীক্ষা বলেই মেনে নেবে। বোকার মতো সে তখন আর বাসুদেবের ওপরেও বিরূপ নয়, উল্টে তার সঙ্গে আপনার জনের মতোই সদয় ব্যবহার করেছে। এরপর বছর ঘুরে আসতে সে তার নখ-দাঁত বার করেছে। দলের মোটামুটি এক সুশ্রী মেয়েকে টাকা দিয়ে আর অনেক উন্নতির আশা দিয়ে বশ করেছে। সেই মেয়ে বাসুদেবের সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করেছে। তারপর রাঙ্কীর সামনেই একদিন এসে দেওকীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়েছে—বাসুদেব নাকি তার ওপর অত্যাচার করেছে, তার চরম সর্বনাশ করে এখন তাকে ত্যাগ করতে চাইছে। এতবড় অপরাধের পরেও দেওকী বাসুদেবকে ক্ষমা করতে রাজি হয়েছে কেবল এক শর্তে—তিন দিনের মধ্যে ওই মেয়েটাকে তার বিয়ে করতে হবে। অন্যথায় বাসুদেবকে চিরদিনের মতো তাদের সংশ্রব শুধু ছাড়তে

হবে না, এই শহর ছেড়েই দূরে চলে যেতে হবে—নইলে তার প্রাণ সংকট কেউ রুখতে পারবে না।

যা বোঝার রাঙ্কী আর বাসুদেব খুব স্পষ্টই বুঝলে। বাসুদেব গা-ঢাকা দিল। মুখোস খোলার পর দেওকী নায়েক কত হিংস্র হয়ে উঠতে পারে বাসুদেব তা ভালোই জানে। সরে যাবার আগে রাঙ্কীকে বলে গেল, সে যেন আত্মরক্ষা করে, এবারে ও হয় প্রাণ দেবে নয়তো দেওকী নায়েকের শেষ দেখবে।

...বাসুদেব কি করবে রাঙ্কী তখনো ভেবে পায়নি। সে চলে যাবার পর দেওকী নায়েক তড়িঘড়ি ড্যান্স পার্টি নিয়ে সফরে বেরুনোর ব্যবস্থা করল। রাঙ্কী স্থির করেছিল প্রাণ গেলেও যাবে না, বিদ্রোহ করবে। কিন্তু একজনের মারফৎ আশ্চর্যভাবে তার হাতে বাসুদেবের লেখা একটা চিরকুট এলো। ডান্স পার্টির সঙ্গে নিশ্চয় যাবে—এটাই সুযোগ। কি সুযোগ রাঙ্কী ভেবে পায়নি। আপত্তি না করে দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। রাঙ্কী এখন বুঝতে পারছে সুযোগটা কি। মণিপুরের যেখানে তারা থাকে সে অঞ্চলের থানা-পুলিশকে দেওকী নায়েক টাকার জোরে হাত করে রেখেছে। যেখানে তার কোনরকম প্রতিপত্তি খাটবে না সেখানে এসে বাসুদেব ছোবল বসিয়েছে। ইনফরমার হয়ে পুলিশের কাছে সব ফাঁস করেছে। হয়তো রাঙ্কীর ব্যাপারেও পুলিশের কাছে সে কিছু আবেদন করে রেখেছে। আর হয়তো সে ভেবেছে কোর্টের বিচারে রাঙ্কারি যদি দুই এক বছরের জেলও হয়, সে-ও মন্দের ভালো, ওই শয়তানের হাত থেকে সে নিরাপদে থাকবে। ডিকিকে রাঙ্কী বলেছে, বাসুদেব যা ভাবেনি সেটা তার নিজের বিপদের কথা। রাত পোহালে বা দুই একদিনের মধ্যে ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে যাবে, দেওকীর সাগরেদরা তক্ষুনি বুঝে নেবে কি করে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। তার নিজস্ব চক্রের মধ্যে ভীষণ ভীষণ লোক আছে যারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে থেকে তার হয়ে কাজ করছে। ব্যাপারটা বোঝা মাত্র তারা বাসুদেবের খোঁজে তৎপর হয়ে [illegible] এমনিতেই হয়তো বাসুদেবকে হত্যা

করার জন্য লোক লাগিয়ে দেওকী নায়েক সফরে বেরিয়েছে। তার নাগাল পেলে এরপর তারা ওকে শেয়াল কুকুরের মতো মেরে ফেলবে। তাই যেমন করে হোক এতটুকু সময় নষ্ট না করে বাসুদেবকে রাঙ্কীর ধরা চাই। উজ্জলবাড়িতে বাসুদেবের বুড়ী দিদিমা আর এক মামা থাকে। শালজুড়িতে যখন এই ব্যাপারটা ঘটে গেল, রাঙ্কীর ধারণা সেই দিদিমার বাড়িতে গেলে বাসুদেবের হদিস মিলবে।

এতটা শোনার পর আমার নিঃশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল। জিগ্যেস করলাম, রাঙ্কীকে তুমি সেই দিদিমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছ নাকি?

ডিকি জবাব দিল, তার দরকার হয়নি, সেখানে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে রাঙ্কী নেমে গেছে। তিন চার বছর আগে সফরে এসে এই শালজুড়ি থেকেই বাসুদেবের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার জন্য তার দিদিমার বাড়ি গেছল—ভোরের আলো জাগার আগেই সে সেখানে পৌঁছে যেতে পারবে।

অপলক চোখেই আমি ডিকিকে দেখছি। বললাম, অমন একটা সুন্দরী মেয়েকে সাইকেলের পিছনে নিয়ে তুমি চলে গেলে, রাস্তায় একটা লোকও তোমাদের দেখেনি? কারো কোনরকম সন্দেহ হয়নি?

কিছু মনে পড়তে ডিকি জোরেই হেসে উঠল। বলল, দেখলেও রাঙ্কীকে সুন্দরী মেয়ে বলে কারো চেনার উপায় ছিল নাকি। তার সেই অদ্ভুত পোশাক যদি দেখতে। আমি তো এই ঢ্যাঙা মানুষ, আমার একটা ট্রাউজারের দু'পা আধ-হাতের ওপর ভাঁজ করে ক্লিপ এঁটে ওকে পরাতে হয়েছে—ভিতরে গোঁজার ফলে শার্ট নিয়ে সমস্যা হয়নি। তার ওপর আমারই কোমর পর্যন্ত গলা-বন্ধ একটা ঢাউস সোয়েটার, মাথায় কান-মুখ-গলা ঢাকা আমার গরম টুপী—দেখলেও মেয়ে বলে চিনবে কজন? তাছাড়া এই শীতে রাত তিনটে চারটেয় রাস্তায় আবার লোক থাকে নাকি—বেলা সাতটা পর্যন্ত তো কুয়াশা আর অন্ধকার।

দৃশ্যটা কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। মুখ চেনা দূরে থাক, [illegible]

পোশাকে মেয়ে কি পুরুষ বোঝাও শক্তই বটে। কিন্তু ডিকির এই নরম-সরম মুখের দিকে চেয়ে আমি তার সাহসের কথা ভাবছি। শুধু সাহস কেন, আরো কিছু ভাবছি, আরো কিছু দেখছি।...আমার ঠেসের জবাবে একটু আগে বলেছিল, একটা ভালবাসার অপমৃত্যু ঠেকাতে পারার তাড়নায় মনে এত জোর পেয়েছে।

জিগ্যেস করলাম, রাস্কীর পরনের পোশাক আশাক?

—সে-সব একটা প্যাকেট করে তাব সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি।... এর পরেও ঈশ্বর শেষ রক্ষা করবে কিনা কে জানে, বাস্তুদেবকে পেলে রাস্কী তাকে নিয়ে বরাবরকার মতো দেশ ছেড়েই উধাও হয়ে যাবে বলেছে।

বললাম, ঈশ্বরের দরকার হবে না বোধহয়, তোমার শুভেচ্ছার জোরেই শেষ রক্ষা হবে।

ডিকি লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগল।

আর দ্বিধা রাখিনি। মন বলেছে জীবনের সঙ্গী পেলাম। এমন হতে পারে গত রাতেও চিন্তা করিনি।

পনের দিনের মধ্যে সকলে জেনেছে আমি শীলা স্মিথ এতদিনে শীলা ডেটন হতে যাচ্ছি। নির্দ্বিধায় নিজেই নিজের বিয়ে ঘোষণা করেছি। মা বিরূপ। বাবা খুশি। আনন্দের চোটে মীনা মাসি বয়সের তফাৎ আরো ভুলে প্রায় আদি রসাত্মক ঠাট্টা ঠিসারা করেছে। মনোহর ডাকুয়ার ক্ষত মুখের হাসি অসুন্দর মনে হয়নি আমার। অন্য পরিচিতজনেরা খবর শুনে অবাক। গ্র্যাণ্ডির দাড়ি ভরা মুখে খুশি-চাপা হা-হুতাশ—তুই এই বিশ্বাসঘাতকতা করলি! এ-ভাবে পথে বসালি আমাকে!

কিন্তু বিয়ের আগে একজনের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া আমার বাকি ছিল। মেলিণ্ডা জারভিসের সঙ্গে।

আজ অন্তত গ্র্যাণ্ডির সঙ্গে দেখা হোক চাইনি। তার ঘরের দরজা ভেজানো। দোতলায় উঠে সামনের ঘরেই মেলিণ্ডা জারভিসকে পেলাম। আমাকে দেখে বেশ অবাক। খবরটা দিলাম,

বললাম, শুনেখুশি হবেন, আমার বিয়ে···ডিকি ডেটনের সঙ্গে। তাকে চেনেন তো?

মেলিণ্ডা জারভিস প্রথমে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। মানসিক বিরোধের পর থেকে আমাকে তুমি করে বলত। আজ ভুলে গিয়ে বিপরীত উচ্ছ্বাস, সত্যি বলছিস নাকি?

ওই উচ্ছ্বাস মেকি মনে হয়েছে আমার। তার চোখে মুখের বিস্ময় আর আনন্দটুকু বিশ্বাস করতে চাইছি না। জবাব দিয়েছি, মিথ্যে বলতে যাব কেন।···আপনার কাছে আমি সব থেকে বেশি কৃতজ্ঞ, একজনকে আপনি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন বলেই জীবনে আজ ডিকির মতো এ-রকম একজন মানুষ আসতে পেরেছে।

···এই এক মহিলা মনে মনে যদি আমাকে ভ্রষ্টা জেনেও থাকে তবু দেমাক ভ'রে এ কথা বলতে পেরেছি। কারণ এ ক'দিনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে যেটুকু বুঝেছি, ডিকিকে সব খোলাখুলি বলে দিলেও সে কানে তুলবে না। কিন্তু খবর শোনার পর সত্যিই অপ্রত্যাশিত খুশির প্রতিক্রিয়া দেখলাম মেলিণ্ডা জারভিসের। ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে প্রগাঢ় স্নেহে কপালে চুমু খেল। মুখে হাসি কিন্তু দু'চোখ ভেজা ভেজা। ফিস্‌ফিস্ গলায় বলল, বাঁচালি তুই আমাকে···বাঁচলি···তোর জন্যে যে ভিতরে কি যন্ত্রণা ছিল না, আজ, সেটা গেল। তোকে আমি সত্যি কথা বলছি, যার প্রত্যাশায় ছিলি সে তোর যোগ্য নয়—এতটুকু যোগ্য নয়। তুই আমার কথা বিশ্বাস কর—

বিমূঢ়ের মতো ফিরে এসেছি। ডিকিকে ভালো লেগেছে মিথ্যে নয়। তাকে গ্রহণ করতেও চলেছি। কিন্তু তা বলে রয জারভিসের স্মৃতি আমি ভেতর থেকে মুছে ফেলব কি ক'রে?

পারিনি। পারা যায় না। বিয়ের পরেও এই জন্যে বিবেকের কামড় কম পড়েনি। মিলনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে হঠাৎ হঠাৎ রয়ের মুখ সামনে ভেসে উঠেছে, দেহে মনে তারই অস্তিত্ব অনুভব করেছি, করতে চেয়েছি, সেই নিবিড় মুহূর্তে কখনো কখনো ভুলতে বসেছি বাহুলগ্ন

বক্ষলগ্ন এই মানুষ রয় জারভিস নয়, ডিকি ডেটন। শেষে শাসনের চাবুকে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে-করে আত্মস্থ করেছি, ডিকিকেই বুকে টেনেছি ভাবতে পেরেছি।

ডিকি সর্বদাই আমাকে আদরে সোহাগে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মানুষটার ভিতরের কত দিনের কত তৃষ্ণা কত শূন্যতা মাথা খুঁড়ে মরছিল বাইরে থেকে সেটা কিছুমাত্র আঁচ করতে পারিনি। তার বাইরে যত আবেগ ভিতরে তার চার গুণ। আবার রাতের শয্যায় দুরন্তও কম নয়। রয় জারভিসের মত অবুঝ বেপরোয়া নয়। কিন্তু কোনো দুর্বল মেয়ের পক্ষে ওকে সামলানোও সহজ ব্যাপার নয়।

বিয়ের চার পাঁচ মাসের মধ্যেই এই সংসারের প্রথম বড় অঘটনটা ঘটে গেল। মা-কে নিয়ে বরাবরই ছিল, কিন্তু সেই অশান্তির এমন মর্মান্তিক শেষ কে ভাবতে পেরেছে। আমার বিয়ের পর তার মেজাজপত্র আরো তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিল। তাকে তখন ঘরে আটকে রাখাই মুশকিল। ডিকিকে মা দু'চক্ষে দেখতে পারত না, কিন্তু মাকে যে ও কত ভাবে সাহায্য করত ঠিক নেই। মায়ের ব্যাপারে ডিকি আমার মস্ত সহায়। তাকে পাঁজা কোলে করেও এক একদিন রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে আসে। মা অকথ্য গালমন্দ করে। চড় চাপড়ও বসিয়ে দেয়। তার বদলে ও হাসিমুখে কেবল মা-মা করে।

বাবার সঙ্গে কি নিয়ে বচসা সেদিন। বচসা ঠিক নয়, কারণ রাগের বদলে পাল্টা রাগ করা বাবার স্বভাব নয়, আর জানে সেটা নিরর্থক। তবে তিক্ত বিরক্ত হয়ে দুই একটা কথার জবাব দিচ্ছিল। তাইতেই মা জ্বলে জ্বলে উঠছিল। তখনো কেউ ভাবিনি তার অসহিষ্ণুতা তাকে কতবড় ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে বসেছে···। আমরা বাইরের ঘরে বসেছিলাম। হঠাৎ রিভলবারের আওয়াজ। বাবা ওটা দেরাজের মধ্যে সাবধানে রাখত, চাবি আমার বা বাবার কাছে থাকত। কখন কিভাবে ওটা সংগ্রহ করেছে জানি না।

ছুটে গিয়ে দেখি সব শেষ।

আমরা স্তব্ধ। দু'চোখে জল গড়িয়েছে শুধু ডিকির। চোখের

সামনে ব্যাপার দেখেও আর বুঝেও বাবা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ছেলে এসেছে। বিলি। ছেলের মতোই চোখ জুড়ানো ছেলে। যে দেখে সেই টেনে নিতে চায়। চটকাতে চায়। মেলিণ্ডা জারভিস আর গ্র্যাণ্ড জেরি তো লোক পাঠিয়ে রোজ ওকে নিয়ে যায়। এক দিনের জন্যেও না দেখে পারে না। তারা বিলির গ্র্যাণ্ড মা আর গ্র্যাণ্ড পা। গ্র্যাণ্ডির কথা ধরি না, তার তো আনন্দ হবেই। কিন্তু এখনো আমার বিস্ময়ের কারণ মেলিণ্ডা জারভিস। আমি বিশ্বাস করতে পারি না কি করে আমাদের এই খুশির জগতের সেও একজন হয়ে উঠতে পারে। তাই এখনো আমার ফাঁকি ধরার চোখ।

যাক, জীবনে আবার নতুন স্বাদ। ভিতরটা ভরপুর। বিলির পাঁচ বছর বয়সে ডিকিকে ফের সামলানোর দায়। তার ইচ্ছে এবারে একটা মেয়ে আসুক। আমি তাকে ধমকে সরাই। বলি একটাই যথেষ্ট। কিন্তু ওর চোখে মুখে দুষ্টুমি। তাই সাবধান হবার যত দায় আমার তবু ডিকির মুখে এক কথাই লেগে আছে, আমার মতো মেয়ের একটা মেয়ে না থাকলে নাকি এই ঘর দোরই শূন্য। আমি ঝাঁঝিয়ে উঠি, হলে মেয়ে হবেই এমন কোনো গ্যারান্টি আছে—না এটা তোমার হাত?

ডিকি মাথা চুলকে জবাব দেয়, তবু দুই একবার চেষ্টা তো করা দরকার, চেষ্টা ছেড়ে দিলে তো আর কোনো দিনই আশা নেই।

এমন চোখ-কান কাটা ও যে মনের বাসনা মেলিণ্ডা জারভিসকে পর্যন্ত বুঝিয়ে দিয়েছে। মহিলা প্রায় ধমকের সুরেই একদিন আমাকে বলল, ডিকির একটা মেয়ের এত সখ, তুই এভাবে বেঁকে বসে আছিস কোন্ আক্কেলে।

আমার মুখ লাল। নিজের আগোচরে মেলিণ্ডা আবার অনেকটাই শ্রদ্ধার আসনে ফিরে এসেছে। তবু আমার ভিতরের রাগ অভিমান বা দ্বন্দ্ব একেবারে মুছে গেছে এমন নয়। কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিসের

মতো রাশভারী মহিলা। অনায়াসে এমন কথা বলে বসলে মুখ লাল হবে না তো কি!

এই সময় এক মস্ত বড়লোক দম্পতীর আবির্ভাব ঘটল শাল-জুড়িতে। সতীশ কাউল আর তার স্ত্রী মালি কাউল। তামাম উত্তর বাংলা জুড়ে ভদ্রলোকের কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা। এর নতুন কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা দেখতে শালজুড়িতে এসেছিল। জায়গাটা তার এত ভালো লেগেছে আর এত সম্ভাবনা দেখেছে যে এখানেই আটকে গেল।

জাতে পাঞ্জাবী। ভদ্রলোক ডিকির বয়েসী হবে—বছর চৌতিরিশ। দাড়ি গোঁপের বালাই নেই, ক্লিন শেভড্, মাথায় চুল ডিকির থেকেও লম্বা। গায়ের রঙ না কালো না ফর্সা। ডান হাতে স্টীলের একটা ঝকঝকে বালা। গলায় সোনার চেন। হাসি-হাসি স্মার্ট মুখ। নম্র ভদ্র কথা-বার্তা। এতটুকু বড়লোক চাল নেই, অথচ দেখলেই বোঝা যায় মস্ত অবস্থার মানুষ।

কিন্তু স্ত্রীটি একেবারে বিপরীত। বেঁটে-খাটো, রুক্ষ মুখ। গায়ের রং সতীশ কাউলের থেকেও ময়লা।

মহিলা কথা কম বলে। হাসলে মনে হয় জোর করে হাসছে। দিলদরিয়া স্বামীটিকে নিয়ে ভদ্রমহিলাকে খুব খুশি মনে হয় না আমার। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সতীশ কাউলেরও অনেক বাড়তি উচ্ছ্বাসে যেন ছেদ পড়ে যায়।

প্রথমে বাবার মুখে এদের কথা শুনেছিলাম। মায়ের মৃত্যুর পর আমার জেণ্ট্লম্যান বাবা আর মেয়ে-জামাইয়ের কাছে একসঙ্গে থাকতে রাজি হয়নি। মায়ের নামের এই বাংলো উত্তরাধিকার সূত্রে আমার। আমার আর ডিকির অনুনয় সত্ত্বেও ক্লাব হাউসে চলে গেছে। সেখানে একটা ঘর নিয়ে থাকে। ইদানীং রিটায়ারও করেছে। বিল্লির টানে দুই একবার করে রোজই আসে। মাঝে মাঝে রাত্রিতে ডিনার খেয়ে যায়। বাবাই হঠাৎ সেদিন বলল, সতীশ কাউলের সঙ্গে ডিকির আগেই আলাপ পরিচয় ছিল নাকি? ···আজ দেখলাম, ক্লাব হাউসের ক্যানটিনে বসে দু'জনে খুব হেসে হেসে গল্প করছে?

আমার অবাক হবার দুটো কারণ। এক, বিয়ের পর থেকেই ও একেবারে ঘরকুনো। বন্ধু বান্ধব আগেও ছিল না, এখন আরো নেই। দ্বিতীয় কারণ, দিন পনের ধরে দেখছি ডিকি যতক্ষণ বাড়ি থাকে, কেমন অন্যমনস্ক। ফ্যাকাশে মুখ। বিলিকে তেমন আদর করে না, এই ক'দিনের মধ্যে কোনো রাত্রিতে বাঁশি নিয়ে বসেনি। ভালো করে খায়ও না। ওর কিছু অসুখ টসুখ করল কিনা আমি চিন্তা করছিলাম। জিগ্যেস করলে অবশ্য বলে, কিচ্ছু হয়নি। আবার আর একদিন হঠাৎ বলেছিল, চলো বেশ কিছুদিনের জন্য আমরা এখান থেকে চলে যাই—আমার আর এখানে ভালো লাগছে না—

শুনে মনে মনে আমি ঘাবড়েই গেছলাম। ওর ভিতরে একটা ছন্নছাড়া পাগলাটে মানুষ আছে, যে অনেক দিন ওকে অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে শুনেছি। কিন্তু বিয়ের পর বিশেষ করে বিলি আসার পর ওকে তো বাড়ি থেকে রোজ অফিসে ঠেলে পাঠানো হত। কতদিন কত তুচ্ছ কারণে নিজে কামাই করেছে আমাকে স্কুল কামাই করিয়েছে ঠিক নেই। সেই ডিকির আবার হঠাৎ শেকল ছিঁড়ে বেরুনোর ঝোঁক এলো কিনা ভেবে উতলা হয়েছি। সে-ভাব চেপে ফিরে বলেছি, বলা নেই কওয়া নেই, বিলির আর আমার স্কুল কামাই করে, তোমার অফিস বন্ধ করে বাড়ি ঘর ফেলে হুট করে কোথায় চলে যাব—তুমি ঠিক করো কোথায় যাবে, চিঠি লিখে ব্যবস্থা করো—এদিকে আমাদের ভেকেশন আসুক তখন না-হয় যাওয়া যাবে।

ওতেও ডিকির রাগ।—আমার থেকে তোমার এই সব বেশি হয়ে গেল, কেমন ?

আগেও লক্ষ্য করেছি আমি একটু শক্ত হলে ও নরম হয়। ধমকে উঠেছিলাম, তোমার ব্যাপারখানা কি বলো তো ? যদি শরীর খারাপ হয়ে থাকে তো বলো ডাক্তার ডাকি।

ও কিছু না বলে গুম হয়ে চলে গেছল। সেই ডিকি ক্লাব ক্যানটিনে কজনের সঙ্গে খুব হেসে হেসে গল্প করছে শুনে একটু অবাক হলেও মনে মনে খুশি হয়েছি। ডিকি তাহলে আবার নিজের স্বভাবে ফিরেছে।

অবাক হবার আরো কারণ সতীশ কাউল কে বা কি আমি জানিই না।
জিগ্যেস করলাম, সতীশ কাউল কে ?

—বাঃ, তুই জানিসই না, একজন মালটি মিলিয়নেয়ার বিজনেস ম্যান এদিকে কিছু ইনভেস্টমেণ্ট প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছে—সব দেখেশুনে ল্যাণ্ড আর বিল্ডিং কন্সট্রাকশন স্কিম করেছে—মাতলাহাটি, কাঁঠালবাড়ি, মালবাজার, উজলবাড়ি আর এই শালজুড়িতে অনেক ল্যাণ্ড কিনেই ফেলেছে। প্ল্যান্‌ড স্কিমে জমি তৈরি করে আর বাড়ি করে বিক্রী করবে। এ-সব জায়গার পয়সাওয়ালা লোকেরা অনেকেই বেশ ইণ্টারেস্টেড। আমি ভাবলাম ডিকিরও হয়ত বাড়ি করা টরার প্ল্যান মাথায় ঢুকেছে…।

ডিকির মাথায় এর ধারে কাছেও কিছু ঢোকেনি আমি জানি। কারো ওপর নির্ভর না করে এই লোক এতকাল কাটালো কি করে সেটাই বিস্ময় আমার। তাছাড়া উপার্জনটাই বা কি যে এ-ধরনের কিছু মাথায় ঢুকবে।

সেই রাতে প্রায় ন'টার পর ডিকি ফিরল। তাকে দেখে একেবারে অবাক আমি। হাসছে কিন্তু পা টলছে। অল্প অল্প গন্ধও পাচ্ছি। নিজেই বলল, একজনের সঙ্গে পড়ে আজ একটু ড্রিংক করে ফেললাম, তুমি রাগ করবে না তো ?

আমার মুখে কথা সরে না। মদ আমি ঘৃণা করি এ-জন্যে নয়। আমার অবাক হবার কারণ, এ ক' বছরে ওকে একদিনও মদ খেতে দেখিনি। ওর সামনে বসে মা দেদার মদ খেয়েছে, তাকে সঙ্গ দেবার কেউ না থাকলে ওকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। তাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ডিকি গেলাসে মদ নিয়েছে, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে গেলাস নিয়ে উঠে খানিকটা করে বাথরুমে ফেলে এসেছে। কোনদিন এক ফোঁটাও মুখে দেয়নি। আর আজ ও মদ খেয়ে হাসতে হাসতে হাজির !

জবাব দিলাম না। চুপচাপ একটু দেখে নিয়ে ঠেস দিয়ে বললাম, এটা মালটিমিলিয়নেয়ারের সঙ্গ গুণে নাকি ?

—তার মানে ? একটু ধাক্কা খেল যেন

ফের জিগ্যেস করলাম, সতীশ কাউলের সঙ্গে তোমার আগেই পরিচয় ছিল না মালটি মিলিয়নিয়ার কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ?

ডিকি স্পষ্টই চমকে উঠল দেখলাম।—সতীশ কাউলকে তুমি জানলে কি করে? তার সঙ্গে আলাপ আছে?

—আমি তোমাকে জিগ্যেস করছি!

থতমত খেল একটু।—না অনেক দিনের পরিচয়। বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকে···

—কই তার কথা তো কোনদিন বলো নি? ডিকির এই মুখের দিকে চেয়ে কি-রকম যেন লাগছে বুঝছি না।

—বলার কি আছে, আমি কোনো বড়লোকের ধার ধারি? রাগত জবাব। মনে হল ও সামনে থেকে সরে চেতে চাইছে।

—ধার ধারো না, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হলে মদ খেতে পারো, ক্লাব ক্যানটিনে বসে খুব হেসে হেসে গল্প করতে পারো—এদিকে বাড়িতে মুখ ভার।

এবার বোধহয় বুঝল বাবার মুখে শুনেছি। বাবা তো ওই ক্লাব হাউসেই থাকে। পাশ কাটিয়ে ঘরে চলে গেল। খানিক বাদে টের পেলাম বাথরুমে ডিকি স্নান করছে। এই ক'বছরে দেখেছি ডিকি গরমের থেকে ঠাণ্ডায় দ্বিগুণ কাতর। এটা সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি। মন্দ শীত নয়। সকালেই ওর গরম জলের দরকার হয়। কিন্তু এখন ঠাণ্ডা জলে স্নান করছে। ভাবলাম অভ্যেস নেই তাই মদ গিলে মাথা গরম হয়েছে।

পরদিন সকালে উঠে ডিকি যে খবরটা দিল শুনে আমি হতভম্ব। ওই সব ছাইভস্ম গিলে আসার ফলে গত রাতে নাকি তার বলতে মনেই ছিল না। অফিসের কাজে আজই তাকে কলকাতায় যেতে হচ্ছে। দিন পাঁচেকের মধ্যে ফিরবে।

যা-ই হোক, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিলাম। অফিসের কাজ বলতে চা-বাগানের চা চালানের ব্যাপার ধরে নিলাম। ডিকি হঠাৎ

কিছু দায়িত্বের ভার পেল ভেবে ভালোই লাগল। বিলি বায়না ধরল সে-ও যাবে। ডিকি ছেলের ঝাঁকড়া চুল নাড়াচাড়া করে সখেদে বলল, তোর মায়ের যদি এমন সুমতি হত তাহলে আর ভাবনা কি ছিল ?

আমাদের সাবধানে থাকতে বলে ও চলে গেল।

আমার মনটা তখন অবশ্য একটু খারাপ হয়ে গেল। পাঁচ বছরে এই প্রথম ছাড়াছাড়ি।

কি জন্যে সেদিন তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে গেছল মনে নেই। স্কুল থেকে বিলির হাত ধরে সোজা গ্র্যাণ্ডির ওখানে চলে গেলাম। ক'টা দিন গিয়ে উঠতে পারিনি, মুখোমুখি হলেই গ্র্যাণ্ডি ঠেস দিয়ে কথা শোনাবে জানা কথা। বিয়ের পর থেকে আমি নাকি তাকে ক্রমেই ছেঁটে দিয়ে চলেছি। বাংলোর সামনে এসে অবাক। মস্ত একটা ঝকঝকে বিলিতী গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোনো ড্রাইভার নেই। অবাক বিলিও। কারণ তামাম শালজুড়িতে এ-রকম গাড়ি আর দেখা যায় না।

ভিতরে ঢুকে দেখি গ্র্যাণ্ডি আর মেলিণ্ডা জারভিসের সামনে একজন অপরিচিত আর এক অপরিচিতা বসে। মেলিণ্ডা জারভিস আমার ঘণ্টাখানেক আগেই স্কুল থেকে বেরিয়েছিল জানি। আগন্তুক দু'জন খুব আগ্রহ নিয়ে গ্র্যাণ্ডির আঁকা 'দি গেট অফ কনসেন্স' দেখছে —গ্র্যাণ্ডি প্রত্যেকটি অংশ বুঝিয়ে বুঝিয়ে বিশাল ছবিটা দেখাচ্ছে। ওই দু'জন মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে, শুনছে।

না দেখলেও বুঝেছি এরা কারা। একজন মালটিমিলিয়নিয়ার সতীশ কাউল আর একজন নিশ্চয় মিসেস কাউল।

ছবি দেখায় আর দেখানোয় এত তন্ময় সকলে যে দোরগোড়ায় বিলিকে নিয়ে যে আমি দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পর্যন্ত কেউ লক্ষ্যই করল না। বিলি এবারে হেসে উঠতে সকলের চোখ ফিরল। গ্র্যাণ্ডি চেঁচামেচি করে উঠল, মেঘ না চাইতেই জল! আয় আয়—কার ক্রেডিট কে নিচ্ছে! ওই দু'জনের উদ্দেশ্যে বলল, যার কথা বলছিলাম, এই হল সেই মিসেস শেইলা ডেটন—তোমার বন্ধু ডিকি ডেটনের বেটার হাফ

—আর ইনি মিস্টার সতীশ কাউল, ইনি মিসেস মলি কাউল—এখানে এসে ভি আই পি'দের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করছে, আর আমাকেও কিনা একজন ভি আই পি ঠাউরেছে।

মিস্টার আর মিসেস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো। সতীশ কাউল তারপর খপ করে বিলিকে বুকে তুলে নিয়ে ছেলেমানুষের মতো খানিক লাফালাফি করল। তারপর ওকে নামিয়ে দিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো। চোখে মুখে খুশির সুচারু বিন্যাস। তারপর স্পষ্ট বাংলাতেই জিগ্যেস করল, সেই লাকি রাস্‌কেলটা কোথায়?

না দেখার আগে এই লোকটাকে কেন যেন আমি পছন্দ করতে পারিনি। এর সঙ্গ গুণে বিলি মদ খেয়ে ঘরে ফিরেছিল বলেও হতে পারে। কিন্তু এখন দেখে অন্য রকম লাগল। এত বড়লোক মনেই হয় না। আমি বাংলা বুঝি বা বলি ডিকির মুখেই শুনে থাকবে। বললাম, অফিসের কাজে আজ সকালে কলকাতা গেছে।

—তার মানে? সতীশ কাউলের মুখেও স্পষ্ট বিস্ময়।—কাল রাতে দু'জনে এতক্ষণ কাটালাম, কলকাতায় যাবে আমাকে একবারও বলেনি তো!

আবারও মনে হল ভদ্রলোক নাক-উঁচু বড়লোক হলে ডিকির সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার কথা নয়। হাসলাম একটু।—আমাকেও সকালে রওনা হবার একঘণ্টা আগে বলেছে।

—হোপলেস হোপলেস—তোমার হাসব্যাণ্ডটি ম্যাডাম বরাবর একটি ইম্পসিব্‌ল হোপলেস ম্যান। তার পরেই হাসি-হাসি দু'চোখ স্ত্রীর দিকে।—আমাদের ইয়ে—মানে ডি-ডিকি কেমন লাকি দেখছ?

এটুকু আমার প্রসঙ্গে নির্ভেজাল প্রশংসা। গ্রাণ্ডি মাথা ঝাঁকিয়ে ফোঁস করে উঠল।—ইয়েস্—ভেরি ভেরি লাক-ই অ্যাণ্ড আই অ্যাম ফ্যাট্‌ মাচ আনলাকি! হাসতে চেষ্টা করে মিসেস মলি কাউল স্বামীর উচ্ছ্বাসে সায় দিল। কিন্তু চাউনি আদৌ কোমল মনে হল না। প্রসঙ্গ বদলে সকলের বোঝার জন্য ইংরেজিতে কথা শুরু করলাম। যদিও

এতদিনে মেলিণ্ডা জারভিস আর গ্র্যাণ্ডি একটু আধটু বাংলা বোঝে। জিগ্যেস করলাম গ্র্যাণ্ডির ছবি কেমন দেখলে?

—মা-ভেলাস—সিম্প্‌লি মারভেলাস!

গ্র্যাণ্ডি তড়বড় করে উঠল, এই মিথ্যেবাদী, এটা আমার ছবি? কাউল দম্পতীর দিকে ফিরল, ও যেমন বেইমান তেমনি মিথ্যেবাদী। বাচ্চা বয়েস থেকে কথা দিয়ে রেখেছিল আমাকে বিয়ে করবে, করে বসল ওই বাঁশি বাজিয়ে ছোঁড়াকে। নিজে আমাকে এই ছবির পারফেক্ট আইডিয়া দিল, এখন বলছে আমার ছবি।

প্রথম কথায় সতীশ কাউল হেসে উঠেছিল, পরের কথায় নিখাদ বিস্ময়। মিস্টার জেরি—

বাধা পড়ল।—ইউ মিষ্টার! মি নো মিস্টার সিম্পলি জেরি।

—ও. কে! সতীশ কাউলের দু'চোখের প্রশংসার বন্যা আমার মুখের ওপর আছড়ে পড়ল।—গ্র্যাণ্ড জেরি বলছিল বটে এটা তোমার আইডিয়া—সত্যি এমন ওয়াণ্ডারফুল আইডিয়া তুমি দিয়েছ?

জবাব দিলাম, তাহলে রবীন্দ্রনাথ টেগোর দিয়েছে—আর গ্র্যাণ্ডি সেটা নিজের মতো করে নিয়েছে।

এবারে মেলিণ্ডা জারভিস বাধা দিল। হেসেই বলল, তুই' ও-ভাবে লেগে থেকে মাথায় না ঢোকালে এমন মাস্টার পীস্ হত না।

মাথা অনেকটা নুইয়ে সতীশ কাউল বলল, ম্যাডাম ইউ আর এ রিয়েল জিনিয়াস, অ্যাণ্ড আই এন্‌ভি ডি-আই-মিন ডিকি ডেটন! সঙ্গে সঙ্গে সচকিত একটু, তারপর যোগ করল, অফকোর্স ইফ মাই ওয়াইফ ডাজণ্ট অবজেক্ট।

সকলে হেসে উঠল। এবারেও হাসতে চেষ্টা করে মলি কাউল, জবাব দিল, নো অবজেকশন—গো অন এনভিইং।

এত বড়লোককে এবার আমি একটু ঠেস দিতে ছাড়লাম না।—জিগ্যেস করলাম, সত্যি আইডিয়াটা খুব ভালো লেগেছে?

—সিম্প্‌লি সুপার্ব! বিলিভ মি!

নিস্পৃহমুখে বললাম, কি করে বুঝব, ল্যাণ্ড আর কন্সট্রাকশন স্কিম

তো সব বড়লোকদের জন্য হচ্ছে···এমন আইডিয়া দেখেও তো গেট অফ কনসেন্স দিয়ে ঢুকতে পারে সে-রকম মানুষদের জন্য ছবির ওই আইডিয়াল কটেজ স্কিম করার কথা কারো মাথায় আসে না।

বিলি কোলে মেলিণ্ডা আমার দিকে ফিরল। গ্র্যাণ্ডি কুতকুত করে তাকালো। আর সতীশ কাউলের চোখে মুখে রাজ্যের বিস্ময়। প্রথমে যেন বুঝতেই পারেনি কি বললাম। বুঝতে পেরেও হাঁ করে খানিক আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর এগিয়ে গিয়ে একান্ত মনোযোগে ছবির কটেজগুলো দেখল। শেষে নিজের চেয়ারে ফিরে এলো। বসে ছবিটার দিকে খানিক চেয়েই রইল। উঠল। আমাকে চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, বোসো। আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে খুব অনায়াসে আমার একখানা হাত ধরে পিঠে হাত দিয়ে তার চেয়ারটায় এনে বসিয়ে দিল। আমি পলকের জন্য একবার মলি কাউলের দিকে তাকালাম। তার ভবলেষশূন্য মুখ। সতীশ কাউল সেই বিশাল ক্যানভাসের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ছবিটা গোড়া থেকে আর একবার এক্সপ্লেন করো তো!

উঠে দাঁড়াতে গেলাম, সতীশ কাউল নির্দ্বিধায় এক হাতে আমার কাঁধ চেপে আবার বসিয়ে দিল।—সীট ডাউন প্লীজ অ্যাণ্ড এক্সপ্লেন।

এ যেন এক কর্মযোগীর আঁতে ঘা দিয়ে বসেছি আমি। যতটা সংক্ষেপে সম্ভব বললাম। তার অপলক দু'চোখ তখন ছবির পর্ণ কুটীরের দিকে। এবারে মায়ের কোলে শিশুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। একটু বাদে ফিরল। বলল, আইডিয়াল কটেজ দেখছি ওই একটাই অন্যগুলো আভাস···কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে তারই বা কন্সট্রাকশন হয় কি?

বিপাকে পড়ে জবাব দিলাম, আইডিয়া বুঝে কন্সট্রাকশন করা কি আর্টিস্টের কাজ না আর্কিটেক্টএর কাজ?

এবারে আমার মুখ তার নিরীক্ষণের বস্তু। উঠল। দু'পা কাছে এসে টান হয়ে দাঁড়ালো।—ম্যাডাম, এখন আমরা উজলবাড়ি চলে যাচ্ছি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, কাল তুমি বিকেলের দিকে এখানে আসতে পারবে···সে বিটুইন ফাইভ থার্টি অ্যাণ্ড সিক্স?

বিব্রত বোধ করছি। সতীশ কাউল আবার বলল, কেন আসতে বলছি সেটা এসে বুঝতে পারবে। ঠোঁটে সামান্য হাসি।—তুমি কোন্ লোককে ঘাঁটিয়েছ এখনো জানো না, ইওর হাসব্যাণ্ড নোজ—তাহলে কাল আসছ···তোমার কোয়ার্টার্স কোথায়?

মেলিণ্ডা জারভিস বলল, কোয়ার্টার্স নয়, ওর নিজের বাংলো, তোমরা যাবার সময় ওদের নামিয়ে দিয়ে যেতে পারো আর কাল আসার সময় নিয়েও আসতে পারো—

মেলিণ্ডা জারভিসের আগ্রহের কারণ বুঝতে পারছি। নিজের যথাসর্বস্ব এখানকার সাধারণ মানুষদের জন্য এই বিজনেস ম্যাগনেট যদি কিছু করে সেটা যেন তারই মস্ত লাভ।

—মোস্ট গ্ল্যাডলি, কাম অন্—। মেলিণ্ডা জারভিস আর গ্র্যাণ্ডির হাত ঝাঁকিয়ে সতীশ কাউল লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে এগলো।

কেতা অনুযায়ী সামনের অর্থাৎ ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে দিয়ে এক হাত বাড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। আমি উঠে বসতে দরজাটা ছেড়ে দিতেই একটু মিষ্টি আওয়াজ করে আপনি ওটা বন্ধ হয়ে গেল। মলি কাউল নিজেই ততক্ষণে পিছনের দরজা খুলে বিলিকে নিয়ে উঠে বসেছে।

গাড়ি চলল। আমি মোটরে একেবারে চড়িনি এমন না। তবে বেশির ভাগই বাবার জিপ আর বাসে দূর পাল্লায় যাতায়াত করেছি। এ-রকম সৌখিন গাড়িতে এই প্রথম। আর বিলির তো প্রথম বটেই। গাড়িটা যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে।

সতীশ কাউলের তন্ময়তার ঘোর এখনো ভালো করে কাটেনি। স্টিয়ারিংএ দু'হাত রেখেই একটু বাদে গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হল,—তোমার হাসব্যাণ্ডের বাঁশি শুনেছ?

হাসলাম।—তাকে দেখার আগেই শুনেছি।

—হাউ লাকি! ওর সঙ্গে কোনদিন আমার বনিবনা হয় না, বুঝলে ম্যাডাম—কিন্তু ওই এক বাঁশিতে আমাকেও মজিয়েছে।···ও যে কতবড় জিনিয়াস পাগলাটা নিজেই জানে না।

সত্যি ভালো লাগল। জিগ্যেস করলাম, তোমাদের কতদিনের পরিচয়?

—ফ্রম আরলি স্কুল ডেজ। আমার কথা ও তোমাকে কোনদিন বলেনি বোধহয়?

—তুমি এখানে এসেছ পরেও না।

—দ্যাট্‌স লাইক হিম। ঠোঁটে হাসি।—টাকার বশ সব্বাই, কিন্তু ওর মতো পাগলাটে জিনিয়াসের কাছে আমাদের কোনো দাম নেই—বুঝলে? দ্যাট্‌স হোয়াই আই লাভ হিম অল্‌ দি মোর।

এ রকম শুনলে কার না ভালো লাগে। লোকটা প্রশংসায় উদার বটে। বাড়ি এসে গেলাম। আঙুল দিয়ে বাংলোটা দেখিয়ে দিলাম, ওখানে নামব—

দেখল। ছোট গেটের সামনে গাড়ি থামালে। গেট খুলে দিলে গাড়ি ভিতরে চলে যেতে পারে। কিন্তু দরজা খুলে আমি নামলাম। পিছনের দরজা খুলে বিলিও। সৌজন্যের খাতিরে মিসেস কাউলকে জিগ্যেস করলাম, একবার নামবে নাকি?

—না, থ্যাংকস, অনেক দূরে যাব। মলি কাউলের সেই ভাবলেশশূন্য মুখ।

কিন্তু সতীশ কাউল নিঃশব্দে নেমে এসে গেটটার সামনে দাঁড়ালো। বারান্দায় আলো জ্বলছে। চুপচাপ প্রায় পনের সেকেণ্ড দেখে আমার দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, গেট অফ কনসেন্সএর আইডিয়াল কটেজের আইডিয়ার সঙ্গে এই বাংলোর কোনো মিল আছে?

হেসে জবাব দিলাম, এটা আমার দিদিমা আগনেসের সময়কার তৈরি বাংলো।

...আগনেস। যার নামে আগনেস কটেজ স্কুলটা?

খবর রাখে দেখছি। মাথা নেড়ে সায় দিতে হল।

গলার স্বরে সামান্য বিস্ময়, দিলীপ ব্যাণ্ডো আগনেস ব্যাণ্ডো তোমার দিদিমা দাদামশাই?

আবারও মাথা নাড়লাম। তাই।

—ও কে ম্যাডাম। খুশি-খুশি চাউনি।—দাস ফার দিস ইভনিং।

মলি কাউল তত্ক্ষণে নেমে এসে সামনের দরজা খুলে পাশের সিটে গিয়ে বসেছে। বিশাল গাড়িটা পলকে চোখের আড়ালে। বিলি বলে উঠল, আরে ববাস মা, কি গ্র্যাণ্ড গাড়ি! আংকল কাউল বিরাট বড়লোক বুঝি?

—হুঁ। হাসি চেপে ওকে নিয়ে বাংলোয় এসে উঠলাম। মাথা খাটিয়ে বিলি নিজেই আংকল সম্পর্কটা পাতিয়েছে। বিলি আবার মন্তব্য করল, মিসেস কাউল মোটে ভালো না—হাসেও না, কথা বলতেও চায় না।

—ও-রকম বলে না।

বললাম বটে। কিন্তু এই লোকের এ-রকম স্ত্রী ভাবতে আমারও কেমন লেগেছে। এই লোক বলতে ভদ্রলোকের ভিতরে একটা উদার গভীর দিক আছে, নইলে এত বড়লোকের সঙ্গে ডিকির মতো সাধারণ মানুষের বন্ধুত্ব থাকা সম্ভব নয়। আর, 'গেট অফ কনসেন্স' দেখে আইডিয়াল কটেজের সম্ভাবনাও মাথায় নিত না। মোট কথা লোকটিকে একদিনের পরিচয়ে ভালো লেগেছে। অথবা লোকটারই সহজে ভালো লাগানোর ক্ষমতা আছে।

বিলি রাতের পড়া সেরে খেতে বসেছে। আমি শোবার ঘরে। বাবা এসেই চিন্তিত মুখে জিগ্যেস করল, ডিকি আজ অফিস যায়নি কেন?

বললাম, অফিসের কাজেই কলকাতা গেছে।

বাবা শুনে অবাক।—তার মানে? ওর ডাইরেক্ট বস্‌ই আমাকে ক্লাবে জিগ্যেস করল, কোনো খবর না দিয়ে ডিকি হঠাৎ কামাই করল কেন, তাকে একটা দরকারি কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, হঠাৎ শরীর-টরীর খারাপ হল কিনা খোঁজ নিল—

আমি হতবাক খানিক।

—ও তোকে বলে গেছে অফিসের কাজে কলকাতা যাচ্ছে?

মাথা নাড়লাম শুধু। ভিতরে বড় রকমের একটা ঝাঁকুনি খেয়েছি।

—কবে পর্যন্ত ফিরবে বলে গেছে ?

—দিন পাঁচেকের মধ্যে।

বাবা এক সময় উঠে চলে গেল। আমি আকাশ পাতাল ভেবে সারা।...বেশ কিছু দিন ধরেই ডিকির অন্য রকম হাব-ভাব দেখছি। আমাকে আর বিলিকে নিয়ে দিন কতকের জন্য এখান থেকে চলে যেতেও চেয়েছিল. কিন্তু তা বলে এ-রকম মিথ্যে কথা বলে চলে যাবে! ভিতরে খচ করে উঠল হঠাৎ। বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেল? এ-রকম ভাঁওতা দিয়ে? তক্ষুণি চিন্তাটা বাতিল করলাম। এ-রকম হলে ছেলেবেলার পরিচিত এত বড়লোক বন্ধুও তাহলে ডিকির সম্পর্কে এত শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলত না। ...হয়তো নিতান্তই একঘেঁয়ে লাগছিল, দু'দিন কোথাও গিয়ে হাফ ফেলার ফাঁক খুঁজছিল।...তাহলেও এমন মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে কেন ?

ভিতরে একটা অশান্তি থিতিয়েই থাকল।

পরদিন। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ছোট ফটকের ও-ধারে সতীশ কাউলের গাড়িটা এসে থামল। আমি আর বিলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিলি ছুটে গেল। গেটটা খুলে দিতে সতীশ কাউলও পাশের দরজা খুলে দিল। বিলি লাফিয়ে গিয়ে তার পাশে বসল। গাড়িটা কোণাকুণি খানিক ব্যাক করে গেট দিয়ে ঢুকিয়ে সিঁড়ির কাছে থামল। হাসি মুখে দু'জনেই নেমে এলো।

আমি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে হাসি মুখে জিগ্যেস করলাম, মিসেস কাউল কোথায় ?

বিলির হাত ধরে উঠতে উঠতে সতীশ কাউল হেসে জবাব দিল, সি ইজ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল...ডাজ'ন্ট্ লাইক ড্রিম-ল্যাণ্ডস—

—তার মানে ?

—তার মানে তোমাকে নিয়ে এখন আমি গ্র্যাণ্ড জেরির ওখানে গিয়ে 'গেট অফ কনসেন্স' দিয়ে ড্রিমল্যাণ্ড ঢুকছি তারপর আইডিয়াল কটেজে। রেডি ?

হেসেই মাথা নাড়লাম।—রেডি, কিন্তু তার আগে একটু চা হবে না?

—হোক, হ্বাট-উইল সেভ টাইম···এই ফাঁকে তোমার বাংলোটা দেখে নিই যদি কোনো আইডিয়া মাথায় আসে।

রঙিলাকে চায়ের কথা বলতে হবে, তাই আগে সতীশ কাউলকে ডাইনিং হলে নিয়ে এলাম। লোকটার দেখার চোখ আছে। ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। অর্থাৎ বাইরের সঙ্গে কতটা খাপ খায় দেখছে। পরিতুষ্ট মুখে মাথা নাড়ল একটু, অর্থাৎ, সুন্দর। রঙিলাকে চায়ের কথা বলে বিলির ঘর হয়ে বসার ঘরে এলাম। ঘর সাজানো আমার বাতিক। পছন্দ হবে জানা কথাই। সতীশ কাউল আবারও বাইরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আরো খুশি মুখে মাথা নাড়ল। তারপর শোবার ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, বাঃ!

পরিপাটি সুবিন্যস্ত সাজানো ঘর। কোণে-কোণে টাটকা ফুলের স্তবক। দেয়ালে গ্র্যাণ্ডির আঁকা একটাই বড় ল্যাণ্ডস্কেপ। উল্টো দিকের দেয়ালে দুটো ফোটো। একটা বিলিকে নিয়ে আমাদের তিন জনের. অন্যটা শুধু আমার আর ডিকির।

সব দেখে আর জানলা দিয়ে বাইরের দিকটা দেখে নিয়ে আমার দিকে ফিরল—গ্র্যাণ্ড জেরি আর্টিস্ট না তুমিও আর্টিস্ট?

—আমি ছোট আর্টিস্ট—স্কুলের ছেলেমেয়েদের আঁকা শেখাই।

আরো অবাক!—কিন্তু তুমি তো ফিলসফি অনার্স গ্র্যাজুয়েট শুনেছিলাম!

এবার আমি অবাক যেমন খুশিও তেমন।—এরই মধ্যে আমার সম্পর্কে এত খবর কোথায় পেলে?

হাসি ছোঁয়া দু'চোখ আমার মুখের ওপর —এ সুইট লেডি ইজ অলওয়েজ অ্যান অবজেক্ট অফ কিউরিয়সিটি ম্যাডাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে আমার আর ডিকির ফোটোটা নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। মন্তব্য করল, হ্বাট্ ওল্ড্ রাসকেল···

গলার স্বরে বিপরীত স্নেহ। দু'চোখ আবার আমার দিকে।—ফিরছে কবে?

একটা অস্বস্তি ছেঁকে ধরার উপক্রম। হেসেই জবাব দিলাম, বলে

তো গেছে পাঁচ দিন লাগবে···

হাসছে।—অফিসের কাজে গেছে বলছ, তাই···নইলে পাঁচ দিনের জাগায় পাঁচ মাসও হতে পারত। হি ইজ্ সো আনপ্রেডিকটেবল।

এবারে স্পষ্টই একটা ধাক্কা খেলাম আমি। কারণ অফিসের কাজে যে যায়নি তা তো জানি। কিন্তু এই লোকের চোখ বটে, এই অস্বস্তিটুকুও চোখ এড়ালো না। জিগ্যেস করল, এনিথিং রং?

—না রং আর কি। আমার সহজ হবার চেষ্টা—আগেও ওই রকম পালিয়েছিল বুঝি?

জবাবের বদলে ঠোঁটে সেই হাসি। তারপর ফিরে প্রশ্ন করল, তোমাদের বিয়ে হয়েছে ক'বছর?

বললাম।

—এর মধ্যে একদিনও পালায়নি?

—না তো···।

আমার দিকে চোখ রেখে বেশ সমজদারের মতো মাথা নাড়ল। —তাহলে সমস্ত ক্রেডিট তোমার—আসলে খাঁচার মতো একখানা খাঁচা পেয়েছে···ভেরি ভেরি লাকি ইনডিড্!

এই স্তোক বাক্য আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার বুকের তলায় ধড়ফড় করছে। লোকটা কি তাহলে পালিয়েই গেল নাকি! না, আমার বিশ্বাস হয় না।

চায়ের পরে তার পাশে বসেই গ্র্যাণ্ডির স্টুডিওতে এলাম। গাড়ি চড়ার লোভে বিলিও আসতে চেয়েছিল। তাকে পড়তে বসিয়ে এসেছি।

গ্র্যাণ্ডির স্টুডিওয় মেলিণ্ডা জারভিস সাগ্রহে আমাদের অপেক্ষায় ছিল। হেসে উঠে দাঁড়ালো।—এসো, দেরি দেখে আমি ভাবছিলাম।

ঘরে আর একটি অপরিচিত মুখ। সে-ও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্তরঙ্গ সুরে সতীশ কাউল বলল, হ্যালো জর্জ, গট্ হোয়াট উই ওয়াণ্ট?

লোকটা সবিনয়ে জবাব দিল, গট্ দি আইডিয়া অফ দি পিকচার

স্যার। আঙুল তুলে 'গেট অফ কনসেন্স' দেখালো।

সতীশ কাউল পরিচয় করিয়ে দিল, আমাব চিফ ডিজাইনার মিস্টার জর্জ···একে ভাবতে বলেছিলাম আমাদেব আইডিয়াল কটেজের ডিজাইন কি হতে পারে'···কিন্তু জর্জ, কিছুই হবে না, আগে তোমার মিসেস ডেটনের বাংলোটা দেখতে হবে। ম্যাডাম জারভিস, শীলার বাংলোর ডিজাইন আপনার কেমন লাগে?

মেলিণ্ডা জারভিস সাগ্রহে বলল, খুব ভালো, কিন্তু ও-রকম কটেজ করতে তো অনেক টাকা লাগবে? সাধারণ মানুষ তা নেবে কি করে?

—দ্যাটস এ ডিফারেণ্ট প্রবলেম হুইচ ইজ ভেবি ইজি টু সল্‌ভ। আমার দিকে ফিরল, তুমি কি বলো ম্যাডাম?

ইতস্তত করে জবাব দিলাম, ডাইনিং স্পেস নিয়ে চারটে ঘর হলে আইডিয়াল কটেজ হবে না···খুব বেশি হলে সব মিলিয়ে তিন ঘর হতে পারে···তাতেও অনেক খরচ পড়বে।

সতীশ কাউলের ঠোঁটের ফাঁকে সেই নিঃশব্দ হাসি যা দেখলে তাকে এ-সব তুচ্ছ সমস্যার অনেক উর্ধে মনে হয়।—আচ্ছা সেটা পরে সবাই মিলে ঠিক করা যাবে···এখন এ-রকম একটা কলোনি করতে হলে জমি কেনাব চেষ্টা কোন্ এলাকার দিকে হবে?

এ-প্রশ্নও আমাকেই। চট করে জবাব দিতে না পেরে মেলিণ্ডা জারভিসের দিকে তাকালাম। মহিলা বলল, তিস্তার দিকে হলে কি হয়—অনেক প্লেন ল্যাণ্ড আছে···।

গ্র্যাণ্ডি আপন মনে মিটিমিটি হাসছিল। এবারে শব্দ করে হেসে উঠল —খুব ভালো হয়, তিস্তার বন্যায় সমস্ত আইডিয়া একদিন না একদিন জলেব তলায় চলে যেতে পারে।

মেলিণ্ডা জারভিস রুষ্ট চোখে তাকালো তার দিকে। জবাব দিল, কিছু ভিতরের দিকে করলেই হয়।

—তার মানে লোকালয়ের দিকে। সতীশ কাউল মাথা নাড়ল, উহুঁ, নগর না ছাড়ালে গেট্ অফ কনসেন্স পার হওয়া যায় না।

ভারী ভালো লাগল। আমি সায় দিলাম, সত্যি কথা।

এরপর ঠিক হল, জর্জ আমার বাংলো দেখার পরে গ্র্যাণ্ড জেরি আর মেলিণ্ডার সঙ্গে পরামর্শ করে অন্তত ডজনখানেক ডিজাইন করবে। দরকার হলে আরো বেশি করবে। গ্র্যাণ্ড জেরি আর আমি ও. কে করলে তবে তার নিষ্কৃতি।

একই সঙ্গে জমি দেখা চলবে। জমির খোঁজ আনা আর দেখানোর ভার কাউলের। সিলেক্ট করার ভার আমার আর মেলিণ্ডা জারভিসের। কটেজ তোলার দায় দায়িত্ব সব সতীশ কাউল নিচ্ছে। কিন্তু সে-সব কটেজ পাবার যোগ্য পাত্র কারা সেটা ঠিক করব কেবল আমি। গেট অফ কনসেন্স পেরিয়ে সেই কুটীর কারা পেতে পারে এটা বোঝার সাধ্য নাকি তার পিতৃপুরুষেরও নেই।

আবেগের আনন্দে মেলিণ্ডা জারভিসের গলা বুজে আসছে। উঠে এসে সতীশ কাউলের মাথায় একখানা হাত রাখল। বিড়বিড় করে বলল, গড্ ব্লেস ইউ, তোমার মতো মানুষ আর দেখিনি।

সতীশ কাউল হেসে উঠল। বলল, সেটা সত্যি কথা লেডি জারভিস, আমার মতো ডেসপারেট ডেভিল বেশি জন্মায় না।

বাড়ির পথ। আমি পাশে বসে। কাউল গাড়ি চালাচ্ছে। আমার ভিতরটা উত্তেজনায় ভরপুর। ভাবছি, এই হুজুগে মানুষটার কত যে খরচ হয়ে যাবে ঠিক নেই। কিন্তু তার পরেও 'গেট অফ কনসেন্স' পার হবার মতো যোগ্য মানুষ আমি পাব কি?

খরচের কথা ভেবে একটু অস্বস্তি লাগছিল, দেখো মিস্টার কাউল—

—মিস্টার বাদ দাও। শুধু সতীশ বললে খুশি হব। আমার কর্মচারী ওই জর্জও তাই বলে।...কি বলছিলে?

—বলছিলাম, তিনখানা ঘরের আইডিয়া বাদ দাও, তাতে অনেক খরচ। দু'খানা ছোট ঘর, একটু দাওয়া আর একটু ডাইনিং কাম কিচেন স্পেস-এর মতো করলে অনেক বেশি লোক সুবিধে পাবে।

আলতো করে জিগ্যেস করল, 'গেট অফ কনসেন্স' পার হবার মতো অনেক লোক তুমি পাবে?

থতমতো খেতে হল একটু। -না পেলে চলবে কেন···তাহলে তো সবই পণ্ড।

মুচকি হাসল।—তুমি তো সেখানকার ফার্স্ট সিটিজেন হবে নিশ্চয়, এতটা ছড়িয়ে থাকার পর দু'ঘরের ফ্ল্যাটে থাকতে পারবে ?

এবারে জোর দিয়ে বললাম, নিশ্চয় পারব। তুমি পারলে আমার না পারার কি আছে ?

আঁতকে উঠল।—আমি! আমি কস্মিন কালেও পারব না—আমার কনসেন্সএর কোনো বালাই নেই।

হেসে বললাম, বালাই না থাকলে তুমি এ পথে এগোতেই না। জর্জকে তুমি দু'ঘর নিয়েই প্ল্যান করতে বলো—

চুপচাপ একটু। তারপর তার শিথিল বাঁ হাত অনেকটা নিজের অগোচরেই আমার ডান কাঁধের ওপর উঠে এলো। আমার ধারণা, যে-হাত সুযোগ নেয় সে-হাত বা তার স্পর্শ আমি চিনি। সে-রকম তো লাগলই না, উল্টে এটুকু লক্ষ্য করাও যেন লজ্জার। তার পরের কথাগুলোও অদ্ভুত।—দেখো ম্যাডাম, জীবনে সৎ আর অসৎ পথে আজ পর্যন্ত কত যে রোজগার করেছি নিজেরই হিসেব নেই এখন—দ্যাটস্ বিজনেস—লক্ষ্য কেবল টাকা। তার থেকে পাঁচ-দশ লক্ষ টাকা যদি একটা আইডিয়াকে রূপ দেবার জন্য বেরিয়ে যায়, আই ডোন্ট মাইণ্ড, বিকজ ইট্স ফার ফ্রম বিজনেস—কাজেই টাকার কথা না ভেবে যা ভালো হয় তাই করো।

···মলিণ্ডা জারভিস বলেছিল এমন মানুষ দেখেনি। আমিই কি দেখেছি ?

···আর এই মুহূর্তেও ভাবছি, দেখেছি কি ? কিন্তু দুটো ভাবনার কত আকাশ পাতাল ফারাক। চমকে উঠলাম। ক'টা বাজল ? ঘড়িতে আর শব্দ হয়নি তার মানে চারটেও বাজেনি এখনো। উঠে দেখে এলাম। তিনটে চল্লিশ মাত্র। আর কত ধৈর্যের পরীক্ষা দেব। ·· বিলি, অত মার খেয়ে তুই কেবল কাতরালি, আর্তনাদ করে কাঁদলি না কেন ? তাহলেও আমি থেমে যেতাম, ভাবতাম তোর ভিতরের

ওই ভয়ঙ্কর কীটটা শেষ হয়েছে। কিন্তু ও তা করবে কেন? মায়ের ছেলে মায়ের গোঁ পেয়েছে! ক্লাসে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়, তবু গোঁ ধরে বসে আছে। এই জন্যেই আবার মারতে ইচ্ছে করছে তোকে আমার। শরীর খুব খারাপ লাগছে বললেই তো টিচার গায়ে হাত দিয়ে বুঝত কত জ্বর। তক্ষুনি ছেড়ে দিত।

জ্বরের কথা মনে হতে আবার উতলা আমি। রাতের দিকে জ্বরে কাতরালে কোথায় ডাক্তার পাব? রঙিলাকে ক্লাব হাউসে পাঠিয়ে আগে থাকতে বাবাকে একটা খবর দিয়ে রাখব? সন্ধ্যার পরে একেবারে যেন চা বাগানের ডাক্তারকে ধরে নিয়ে আসে? ওষুধ তো দরকার হবেই, ধুলো পড়া চ.বুকের ঘায়ে শিশুর চামড়া ফেটে রক্তাক্ত হয়েছে—টিটেনাস ইনজেকশন দেওয়া দরকার হবে কিনা কে জানে।

…কিন্তু কিছু পারা গেল না। আমার ভিতরে যে মরতে কে আর একজন বসে আছে কে জানে। সে কিছুই করতে দিচ্ছে না। চেয়ারটা বারাণ্ডার একবারে ও-মাথায় টেনে নিয়ে অবসন্নের মতো বসে পড়লাম। এখান থেকে রাস্তার অনেকটা দেখা যায়।

॥ ছয় ॥

…দেখতে দেখতে বিলিও আংকল কাউলকে কম ভালোবাসেনি। বাচ্চা ছেলেরা ঘুষে তো ভোলেই, আবার দরদের বুনুনিও চেনে। বিলি এই দুইয়েতেই হাবুডুবু। আট দশ দিনের মধ্যে কত জিনিস এলো তার জন্যে ঠিক নেই। সতীশ কাউল তার ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে পরদিন থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই এসে যাচ্ছে। সেটা বিলির খাতিরে। গাড়ি চড়ার নামে পাগল। আগে ওকে খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। স্টিয়ারিংএ হাত দিতে দেয়। হর্ন বাজাতে দেয়। এই স্বাধীনতা পেয়ে বিলি খুশিতে আটখানা। আংকল কাউলের মতো এত ভালো আর হয় না।

আমি সতীশকে বলি, তুমি ওকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছ।

সতীশ কাউল হাসে। বলে, আমার নেই সে জন্যে নো রিগ্রেট। কিন্তু আশ্চর্য দেখো, বিলি ছাড়া তোমার এই ছবির মতো সংসার ভাবতে গেলেও বুকের ওপর দিয়ে বুলডোজার চলে যায়।

আমার কষ্টই হযেছে। এত আছে লোকটাব, অথচ এদিক থেকে বঞ্চিত।

বিলির গাড়ি চড়ে বেড়ানো হলে তবে আমাদের কাজে বেরুনো। কাজ বলতে জমি দেখা। আগে মেলিণ্ডা জারভিসকে তুলে নিই। কিন্তু তার শরীরটা ইদানীং খারাপ যাচ্ছে বলে সব দিন বেরুতে পারে না। দুজনেই যাই। ছুটির দিনের দুপুরে শালজুড়ি ছেড়ে অনেক দূরে দূরেও চলে যাই। এত দেখার পর মাত্র তিনটে জায়গা নোট করা হয়েছে। একটা শালজুড়ির শেষ মাথায়। অন্য দুটো বাইরে।

ভদ্রতার খাতিরে মাঝে মাঝে আমি মলি কাউলের কথা জিগ্যেস করি।—মহিলা একেবারে একদিনও আসেন না, কি ব্যাপার?

—তোমাকে তো বলেছি, সি ইজ ওনলি ইণ্টারেস্টড ইন্ মি অ্যাণ্ড্ মাই বিজ্‌নেস। নাথিং—নাথিং এলস!

—এটা তোমার বাড়ানো কথা, আমাদের আইডিয়াটা তাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলেছ?

—বললে সি উইল বি এ ডিট্যারেণ্ট ফ্যাক্টর।

ব্যস, তারপব থেকে আমি চুপ।

এত সবের মধ্যেও প্রথম পাঁচটা দিন ভয়ঙ্কর উতলা ছিলাম। ডিকির এমন ব্যবহারের কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ও শেকল ছিঁড়ে পালিয়েছে ভাবতে গেলে বুকের বাতাস কমে যেত। ধৈর্য ধরে সব কাজ করেও পাঁচ-পাঁচটা দিন কি-ভাবে কাটিয়েছি আমিই জানি। মাঝখানে সর্দিজ্বর হওয়াতে বাবাও দিন তিনেক আসেনি। কিন্তু জায়গা দেখার ঝোঁকে পড়ে আমার তাকে দেখতে যাওয়াও হয়নি।

পাঁচ দিনের দিনও ডিকি এলো না যখন, আমার ভেতর-বার অবশ। ছ'দিনের দিন বাবা অবশ্য খবর দিল, ডিকি দু'তিন দিন পরেই

ডাকে অফিসে ছুটির চিঠি দিয়েছে, পাঁচ দিন নয়, জরুরি কাজে সে দশ দিনের ছুটি চেয়েছে। আর ছ'দিনের দিন আমি তার চিঠি পেয়েছি। লিখেছে. অফিসের কাজে আটকে গেছে, ফিরতে আরো দিনকতক দেরি হবে।

এই মিথ্যের দরুণ ভিতরে ভিতরে জ্বলেছি প্রথম। অবাকও লেগেছে। চিঠিতে আমাকে ছেড়ে বিলিকেও একটা চুমু পর্যন্ত নেই!··· লোকটার হল কি হঠাৎ? প্রায় একমাস ধরে তাকে এমন দেখছি কেন? চিঠি পেয়েও রাতের অবকাশে মনটা আদৌ সুস্থির থাকত না।

···দশ দিনের দিন রাত ন'টায় ডিকি এলো। হাসি-হাসি মুখ, দুষ্টু দুষ্টু চাউনি। যেন বলতে চায় কেমন আক্কেল দিলাম?

কিন্তু আমার চোখকে ও ফাঁকি দিতে পারেনি। মনে হয়েছে এই হাসি এই চাউনি অকৃত্রিম নয়। চোখের কোলে কালি। ফর্সা রং আরো ফ্যাকাশে। এ ক'দিন ভালো করে ঘুমোতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। ভালো যে ছিল না আমি এক নজরে বুঝেছি।

সুটকেসটা রেখে আগে বিলির ঘরে এলো। ঘুমন্ত বিলির কপালে আর ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেল। আমি দরজার কাছ থেকে দেখছি। ফিরতে আগে আগে শোবার ঘরে চলে এলাম।

ডিকিও এসে হেসে-হেসে দু'হাত বাড়িয়ে কাছে এগলো।

—দাঁড়াও!

আমার গলার স্বরে ও থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—এ ক'দিন কোথায় ছিলে?

—বাঃ, কলকাতায়···অফিসের কাজে আরো ক'টা দিন আটকে গেলাম—

—অফিসের কাজে তুমি কলকাতায় যাওনি, তাদের কিছু না জানিয়ে চলে গেছ, পরে ছুটির দরখাস্ত দিয়েছ। বাবা বা মনোহর ডাকুয়া থাকতে এই মিথ্যে চাপা থাকবে না এই চিন্তাও তোমার মাথায় আসেনি—কিন্তু আমার কাছে এত মিথ্যে বলার মতো অধঃপতন তোমার কেন হল?

মুহূর্তে সমস্ত মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। সামলে নিয়ে হাসতে চেষ্টা করল।—আমি একটা ইডিয়েট, এর থেকে একটা ভালো কিছু অজুহাত যদি মাথায় আসত—

—ডিকি! কোথায় গেছলে?

—এটা সত্যি কথা—কলকাতাতে।

—কেন গেছলে? কেন আমাকে ভাবতে হল তুমি আমাকে একেবারে ছেড়ে গেলে কিনা?

আকস্মিক কোনো আঘাতে মানুষটা যেন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। তারপর চাপা আবেগ চাপা উত্তেজনায় গলা দিয়ে আর্তনাদের মতো বেরুলো।—আমি? আমি তোমাকে ছেড়ে যাব? তুমি ভাবতে পারলে?

—তাহলে মিথ্যে বলে তুমি চলে গেলে কেন? কেন গেলে?

ক্লান্ত দেহ বিছানার দিকে এগিয়ে এলো। বসল।—আমার মাথায় মাঝে মাঝে ভূত চাপে···বুঝলে। আমি গেছলাম নিজের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করতে।

—কিসের বোঝাপড়া?

—তুমি যা বলছিলে ঠিক তার উল্টো। আমার জীবন থেকে তুমি সরে গেলে আমি বাঁচব কিনা যাচাই করে দেখতে। দেখলাম বাঁচব না। তারপর যে-ই ঠিক করলাম, মরতে হলে তোমার কাছে থেকে তোমাকে আঁকড়ে ধরেই মরব—একটা দিনের জন্যেও তোমাকে ছেড়ে যাব না, তক্ষুণি মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল—মনে মনে ছুটতে ছুটতে তোমার কাছে এসেছি।

মাথার গণ্ডগোল শুরু হল কিনা ভেবে পেলাম না। আমি ছেড়ে গেলে বাঁচবে কিনা ভাবার জন্য দূরে সরে গেছল। ভাবলাম, কাল চুপিচুপি বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। মায়ের ওই অকারণ রোগের কথা মনে পড়লে ভিতরে ভিতরে এখনো আতঙ্ক।···আজ প্রায় এক মাস হল অন্য রকম দেখছি। কিছু একটা হওয়া বিচিত্র নয়, নইলে এই ভাবনা আসবে কেন? এগিয়ে এলাম। ওর কাঁধে হাত

রাখলাম।—ডিকি, এই শালজুড়ির অনেকে আমার জীবনে আসতে চেয়েছিল—তার মধ্যে আমি তোমাকে নিয়েছি ছেড়ে যাবার জন্যে নয় এটা তুমি মনে গেঁথে রাখতে পারো।

সেই রাতে ডিকির আদরে সোহাগে আমি নাস্তানাবুদ। সাবধান হবার ফুরসত পর্যন্ত পেলাম না।

পরদিনই আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বাবাকে পেয়ে বিলির দারুণ ফূর্তি। তারপর একজন স্কুলে আর একজন অফিসে।

বিকেলে যথাসময়ে সতীশ কাউল এলো। ডিকিকে অবাক করে দেবার জন্যে ওর কথা বা আমাদের প্রোগ্রামের কথা কিছুই বলিনি। সতীশকে বললাম, বোসো, কলকাতা থেকে ফিরেছে, অফিস থেকে আসুক তারপর একসঙ্গে বেরবো।

সতীশ আমাকে নিরীক্ষণ করে দেখার ভান করল। তারপর মন্তব্য।—এই জন্যেই তোমার মুখে সাজ রঙের ছোপ দেখছি।...কিন্তু আমি তো এর মধ্যে কার মুখে যেন শুনেছি ডিকি অফিসের কোনো কাজে কলকাতায় যায়নি...হঠাৎ কি-জন্য পালিয়েছিল খোঁজ নিয়েছ?

শোনা-মাত্র কি রকম খটকা লাগল। সতীশ কাউলকে সেধে কে এমন খবর দিয়ে গেল ভেবে পেলাম না। আর দিয়ে থাকলেও ডিকি ফেরার আগে এ-প্রসঙ্গ তোলেনি কেন? হতে পারে আমি দুশ্চিন্তা করব বলেই চেপে গেছে। তবু একটা অগোচরের অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক মুখেই জবাব দিলাম, ফিরে এসে নিজেই বলেছে অফিসের কাজে যায়নি—স্বভাব তো জানোই, একঘেয়ে লাগছিল বলেই হয়তো ক'টা দিনের জন্য পালিয়েছিল।

সতীশ কাউলের দু'চোখ আমার মুখের ওপর আটকে আছে। ঠোঁটে হাসি। মাথা নাড়ল, ওকে যতটা জানি, তোমার মতো একজন পাশে থাকলে একঘেয়ে লাগতে পারে না—বাট্ লেট্স ফরগেট দ্যাট, ইট ইজ এ প্লেজার টু সি ইউ হ্যাপি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কাউলের ঝকঝকে গাড়িটা দেখতে দেখতে

ডিকি গেট দিয়ে ঢুকল। তারপর বারান্দায় আমাদের বসা দেখল। বিলি বাবার কাছে ছুটে গেল। আসতে .আসতে আংকল কাউলের সমাচার শোনাচ্ছে নিশ্চয়।

ডিকি সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠল। দু'চোখ কাউলের দিকে।

সতীশ কাউল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অপলক চাউনি ডিকির দিকে।

কোমরে দু'হাত তুলে সে ঘটা করে ডিকিকে দেখছে।

তেমনি কোমরে দু'হাত তুলে ডিকি কাউলকে দেখছে।

বিলি মজা পেয়ে হাত তালি দিয়ে উঠল।

সতীশ কাউল চাপা গর্জন করে উঠল।—ইউ ব্লাডি ফুল। বউ ফেলে তুমি দশ দিন ধরে কলকাতায় কাজ দেখিয়ে বেড়াচ্ছ?

—ইউ স্কাউনড্রেল! সেই ফাঁকে তুমি প্রক্সি দিয়ে বেড়াচ্ছ?

কি মুখ রে বাবা দু'জনেরই!

তারপরেই দু'জনে সে-কি আনন্দের জড়াজড়ি!

সতীশ কাউল তো ডিকির গালে একটা চুমুই খেয়ে বসল। তারপর বলল, ইওর ওয়াইফ ইজ্ এ জেম।

ডিকি বলল, টেক্ কেয়ার, তোমার জেমএর সঙ্গে আমি আমার জেম বদলাবদলি করছি না!

বিলি হাঁ করে মজা দেখছে। আমি ছদ্ম কোপে বলে উঠলাম, কি অসভ্যের মতো কথা-বার্তা!

চা-পর্বের পর সকলে মিলে গাড়ির দিকে। এর মধ্যে ডিকি আমাদের প্ল্যানের মোটামুটি আভাস পেয়েছে। ডিকি বলে উঠেছিল, আইডিয়ার জন্য আমার জেম-এর কি মাইনে?

সতীশ জবাব দিয়েছে, মাইনে তুমি তো কম দিচ্ছ না দেখছি—আবার আমি কেন!

আমি মনে মনে বলছি, অসভ্য কেউ কম নয়।

আজ বিলিও যেতে ছাড়েনি। কিন্তু আমার আরো একটু বিস্ময়ের ধাক্কা বাকি ছিল। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে সতীশ প্রথম

বিলিকে হুকুম করল, ওঠো—'

সামনে বসতে পেয়ে বিলি মহা খুশি।

এবারে পিছনের দরজা খুলে আমাকে বলল, ওঠো ম্যাডাম।

উঠলাম। তারপরেই অবাক আমি। সতীশ কাউল পিছনের সীটে আমার পাশে বসে পড়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর ডিকিকে হুকুম করল, চালাও—!

আমি হাঁ। মুহূর্তের জন্য ডিকির ভুরুতে একটু ভাঁজ পড়ল দেখলাম। বলল, আমার হাঁটু একটু জখম তুমি জানো।

—আই নো, ডোণ্ট ওয়েস্ট টাইম!

ডিকি ড্রাইভারের সীটে বসল। দক্ষ হাতে গাড়ি স্টার্ট দিল। তারপর আমি সপুলকে অনুভব করলাম, সতীশ কাউলের থেকেও ডিকির পাকা হাত (এটা আমার আনন্দের অভিব্যক্তিও হতে পারে)।

একটু বাদে মুখ টিপে হেসে সতীশ বলল, কি রকম বুঝছ ম্যাডাম?

আমি বলে উঠলাম, তাজ্জব বনে যাচ্ছি, ডিকি এমন ডুবে ডুবে জল খায়।

এবারে সতীশের হা-হা হাসি। মন্তব্য, এর থেকে ভালো কমপ্লিমেণ্ট আর হয় না।

দেখলাম, ডিকির ফ্যাকাশে মুখ এখন লালচে দেখাচ্ছে। ওদিকে বাবাকে এমন সুন্দর গাড়ি চালাতে দেখে বিলি হাঁ খানিকক্ষণ। তার পরেই বায়না, বাবা আমাকে গাড়ি চালাতে শেখাও।

ডিকির গম্ভীর মন্তব্য, পরে। এখন শেখালে তোর আকেল চাপা পড়বে।

···আমি ভাবছি অন্য কথা। ডিকির পিছনের খবর কিছুই রাখি না। বিলিতী গাড়ি যে এমন চালাতে পারে, সে নিশ্চয় এ-রকম গাড়ির মালিক ছিল কোনদিন।···এমন কি হতে পারে, ডিকি তার বিষয় আশয়ের কোনো ফয়সলার জন্য কলকাতা চলে গেছল? সেখান থেকে হতাশ হয়ে ফিরেছে? আর এই সব চিন্তার কারণেই একমাস যাবত তার এ-রকম পরিবর্তন?

কি আনন্দের মধ্যে না কাটল সন্ধ্যাটা। ফিরতে রাতই হল একটু। আজ সকলকে পেয়ে গ্র্যাণ্ডিও ছাড়ল না। জমি দেখার পর আবার তার ওখানেই মেলিণ্ডাকে নামাতে গেছলাম! আর আটকেও গেলাম।

তিনজনেরই খাওয়া হতে বিলি শুতে চলে গেল! আমি রঙিলার সঙ্গে সংসারের ব্যাপারে কথাবার্তা সেরে এসে দেখি ডিকি ঘরে নেই। বারান্দা দিয়ে এসেছি সেখানেও ছিল না। হঠাৎ বসার ঘরে বাঁশির আওয়াজ। ঘরের আলো জ্বলেনি। আমি বারান্দা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুরটা চেনা চেনা লাগল। আরো একটু বাদে চিনলাম। ওই বলেছিল বেহাগ। কিন্তু সুরের এমন করুণ আকৃতি বোধহয় আগেও শুনিনি। মনে হচ্ছে একটা ডানা-ভাঙা পাখি ওড়ার তাগিদে ঝাপটে মরছে, তার আকুলি বিকুলি চলেছে। আবার অতল সমুদ্রে পড়ার ওরই সেই উপমাটা মনে পড়ল। অতল পাথারে পড়ে আকুল হাহাকারে কেউ ডাঙা খুঁজছে, পাচ্ছে না।

আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। পায়ে পায়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকলাম। ডিকি টেরও পেল না বোধহয়। বাজিয়েই চলল। আমারই কেমন কান্না পাচ্ছে। অন্ধকারেই সোফার কাছে এগিয়ে পাশ থেকে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলাম।

বাঁশি থেমে গেল।

—কি হয়েছে···ডিকি?

হাল-ছাড়া গলায় ও বলল, বেহাগের শর্ত শেষ হল না, কেউ এসে হাত ধরার আগেই সুর থেমে গেল।

আমি থমকালাম একটু। তারপর হেসেই বললাম, কেউ এলো না কি রকম?···আমি তাহলে কে?

ও ধড়মড় করে উঠে হাতের বাঁশি সুদ্ধু আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর সে কি আদর আর সে কি আবেগ।

হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে এলাম। ওর দু'চোখে সমুদ্র-তৃষ্ণা। বাধা দিলাম না। সাবধান হবার কথাও মনে থাকল না। পরিতৃপ্তিতে একটা বাচ্চা ছেলের মতো ও আমার বুকের ওপরে ঘুমিয়েই পড়ল বুঝি।

আমার মাথায় তখন হঠাৎ একটা চিন্তা এসেছে। প্রায় আধ-ঘণ্টা বাদে ডিকি উঠে পাশে শুয়ে আমাকে বুকে টেনে নিল। আমি জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা সতীশ কাউলের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়—ও বলেছিল ছোট বেলায় স্কুল থেকে···ঠিক নাকি ?

আমার মনে হল ডিকির সর্বাঙ্গ যেন মুহূর্তের জন্য কাঠ হয়ে গেল। সত্যি না মনের ভুল বুঝলাম না। জবাব দিল, ঠিক।

আবার বললাম, ও তো এ ক'দিন তোমার দারুণ প্রশংসা করেছে আমার কাছে, কিন্তু সে নিজে লোক কেমন ?

আমাকে ছেড়ে বুকে ভর দিয়ে মুখ তুলল। দু'চোখ উদগ্রীব।—আমার প্রশংসা করেছে···কি প্রশংসা ?

—তুমি একটা যাচ্ছেতাই লোক, এক নম্বরের বাউণ্ডুলে, কেবল তোমার বাঁশি শুনলে কারো না মজে উপায় নেই—এই সব।

ঠাট্টা বুঝল। বলল, সতীশও ভয়ঙ্কর ভালো লোক, একবার কোনো সংকল্প মাথায় ঢুকলে তার আর নড়চড় নেই।

ভালোই লাগল। বললাম, আমাদের গেট অফ কনসেন্সএর ওধারে আইডিয়াল কটেজ তাহলে হবেই ?

—কাউল চাইলে হবেই। মুখে অদ্ভুত হাসি।—আর যদি সংকল্প করে, তোমাকে চাই—তাও পাবেই।

ওর মাথায় জোরেই একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম।

কিন্তু ডিকির ব্যতিক্রমটা আমি দিনে দিনে অনুভব করছি। থেকে থেকে একেবারে মিইয়ে যায়, চুপসে যায়। আবার ডবল আবেগে সব ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। তখন সবেতে দ্বিগুণ উৎসাহ। দুই বন্ধুর দেখা হলে জিভের লাগাম নেই কারো। একজন আর একজনকে যা খুশি তাই বলে। ঠাট্টা ঠিসারাগুলো অনেক সময় শালীনতার বাইরে মনে হয়। আবার এত বেপরোয়া যে হাসিও পায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ডিকির নিজের কোনো মনের বিবরে ঢোকাই ক্রমশ বাড়ছে। অফিস থেকে ইচ্ছে করেই দেরিতে ফেরে কিনা বলা যায়

না। বলে কাজের চাপ। ওর জন্যে অপেক্ষা করে করে বেরিয়ে যেতে হয়। একদিন বাড়ি আসে নি, সতীশের গাড়িতে তাকে অফিস থেকে তুলে নিতে গিয়ে শুনি সেখানেও নেই। সতীশ কাউল হাসে, ওর কথার কোনদিন ঠিক আছে—দেখেছ ?

কোথায় ছিল জেরা করলে ডিকি চটে যায়। এক রাতে সতীশ আমাকে নামিয়ে দিয়ে যেতে বিল্লির ঘরে ঢুকে দেখি ডিকি ওর কান মুলে দিচ্ছে। আমাকে দেখে রুক্ষ গলায় বলে উঠল, তুমি তো বিবেকের গাছ পুঁতে বেড়াচ্ছ—ছেলেটা যে আকাট মুখ্যু হচ্ছে খেয়াল আছে ?

বিল্লি সহজে কাঁদে না, কিন্তু অপমানে চোখে জল টলটল করছে। আমি ওকে বকা-ঝকা করি, কিন্তু ওর বাবা ওকে কখনো কিছু বলে না—আজ সে ওর কান ধরেছে !

কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে আমি বেশ বুঝছি। ডিকি দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখ গর্তে ঢুকছে, দু'দিকের চোয়াল উঁচিয়ে উঠেছে। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেছি। কিন্তু বাবা ওকে ডাক্তারের ঘরে নিয়ে ঢোকাতে পারে নি। বাঁশি বাজানো ছেড়েছে। বাজাতে বললেও এড়িয়ে যায়।

মাস দুই বাদে একদিন এক ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট আর একজন ডাক্তারকে এনে হাজির। ফর্মে তার সইসাবুদ করা সারা। আমার বাকি। ফর্ম বার করে আমাকে সই করতে বলল।

আমি অবাক।—কি ব্যাপার ?

তাতেও বিরক্তি।—একটা জয়েন্ট ইন্সিওরেন্স করছি বুঝছ না ? আগে সইটই করে এদের ছেড়ে দাও।

ফর্মটা নিয়ে দেখলাম চল্লিশ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্স। একজনের অবর্তমানে আর একজন পাবে। ডিকির মেজাজের ভয়েই চুপচাপ সই করে দিলাম। ওর কথা মতো একটা সাদা কাগজেও সই করতে হ'ল। ডাক্তার তার সামান্য পরীক্ষার কাজ সারল। ডিকি কতগুলো নোট গুণে এজেন্টের হাতে ফার্স্ট প্রিমিয়াম দিয়ে দিল। ডাক্তার আর

এজেন্ট ঘর থেকে বেরুতেই বাইরে সতীশ কাউলের গাড়ির হর্ণ। তবু তক্ষুণি না বেরিয়ে এসে ডিকিকে জিগ্যেস করলাম, হঠাৎ ইন্সিওরেন্স কেন?

—মনে হল থাকা ভালো। ও হাসতে হাসতে জবাব দিল।

—তা বলে জয়েন্ট ইন্সিওরেন্স কেন? একলার নয় কেন?

আবারও হাসি।—যে চাকরি করি, চল্লিশ হাজার টাকার প্রিমিয়াম আমি একলা গুণব কি করে—তু'জনে ভাগাভাগি করে দেব তাই তু'জনের নামে।...আর অপেক্ষা করছ কেন, শ্যামের বাঁশি তো বেজেছে—যাও।

এ-ধরনের ঠাট্টায় এখন আর আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। বললাম, সতীশকে ডাকি, তুমি কিছু খেয়ে নাও, তারপর এক সঙ্গে বেরোই—আমাদের সাইট ঠিক হয়ে গেছে, জমি কেনা হয়ে গেছে কিছুই তো দেখলে না।

ডিকি তিরিক্ষি হয়ে বলে উঠল, তোমরাই দেখগে আমার আর দেখে কাজ নেই। ভালো কথায়ও এই মেজাজ।

আবার হর্ণ বাজল। ওর মুখ তু'চোখে আটকে নিয়ে বললাম, সতীশকে তাহলে জানিয়ে আসি আমি যেতে পারছি না?

—কেন? যেতে পারছ না কেন? কে তোমাকে আটকে রেখেছে? মুখ ছেড়ে কানের ডগা পর্যন্ত লাল।

—তুমি। থমকে মুখ তুলে তাকাতে আবার বললাম, কি-ভাবে কাকে আটকে রাখা যায় এই জ্ঞান-বুদ্ধিও তোমার যেতে বসেছে দেখছি।

রাগতে গিয়েও এবারে হেসে ফেলল। আমার এ-রকম ঠাণ্ডা মেজাজও ওর অচেনা নয়। বলল, চলো।

ডিকি সঙ্গে থাকলে সে-ই গাড়ি চালায়। আজ বিলি নেই সঙ্গে। কিন্তু সতীশকে ডিকিই সামনের আসনে তার পাশে বসতে দিল না। আমার সঙ্গে পিছনের সীটে ঠেলে দিল। লোকটা খুব স্বাভাবিক এখন। হাসি খুশি। মনে মনে ঠিক করলাম, যে-ভাবে হোক সঙ্গে

নিয়ে বেরুতে হবে—টেনে বার করতে পারলে তখন ঠিক, দেখতেই পাচ্ছি।

ঠাট্টার সুরেই সতীশকে বললাম, আচ্ছা, এত বড় একটা কাজ হচ্ছে, তোমার বন্ধু বেরুতেই চায় না কেন বলো তো?

সতীশ গম্ভীর মুখে জবাব দিল, আমার ভয়ে।

গাড়ি বেশ স্পিডেই চলছিল। আচমকা জোরে ব্রেক। আমরা সামনের সিটের পিছনে মুখ থুবড়ে পড়লাম, সতীশের মাথার সঙ্গে আমার মাথা ঠুকে গেল—আমি প্রায় আধাআধি ওর কোলের ওপর।

গাড়ির ব্রেক পায়ে চেপে রেখেই নিরীহ মুখখানা করে ডিকি ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। অর্থাৎ ভয়খানা কেমন বুঝিয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসতে সতীশ কাউল সামনের লোকের উদ্দেশে চাপা গর্জন করে উঠল, ইউ রাসকেল!

ভালো মুখ করে ডিকি জিগ্যেস করল, খুব ভালো লেগেছে? আর দুই একবার এ-রকম করব?

আমি রাগ দেখিয়ে বলে উঠলাম, থামো—আমি নেমে যাচ্ছি!

চোখের পলকে গাড়ি স্পিড নিল।

সতীশ কাউলের সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটলে ডিকির চরিত্রের এই একটা দিক হয়তো কোনদিনই জানতে পারতাম না। তার এই অকারণ রাগ অকারণ অভিমান আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। যখন সহজ তখন বেশি মাত্রায় সহজ। কেন যেন এই সহজতাও কৃত্রিম মনে হয়। ভাবি, ডিকি কি আমাকে অবিশ্বাস করে? মালটিমিলিয়েনেয়ার সতীশ কাউলের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ মেলামেশা দেখে ওর হিংসে হয়? টাকার জোরে সতীশ আমাকে বশ করে ফেলতে পারে এই ভয় ওর? ডিকি আমাকে এত ঠুনকো ভাবতে পারে?

একদিন স্পষ্ট করেই জিগ্যেস করলাম, তুমি দিনকে দিন এ-রকম হয়ে যাচ্ছ কেন? তোমার সমস্যা আমি না সতীশ কাউল।

ও বিড়বিড় করে বলল, এ কথার কি অর্থ…।

আমার গলার স্বর তীক্ষ্ণ একটু।—অর্থ তোমার না বোঝার কথা

নয়, যা জিগ্যেস করছি তার স্পষ্ট জবাব দাও।

ডিকি মিইয়ে গেল। ফ্যাকাশে মুখ। হালছাড়া চোখে খানিক আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলে উঠল, আমার সমস্যা আমি নিজে—বুঝলে? আর কেউ না, উঃ! বলতে বলতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর কটা দিন আবার খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তাই দেখেও আমার মনে হয়েছে ডিকি নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করছে।

সতীশ কাউলের জমি কেনা সারা। কলোনির কত আগে কোথায় 'গেট অফ কনসেন্স' হবে তারও খসড়া হয়ে গেছে। জঙ্গল সাফ হয়েছে। এখন পাথুরে মাটি মোটামুটি সমান করার কাজ চলছে। সতীশের প্ল্যান একেবারে সমান করা হবে না, তাতে জায়গাটার প্রাকৃতিক আকর্ষণ নষ্ট হবে। আমারও তাই মত।

কিন্তু কাজে মন দেব কি। পরের দু' মাসে অর্থাৎ এই চার মাসের মাথায় ডিকির দুর্বোধ্য রোগ যেন আরো চার হাত গভীরে ঢুকেছে। বাবা রাতে একদিন ডাক্তার নিয়ে আসতে তাকে প্রায় অপমান করে তাড়ালো। সকাল থেকে রাতের মধ্যে বাড়িতেই থাকে না। বেশি রাতে শুতে আসে। তখন খেতে না দিয়ে জেরা করব কি? খাওয়া হলেই দু'তিনটে ঘুমের ওষুধ গিলে ঘরের আলো নিভিয়ে দেবে।... ছেলেটা পর্যন্ত ভয়ে এখন তার বাবার কাছে ঘেঁষে না।

দিন পনের আগে হঠাৎ আবার এক কাণ্ড করল। অফিসের কাজ ছেড়ে দিয়ে সতীশ কাউলের ব্যবসায় ঢুকে পড়ল। বলল, এই ছাইয়ের চাকরিতে কোনদিন সুখের মুখ দেখা যাবে? তার থেকে কাউলের সঙ্গে ভিড়ে হাতে কলমে শেখা যাক কিছু। আমি মাইনে চাইনি, কিন্তু সতীশ খুশি হয়ে অফিসের ডবল এলাওয়েন্স দেবে বলছে। ও আগেও আমাকে কত বার ডেকেছে ঠিক নেই, এবার লেগেই গেলাম।

বন্ধুর কাছে চাকরি নেওয়াটা আমার একটুও পছন্দ হল না। ডিকি যা-ই বলুক, ব্যবসার সুবিধে হবে বলে সতীশ কাউল তাকে অনেক বার ডেকেছে এ আমার একটুও বিশ্বাস হয় না। আগে যদি ডেকেই থাকে

তো বন্ধুত্বের খাতিরে ডেকে থাকতে পারে। নইলে ডিকির ব্যবসার মাথা কেমন এ ওর সঙ্গে সাত দিন মিশলেই বোঝা যায়। আমার মনে হল, আগে না হোক, এখন সতীশও ডিকির মানসিক অবস্থা বুঝে ওইটুকু সহানুভূতি দেখিয়েছে। মানুষটা তো আর কম চালাক নয়। আমি বাবাকে বলেছি বন্ধুর বিজনেসে এক মাসও টিকতে পারবে না, আংকল্ ডাকুয়াকে একটু বুঝিয়ে বলে রেখো চাকরিটা যাতে না যায়।

বাবা আমার কথায় সায় দিয়েছে। বলেছে, তোর কোনো চিন্তা নেই। তাছাড়া ওর ডিরেক্টর বসও আমার বন্ধু, তার সঙ্গে কথা হয়েছে, যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হয় ততদিন চাকরির জন্য ভাবতে হবে না। কিন্তু সুস্থ হবে কি করে, কি রোগ তাই তো ধরতে দিচ্ছে না।

…রোগ ধরা পড়ল আরো তিন দিন বাদে। আমার সংসার আমার জগৎ চোখের সামনে খান-খান হয়ে গেল।

‥ সেদিন সতীশকেও একটু গম্ভীর মনে হচ্ছিল। যেখানে গেট অফ কনসেন্স হবে, সেখানে গাড়ি থামালো। মাটিতে বসে আমাকে বলল, বোসো ম্যাডাম।

হাত দুই ফারাকে আমিও পাথুরে মাটিতে বসলাম। কোনরকম ভনিতা না করে সতীশ বলল, তুমি ডিকির জন্য খুব উতলা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি আবার তোমার জন্য উতলা।

অকারণে চমকে উঠলাম।—কেন?

—তোমার ডি-ডিকে—আচ্ছা ডিকিই বলি, নিজের ফার্মে টেনে নিয়েছি তোমাকে কিছুটা সেফ রাখার জন্য! ও আমাকে যমের মতো ভয় করে।

আমার গলা দিয়ে প্রায় আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।—এ-সব কি বলছ তুমি…?

—ঠিকই বলছি। তোমার মতো মেয়ে আমি কম দেখেছি, তাই মাথা ঘামাচ্ছি।…আগে আমার কয়েকটা কথার জবাব দাও। আমি এই শালজুড়িতে আসার পরেই ও কলকাতায় অফিসের কাজের নাম করে কেন পালিয়েছিল?

আমার বুকের তলায় থর থর কাঁপুনি।—অফিসের কাজে যায়নি, কিন্তু এ-কথা কেন?

সতীশ কাউল অল্প অল্প মাথা নাড়ল। বলল, আর ফিরবে ভাবিনি···কিন্তু তোমার মতো মেয়েকে একেবারে ছাড়বেই বা কি করে।···ছু'মাস আগে ও আর তুমি একটা জয়েন্ট ইন্সিওরেন্স করেছ?

···ও করিয়েছে।

—কত টাকার?

—চল্লিশ হাজার। আমি কলের পুতলের মতো জবাব দিচ্ছি।

—একজন মরলে অন্য জন টাকা পাবে?

মাথা নাড়লাম। তাই।

—দ্যাট্ ডেভিল এগেইন!

বলে উঠলাম, কিন্তু কি হয়েছে···আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এগিয়ে এলো একটু। খুব নরম হাতে কয়েকবার আমার পিঠ চাপড়ে দিল।—ভয় পেও না, আমি আছি। ইউ হ্যাভ টু টেক ডিসিশন উইথ কারেজ। যা বলার বলছি, আগে আরো একটা কথার জবাব দাও।···সততার ফটক দিয়ে তুমি তোমার আইডিয়াল কটেজে ঢুকতে চাও, অসৎ সংশ্রবে থেকে সেটা সম্ভব?

মাথা নাড়লাম। সম্ভব নয়। তারপর হঠাৎ রেগে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম, তুমি এ-সব কি বলছ—তোমার উদ্দেশ্যটা কি? আর কতক্ষণ এভাবে দগ্ধাবে আমাকে?

আবারও পিঠ চাপড়ালো।—এখন অধৈর্য হবার সময় নয় মাই ডিয়ার—খুব ঠাণ্ডা থাকতে চেষ্টা করো।···তুমি একজন আর্মির পলাতক আসামীকে নিয়ে ঘর করছ, এখনো ধরা পড়লেই যার কোর্টমার্শাল হবে—ওর নাম ডিকি ডেটন নয়, ওর নাম ডেভিড কৃপাল ডাট্—ডি-কে ডাট্—তাই থেকে ডিকি ডেটন হয়েছে—পাঞ্জাবী ক্রিশ্চিয়ান, কোনো পূর্বপুরুষের কটা চোখ আর বাদামী চুল পেয়েছে—তাইতে অ্যাংলো সাজতে আরো সহজ হয়েছে—আমার খুব ছেলেবেলার বন্ধু, ছু'জনে এক সঙ্গে কলকাতায় বহুবছর কাটিয়েছি। আমাদের বাড়ির গাড়িতে

প্রথমে ড্রাইভিং শিখেছিল, তারপর নিজের চেষ্টায় হেভি ভেহিকলএ হাত পাকিয়েছে। বাঁশির গুণে সুন্দরী মেয়েরা ওর দিকে ভিড়ত, যে ফুটফুটে মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল তার নাম রোহিণী—সুন্দর একটা মেয়েও হয়েছিল। কিন্তু খুব বেশি দিন বনিবনা হয় নি—রাগ দেখিয়ে ও মিলিটারিতে বণ্ড সই করে মোটর জিপ ট্রাক ড্রাইভিংএর চাকরি নিয়েছিল। কিন্তু পারবে কেন টিকতে, দু'দুবার পালাতে চেষ্টা করে ধরা পড়েছে। বাঁশির আর চেহারার গুণে ওপরঅলারাও ওকে ভালো বাসত—সামান্য শাস্তির ওপর দিয়ে গেছে। শেষ বারে আটচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদ অপারেশনের সময় সেখান থেকে পালাতে গিয়ে এক মিলিটারি সঙ্গীর হাতে ধরা পড়েছিল। ডিকি তাকে বড় পাথরের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে গুরুতর জখম করে পালিয়েছে। তখনই ওর নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। প্রথম দিনকতক আমার আশ্রয়ে ছিল, তারপর উধাও। দেশে ফেরেনি কারণ, ওর বউই তাহলে ওকে ধরিয়ে দিত। সেই বউ তখন ওর বিরুদ্ধে এক তরফা ডিভোর্স সুট ফাইল করে বসে আছে। এখানে এসে দেখলাম সে ডিকি ডেটন হয়ে বসেছে।

খুব নির্লিপ্ত সুরে এক টানা কথাগুলো বলে গেল সতীশ কাউল। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। কাঁপছি।

আবার তার সেই ঠাণ্ডা গলা কানে এলো।—দেখো ম্যাডাম, আমি কেন যে ওকে আজও ভালবাসি জানি না, এখানে এসে তোমার মতো একজনকে নাম ভাঁড়িয়ে বিয়ে করেছে দেখেও কিছু বলিনি, ভেবেছি যদি সুখে থাকে আর সুখে রাখে তো থাক—কিন্তু এখানে আমাকে দেখার পর থেকেই ওর বিকৃতি শুরু হয়েছে—আর দিনে দিনে তা বেড়েছে। তাই তোমার জন্য আমি চিন্তিত হয়েছি, সব থেকে বেশি ধাক্কা খেয়েছি যখন শুনলাম ও জয়েণ্ট ইন্সিওরেন্স করছে—এর উদ্দেশ্য কি হতে পারে বুঝতে পারছ ?

বুঝতে পেরে আমার ভেতরসুদ্ধু কাঠ।...আমার এমন কোনো মৃত্যু ঘটাবে সকলের চোখে যা স্বাভাবিক ঠেকবে। তাহলে ও চল্লিশ

হাজার টাকা পেয়ে এখান থেকে সরে যাবে।

কাঁধের ওপর আবারও হাতের চাপ। আমার অবস্থা বুঝেই হয়তো। বলল, কাঁপছ কেন, ডোন্ট গেট নারভাস—আমি তো আছি। জয়েন্ট ইন্সিওরেন্সের খবর জেনেই আমি ওকে ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছি··· ও এখন আর তোমাকে কিছুই করতে সাহস পাবে না। সেই জন্যে ওর রাগ আরো বাড়ছে এখন, বুঝেছে যে আমি এরপর তোমাকেও সতর্ক করে দেব।

আমাকে আরো ভরসা দেবার তাগিদেই আমার কাঁধের ওপর তার বাহু বেষ্টন আরো একটু নিবিড় হ'ল—শীলা! এত আপসেট হয়ো না, প্লীজ! আমি বলছি তোমার কোনো ভয় নেই, ঠাণ্ডা মাথায় আজই তুমি ওর সঙ্গে ফয়েসলা করে নাও, যা বলেছি তার একটা কথাও ও অস্বীকার করতে পারবে না, তবে একটু সতর্ক থেকো— হঠাৎ না ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু করে বসে।···তারপর ও আমার কাছে না এসে আর যাবে কোথায়, কথা দিচ্ছি, সাত দিনের মধ্যে আমি ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেব।

কতক্ষণ বাদে আত্মস্থ হয়েছি জানি না। আমার কাঁধ তখনো সতীশের বাহু বেষ্টনে, মাঝে মাঝে চাপ দিচ্ছে আর আশ্বাস দিচ্ছে, ভয় পেও না, অত ঘাবড়াবার কিছু নেই···আমি আছি।

ওর হাত সরালাম। শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়েছে খেয়াল ছিল না। তুলে দিলাম। উঠলাম আস্তে আস্তে। গাড়ির দিকে এগোলাম। সতীশ তাড়াতাড়ি সামনের দরজা খুলে দিল। উঠে বসলাম। গাড়ি ছুটল। সতীশ কাউলের বাঁহাত পিঠের ওপর দিয়ে আবার আমার বাঁ কাঁধে। আমাকে আশ্বস্ত করার জন্যেই একটু কাছে টানতে চাইল।

বললাম, আগে ক্লাব হাউসে গিয়ে বাবাকে ডেকে গাড়িতে তুলে নাও।

সতীশ কাউল একটু ইতঃস্তত করে নিঃশব্দে সেদিকেই চলল।

আমার চোখের সামনে হঠাৎ একটা মেয়ের মুখ কেন ভেসে উঠল

জানি না। নাচিয়ে মেয়ে রাঙ্কীর মুখ।…নাচের আসরে পুলিশ জাল ফেলেছে জেনে অগণিত দর্শক যখন উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত, একমাত্র ডিকিই তখন নিজের ঘরের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ব্যাপার বুঝতে চেষ্টা করছিল। পলাতক আসামী…পুলিশের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলার তাগিদ তার হবে না তো কার হবে?

…মনোহর ডাকুয়া মায়ের কাছে মজার গল্প করেছিল, নাচের দলের ব্যবহারের জন্য খাতির করে চা কোম্পানী যে পুরনো গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিল, বেশি রাতে সেই গাড়ির নাকি সন্ধান মেলেনি। মদ খেয়ে সেই গাড়ির ড্রাইভার ক্লাব হাউসের ঢাকা বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে দেখে গাড়ি নেই। আর পকেটে গাড়ির চাবিও নেই। ক্লাব হাউসের যে বাবুরা ভালবাসে, দুশ্চিন্তায় পড়ে ড্রাইভার তাদের ঘুম থেকে তুলে বিপদের কথা বলেছে। এদের সকলেরই মনে হয়েছে, রাঙ্কী রাতের অন্ধকারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সেই গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে। রাতে এই নিয়ে কেউ আর হৈ-হল্লা করেনি। আংকল ডাকুয়ার মতে এরাও রাতে দেদার মদ গিলেছে। নইলে একটা মেয়ে ঘুমন্ত ড্রাইভারের পকেট থেকে চাবি চুরি করে পালাতে পারে ভাবে কি করে! পরদিন যা হয় করা যাবে ঠিক করে তারা আবার ঘুমোতে গেছে। দুশ্চিন্তায় সেই ড্রাইভারও ফের মদ গিলে ঘুমিয়েছে। কিন্তু পরদিন সকালে অবাক কাণ্ড। ক্লাব-হাউসের পিছনের জমিতে গাড়িটা পড়ে আছে, চাবিও গাড়িতেই লাগানো।

অনেকের ধারণা ড্রাইভারই নেশার ঘোরে চাবি গাড়িতে ফেলে রেখে এসে ঘুমিয়েছে। কিন্তু সব শোনার পর ড্রাইভারকে জেরা করে মনোহর ডাকুয়ার মনে হয়েছে, ক্লাব-হাউসেরই দোতলার কোনো ঘরে কোনো বোর্ডার রাঙ্কীকে লুকিয়ে রেখেছিল—অমন একটা রূপসী নাচিয়ে মেয়েকে সারা রাতের দখলে পেয়ে কেউ এমন অসম সাহসের কাজ করেছে। ফুর্তির পর রাত থাকতে তাকে কোথাও পাচার করে দিয়ে আবার ফিরে এসেছে।

…মা এটাই বিশ্বাস করেছে। আর পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি

বলে আংকল ডাকুয়াকেই বকেছে। কিন্তু সবই জানি বলে আমি মনে মনে হেসেছিলাম।

আজ এক্ষুণি মনে হল, মনোহর ডাকুয়ার সন্দেহই একমাত্র সত্যি। যে পলাতক আসামী মেয়ে-বউ থাকতে এমন নিরীহ মুখে আমার সর্বনাশ করতে পারে, সে না পারে কি ?···ওদের পালানোর জন্য কেউ সে রাতে মোটর-বাইক সাজিয়ে রেখে দেয়নি। ওই গাড়িতে তুলে ডিকিই রাঙ্কীকে অন্যত্র রেখে এসেছে। তার আগে রাঙ্কীকে নিয়ে তার কদর্য ফুর্তিও বাদ যায়নি—যেতে পারে না।

···আশ্চর্য, ডিকি এত ভালো গাড়ি চালায় দেখা মাত্র আংকল ডাকুয়ার ওই গল্প আমার মনে পড়েনি কেন! সন্দেহ হয়নি কেন?

···ডিকি এত ভালো গাড়ি চালায় এ-ও নিজের চোখে দেখে ফেলার আগে পর্যন্ত আমার কাছে গোপন ছিল! গোপন ছিল এই জন্য। আর গোপন ছিল নিজের অতীত গোপন করার জন্য।

ঘৃণায় বিদ্বেষে রাগে আমার সর্ব অঙ্গ রি-রি করছে।

আমাকে আর বাবাকে বাংলোর গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ে সতীশ চলে গেল। যাবার আগে উদ্‌বেগভরা দু'চোখে নিঃশব্দে ও আমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখার আবেদন জানিয়ে গেল।···বাবার পাশে পাশে বাংলোর দিকে এগিয়ে এতক্ষণে আবছা অন্ধকারে ঘড়ি দেখলাম, রাত প্রায় ন'টা। খুব আশা করছি বিলি খেয়ে দেয়ে তার ঘরে শুয়ে পড়েছে। তার ঘরটা অন্ধকার। বারান্দায় আলো জ্বলছে। আমার শোবার ঘরেও।

প্রায় শব্দ না করেই উঠে এলাম। পরদা সরিয়ে দেখলাম, ডিকি চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে উঠে বসল। শ্লেষের সুরে জিগ্যেস করল, আজ এত দেরি যে, 'গেট অফ কনসেন্স' এর ভিত্তি স্থাপন-টাপন হল নাকি?

ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম একটু। এই মুহূর্তে কোথা থেকে রাজ্যের সাহস এলো বুকের তলায় জানি না। মনে হল, ঘাবড়ে গিয়ে বাবাকে ডাকার কোনো দরকার ছিল না। এই লোক ভীরু কাপুরুষ।

সেখান থেকেই ডাকলাম, উঠে এসো।

আমার গলার স্বর শুনেই বোধহয় সচকিত। উঠে এলো। ত্রস্ত দু'চোখ আমার মুখের ওপর। পরদা ছেড়ে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সে-ও। বাবাকে দেখে বিমূঢ়।

বারান্দা থেকে নামার সিঁড়ির কাছটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, ওইখানে দাঁড়াও!

হতচকিত বিস্ময়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি বাবাকে বললাম, তুমি ঘরে গিয়ে বোসো।

বাবাকে আগেই বলে রেখেছিলাম, এখন কিছু জিগ্যেস কোরো না, পরে সব জানবে। বাবা বসাব ঘরে চলে গেল।

আমি ডিকিব দিকে ফিরলাম। মুখ দেখে মনে হল কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে। কারণ এই মুখ এখন কাগজের মতো সাদা। ভিতরে আমার অস্বাভাবিক মনের জোর এখন। কিন্তু মেয়েরা মেয়েই। সেই পুরনো অপরাধের জের টেনেই প্রথম চাবুক হানলাম। ওর চোখে মুখে ঠাণ্ডা আগুন ছড়িয়ে বললাম, রাত দুপুরে রাঙ্কীকে তুমি কি-ভাবে ক্লাব হাউস থেকে পাচার করে দিয়েছিলে—মোটর বাইকের পিছনে বসিয়ে না ঘুমন্ত মাতাল ড্রাইভারের পকেট থেকে চাবি চুরি করে কোম্পানির গাড়িতে?

এ-প্রসঙ্গ কল্পনারও অতীত বোধহয়, তাই আকাশ থেকে পড়া মুখ। গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরুলো, রাঙ্কীকে···!

—হ্যাঁ, রাঙ্কীকে···মণিপুরের সেই নাচিয়ে দলের মেয়ে রাঙ্কী—চিনতে পারছ না? পুলিশের হাত থেকে একটা স্মাগলার মেয়েকে বাঁচানোর পুরস্কারও মনে পড়ছে না? তুমি শুধু প্রেমের মহিমায় মুগ্ধ হয়েই এমন দুঃসাহসের কাজ করেছ—তার কাছ থেকে আর কিছুই পাওনি, কিছুই আদায় করোনি—কেমন?

আমার দু'চোখের ঘৃণার ঝাপটায় ডিকি কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দের মতো চেয়ে রইল। তারপর বলল, গাড়ির চাবি চুরি করে ওকে রেখে আসার কথা না বলার কারণ আছে···কিন্তু এসব তুমি কি বলছ!

আমার অপলক চোখে সাদা আগুন। গলা দিয়ে একটি একটি করে শব্দ বেরুলো।—তুমি ডিকি ডেটন?

বিষম চমকে উঠল। ঠোঁট দুটো একবার নড়ল শুধু। কথা বেরুলো না।

—ডেভিড কৃপাল ডাট···আর্মির একজনকে জখম করে পালানোর জন্য ট্রাক ড্রাইভারে নামে এখনো ওয়ারেণ্ট ঝুলছে—সে তাহলে কে?

সাদাটে মুখে এবারে রক্ত উঠে আসতে লাগল। কোটরের চোখ দুটো জীবন্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু জবাব নেই।

—তুমি কি না?

—হ্যাঁ আমি···। সতীশ কাউল তাহলে বলতে কিছু বাকি রাখেনি?

—শাট্ আপ্! যা জিগ্যেস করছি জবাব দাও।—রোহিণী তোমার বউ···একটা মেয়েও আছে—কেমন?

ঠোঁট দুটো কাঁপছে, অসহায় ক্রোধে নীলচে চোখ দুটো জ্বলছে। —হ্যাঁ···কিন্তু···

বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বাধা দিলাম, কোনো কিন্তু শুনতে চাই না, আমি শুধু জানতে চাই!···জয়েণ্ট ইন্সিওরেন্সের চল্লিশ হাজার টাকা অনেক টাকা? শুধু তাই নয়, আমার অবর্তমানে এই বাড়িও তোমার হত। আর তা বিক্রি করলেও কম টাকা নয়—আমার মৃত্যুর প্ল্যান রেডি হবার আগেই সতীশ কাউল সব ভেস্তে দিল—কেমন?

উত্তেজনায় কাঁপছে এবার, চাউনিটা খাঁচায় পোরা জানোয়ারের মতো। মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, এ সব তুমি কি বলছ···সতীশ তোমাকে···

—স্টপ্! স্কাউনড্রেল—গেট আউট! তোমার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেব সেটা কাল ভাবব—এই মুহূর্তে তুমি আমার চোখের সম্মুখ থেকে দূর হও—বেরিয়ে যাও!

—কিন্তু—কিন্তু আমার কথা—

—আই সে গেট আউট্! পুলিশ ডাকার আগে তুমি বাড়ি থেকে

বেরোও—তোমার যা আছে সতীশ এসে নিয়ে যাবে—প্রাণে বাঁচতে চাও তো আর এ-মুখো হবে না। যাও—যাও বলছি।

যে ভাবে ধেয়ে গেলাম, দাঁড়িয়ে থাকলে ওকে ধাক্কা মেরেই সিঁড়ি দিয়ে উল্টে ফেলে দিতাম বোধ হয়। ও নিজেই নেমে গেল। তারপর দ্রুত অন্ধকারে মিশে গেল।

পরদিন। অবসন্নের মতো বসে আছি। রাত এক মিনিটের জন্যেও ঘুম হয়নি। আমার পৃথিবী ভেঙেছে। সংসার গুঁড়িয়ে গেছে। এ প্রবঞ্চনা আমার কত দিনে সহ্য হবে? সকাল থেকে সতীশের আশায় বসে আছি। স্কুলে যাইনি। বিলিকেও যেতে দিইনি।...কে জানে, কাপুরুষ শয়তানের প্রতিশোধ পুরুষোচিত হয় না। ছেলেটাকে একলা ছাড়া নিরাপদ ভাবিনি। বাবা রিটায়ারড লোক, সে-ও বাড়িতেই আছে।

সতীশ এলো না। আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি। আবার অবাকও লাগছে। সকালেই আসবে বলেছিল কি না মনে করতে চেষ্টা করছি। বলুক না বলুক তাকেই আমার এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি দরকার। ডিকির ভয়ে নয়। কাল ওর মুখোমুখি দাঁড়ানোর পরেই ভয় ডর গেছে।

বাবা দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর একটু বেরিয়েছিল। ফিরল সেই ভয়ংকর খবরটা নিয়ে।

সতীশ কাউল সকালে তার গাড়িতে কার্শিয়ং গেছল। গাড়ি চালাচ্ছিল ডিকি ডেটন। ওদিকটায় বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। গাড়ির চাকা স্কিড্ করে হোক বা চালানোর দোষে হোক, রাস্তা থেকে গভীর খাদে পড়েছে। সতীশ কাউলের সমস্ত শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তক্ষুণি মারা গেছে। আর ডিকি ডেটন যে-কোন ভাবে দরজা থেকে ছিটকে পড়ার দরুণ গাছের আর ঝোপ ঝাড়ে ঠেকে ঠেকে শেষে নিচে পড়েছে। তারও অনেক হাড়গোড় ভেঙেছে—মুমূর্ষু দশা। বাঁচবে কিনা ঠিক নেই।

আমি নির্বাক স্তব্ধ।

…বাবা কি বলছে? আমি কি শুনছি? সতীশ কাউল আর নেই? জলজ্যান্ত তাজা মানুষটা একেবারে নেই আর? ডিকি মুমূর্ষু…?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম। বাংলো থেকে ছুটে বেরুতে ইচ্ছে করল। কি করব? সকলকে ডেকে ডেকে বলব, এটা অ্যাকসিডেণ্ট নয়, ইচ্ছে করে কেউ অঘটন ঘটিয়েছে, নিজে আত্মঘাতী হয়েও সতীশকে হত্যা করতে চেয়েছে—ওই মুমূর্ষু লোকটাকে চিকিৎসা করে যে করে হোক বাঁচাও, তারপর বিচার করে তাকে ফাঁসিতে ঝোলাও!

নিঃসীম স্তব্ধতার মধ্যে একে একে পাঁচটা দিন কেটে গেল। দুর্ঘটনার পরদিনই খবর পেয়েছিলাম হাসপাতাল থেকে সতীশ কাউলের দেহ তার স্ত্রী শালজুড়িতে নিয়ে এসেছে। আনুষ্ঠানিক কাজও সেদিনই হয়ে গেছে। আমি বাংলো থেকে নড়তে পারিনি। সৌজন্যের খাতিরেও মলি কাউলের সঙ্গে একবার দেখা করে শোক জানাতে পারি নি।

দুঃসময় বা অঘটন বুঝি সার বেঁধেই আসে। ওই অঘটনের পাঁচ দিন বাদে আবার চমকে ওঠার মতোই দুঃসংবাদ। গ্র্যাণ্ডির ওখান থেকে লোক মুখে খবর এলো, মেলিণ্ডা জারভিস বাথরুমে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছল। এখনো জ্ঞান হয়নি। চা-বাগানের ডাক্তার দেখে বলে গেছে, সেরিব্রাল অ্যাটাক—তাই কোনো হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া যাবে না।

ছুটলাম। ওই মহিলার ওপর আমার অনেক অভিমান পুঞ্জীভূত হয়েছিল। ডিকিকে পাওয়ার পর তার অনেকটাই হালকা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার সামনে আগের মতো স্বাভাবিক এখনো হতে পারিনি। কিন্তু এমন খবর কি কোনো শত্রুও শুনতে চায়? ডিকির দুঃসংবাদ শোনার পর নিজে অসুস্থ ছিল বলে আসতে পারেনি, কিন্তু প্রায়ই লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছে, ডিকি কেমন আছে। কেমন আছে নিজেও জানি না। কিন্তু আমি যা চাই তাই বলে দিয়েছি।

বলেছি, ভালো আছে। ও ভালো হয়ে ফাঁসি যাক এই আমি চাই।

স্কুলের সব টিচাররাই গ্র্যাণ্ডির স্টুডিওতে। সকলেই বিমর্ষ। রোগীর ঘরে কারো যাবার হুকুম নেই শুনলাম। তাছাড়া জ্ঞান ফেরেনি। সকলের অলক্ষ্যে গ্র্যাণ্ডি আমাকে দোতালায় যেতে ইশারা করল। বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পা দুটো কাঁপছে।

ঘরে দু'জন নার্স বসে! মেলিণ্ডা জারভিসের দিকে চেয়ে আমার চক্ষু স্থির। অজ্ঞান অবস্থায়ও যন্ত্রণায় শরীরের একদিক বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে, অন্য দিক অসাড়। নাকে নল গোঁজা, হাত দুটো খাটের সঙ্গে বাঁধা।

থাকতে না পেরে চলে এলাম।

বিকেলে মীনা মাসির মুখে শুনলাম সেই দিনই দু'পাঁচ মিনিটের জন্য একটু জ্ঞান ফিরেছিল। গ্র্যাণ্ডিকে কিছু বলতেও চেষ্টা করেছিল। পারেনি। গ্র্যাণ্ডি কিছু বুঝেছে কিনা কেউ জানে না।

এর পর টানা দশ দিন যমে মানুষে যুদ্ধ। শিলিগুড়ি থেকে বড় ডাক্তার আনা হয়েছিল। কিন্তু মেলিণ্ডা জারভিস সকল চেষ্টার বাইরে।

এগারো দিনের দিন চোখ বুজল।

পরদিন তাকে সমাধিস্থ করার সময় উপস্থিত ছিলাম। বিলিকেও নিয়ে গেছলাম।

সকলের চোখে জল। কেবল আমার আর গ্র্যাণ্ডির ছাড়া। আমি কাঁদতে পারি না কেন? আর গ্র্যাণ্ডির ঠোঁটের ফাঁকে তো হাসিই দেখলাম। কিন্তু সেটা কি হাসিই?

পরদিন আর স্কুলে যেতে ভালো লাগল না। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ গ্র্যাণ্ডির স্টুডিওতে গেলাম। চুপ চাপ বসে আছে। চোখ তুলে তাকালো। ডাকল, আয়, ডিকি কেমন আছে?

আমি বলে উঠলাম, চুলোয় যাক ডিকি, তুমি কেমন আছ?

ঈষৎ বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বলল, মীনা ডাকুয়া বলছিল, ডিকির অত বড় অ্যাকসিডেন্টের পরেও তুই

তাকে শিলিগুড়ি হাসপাতালে দেখতে যাস নি···কেন?

—দেখতে যাওয়ার দরকার ফুরিয়েছে বলে।

গ্র্যাণ্ডির দু'চোখ আমার মুখের ওপর। হাতের পেন্সিলটা কিছু আঁকি-বুকি করছে। চাউনি যেন রুক্ষ হয়ে উঠতে লাগল।—আমার লোকচরিত্র চিনতে খুব একটা ভুল হয় না, ডিকি মাঝে হঠাৎ কি-রকম হয়ে গেছল তোর বাবার মুখে শুনেছি···কিন্তু আমার ধারণা সে লোক খারাপ নয়—যাসনি কেন?

আমিও তেমনি ঝাঁঝালো জবাবই দিলাম, তোমার ধারণা একেবারে বদলাবে, এখন এ-সব কথা ছাড়া।

আবার একটু চেয়ে থেকে গ্র্যাণ্ডি ঠাণ্ডা গলায় বলল, ওপরে একবার মেলিণ্ডার ঘর থেকে ঘুরে আয়।

গ্র্যাণ্ডির মুখে 'দ্য বিগ লেডি' ছেড়ে মেলিণ্ডা নামটা কি এই প্রথম শুনলাম! জিগ্যেস করলাম, কেন?

—একবার ঘুরে আয় না। আবার আটকে যাস না, তোর সঙ্গে নিরিবিলিতে আমার কিছু দরকারি কথা আছে।

যে-ভাবে বলল উঠতে হল। ভাবলাম, মেলিণ্ডা জারভিসের সব স্মৃতি যাতে চোখে ভাসে এ-জন্যেই কি এই হুকুম! নিরিবিলিতে আমার সঙ্গে কি কথা থাকতে পারে? মেলিণ্ডা কি আমার সম্পর্কে কিছু বলে গেছে?

দোতলায় এলাম। ওপরেও স্টুডিওর মতোই বিশাল ঘর মেলিণ্ডা জারভিসের।

ঘরে পা দিতেই আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক ঝলক বিদ্যুত খেলে গেল। কোণের দিকের ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বসে আছে রয় জারভিস। আমার মনের এই অবস্থায় আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে সে কি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি!

—রয়!

সে-ও চমকে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—শেইলা!

স্থান-কাল ভুলে আমি-দু'হাত বাড়িয়ে তার দিকে ছুটে গেলাম।

ফলে দু'হাত বাড়িয়ে সে-ও একটু এগিয়ে এসে আমাকে বুকে জাপটে ধরল।

—রয়…রয়…রয়। আমি কি বিশ্বাস করব তুমি সত্যি এসেছ।

—ডারলিং…মাই ডারলিং।

আমাকে জড়িয়ে ধরে রয় তেমনি আবেগে একের পর এক চুমু খেতে লাগল। তারপর হঠাৎই আত্মস্থ আমি। আমার মনের অবস্থা রয় জানে না, সব-দিক খুইয়ে বসার ফলে তাকে দেখা মাত্র আমি যেন একটা আশ্রয়ের জায়গা পেয়েছি ভেবে আবেগে ভেসে গেছলাম, কিন্তু পরস্ত্রী জেনেও রয় আমাকে এভাবে টেনে নিল কি করে? এত চুমু খাচ্ছে কি করে! শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে আমি আর একটু গা ছেড়ে দিলে ও এক্ষুনি আমাকে ওই মেলিণ্ডা জারভিসের বিছানায় টেনে নিয়ে যেতে পারে।

আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। ওর চোখে তাকালাম। …ও কি ভেবেছে আমি আজও ওর জন্য অপেক্ষা করছি? আমি অবিবাহিত? না, তা হতে পারে না। মেলিণ্ডা জারভিস নিশ্চয় চিঠিতে সবই জানিয়েছে।

রয় আবারও হাত বাড়িয়ে কাছে এলো। আমি একটা হাত তুলে বাধা দিলাম। জিগ্যেস করলাম, রয়, তুমি কি কোনো খবর পেয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ, গ্র্যাণ্ডির টেলিগ্রাম পেয়ে। তবু আসতে দুটো দিন দেরি হয়ে গেল…দেখতে পাব না ভাবিনি…।

আমি চেয়ে আছি। দেখছি। কেন ওকে আমার সেই আগের রয়ের মতো লাগছে না ভেবে পাচ্ছি না। যে-কথা বলার সময় নয় তাই জিগ্যেস করলাম।—রয়…আমাদের দু'জনের দু'জনকে পাওয়ার রাস্তা এখনো খোলা আছে?

তক্ষুনি জবাব দিল, আমার দিক থেকে কোনো বাধা নেই, আমি কোনো বাধা মানারও লোক নই—তুমি আমার।

তক্ষুনি মনে পড়ল, গ্র্যাণ্ডি বলেছিল নিরিবিলিতে আমার সঙ্গে

তার দরকারি কথা আছে, দেরি করতে বারণ করেছিল। এমন কথা গ্র্যাণ্ডির মুখ থেকে কখনো শুনিনি। আমার মনে হল তার দরকারি কথাটা রয়কে নিয়েই। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।···মেলিণ্ডা জারভিস কি গ্র্যাণ্ডিকে বিশেষ করে কিছু বলে গেছে!

মনে মনে সতর্ক হলাম। হাসতে চেষ্টা করলাম।—রয়···আমার ছ'-বছরের ছেলে আছে।

—তাহলে সে শুদ্ধু আমার।

—আর এখন পর্যন্ত স্বামীও আছে···।

রয় এগিয়ে এলো। দু'কাঁধে হাত রাখল। তুমি তাকে ডিভোর্স করবে, নিশ্চয় করবে—তোমার চোখ বলছে মুখ বলছে তুমি তাকে নিয়ে সুখী নও—আমি তোমাকে দেখা মাত্র বুঝেছি তুমি আমার!

আবারও চুমু খেল। নিজেকে ছাড়িয়ে আমি আস্তে আস্তে সরে এলাম। বললাম, রয়, এখন এ-সব কথার সময় নয়, যেদিকে তাকাচ্ছি এখনো তোমার আন্টিকে দেখতে পাচ্ছি। দুটো দিন যাক, এক্ষুনি নিচে যাব, গ্র্যাণ্ডির সঙ্গে কথা আছে—

—চলো।

—না, তুমি না রয়। তুমি এখানে থাকো। আমার সঙ্গেই তার দরকারি কথা আছে, আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

—তাহলে তোমার সঙ্গে আমার আবার কখন দেখা হচ্ছে?

আমি ঠাট্টার সুরে বললাম, তোমার দিক থেকে চৌদ্দ বছর কেটেছে, আমার দিক থেকে চৌদ্দর অর্ধেক সাত ঘণ্টার মধ্যেই হবে বোধহয়।

বলেই নিচে নেমে এলাম। রয় সিঁড়ির কাছে এসে বলল, তাহলে বিকেলে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

আমি ততক্ষণে গ্র্যাণ্ডির ঘরে। গ্র্যাণ্ডি হাতের পেন্সিলটায় অন্য হাতের চেটোয় দাগ কাটছে। আমি ঢুকতে বলল, দরজা দুটো বন্ধ করে দে-

আমি হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইলাম, এমন কথা কখনো শুনিনি।

কিন্তু গ্র্যাণ্ডি যেন কোনো ভাবনায় তলিয়ে আছে। দরজা দুটো বন্ধ করে কাছে এলাম। অন্য চেয়ারটা তার খুব কাছে টেনে গ্র্যাণ্ডি বলল, বোস্—

বসলাম। আমার বুকের তলায় ঢিপ ঢিপ করছে কেন জানি না।

—কি বলল ?

—কে রয় ?...কি আর বলবে, আর দুটো দিন আগে আসতে পারল না বলে দুঃখ করল...।

একটু চুপ করে থেকে গ্র্যাণ্ডি বলল, দুটো দিন আগে ইচ্ছে করেই আসেনি, মেলিণ্ডার বিষয় সম্পত্তি পাবার জন্য ঠিক সময় ধরেই এসেছে...।

আমার বুকের মধ্যে ঘা পড়ল।—এ কি বলছ গ্র্যাণ্ডি!

—ঠিকই বলছি। কিন্তু সে গুড়ে বালি, উইল করে মেলিণ্ডা তার সব-কিছু আমাকে দিয়ে গেছে—আমার অবর্তমানে তোকে।

আমি বলে উঠলাম, আমি চাই না।

—তোর চাওয়া-না চাওয়া আলাদা ব্যাপার, আমি মেলিণ্ডার উইলের কথা বলছি।...শোন, সতীশ কাউল নেই, তোর আইডিয়াল ভিলেজ আর হবে না...সে থাকলেও হত কিনা সন্দেহ, তাকে আমার খুব সহজ লোক বা অতটাই বদান্য বলে মনে হয়নি...। সে-যাক, নিজে তুই 'গেট অফ কনসেন্স'এ ঢুকে বসে আছিস এ আমিও জানি, মেলিণ্ডাও জানত। তাই সময়ে সব বলার জন্য বেঁচে থাকতে সে আমাকে বার বার অনুরোধ করেছে, মরবার আগেও তার চোখে সেই অনুরোধ ছিল, আর দুর্বল মুহূর্তে রয় জারভিসকে একবার চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিল। তাই ওকে আসার জন্য আমি এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম।...সময়ে পেয়েও ইচ্ছে করেই দেরিতে এসেছে।

আমি উৎকর্ণ।

গ্র্যাণ্ডি অস্বাভাবিক ধীর স্থির। ঘোলাটে চোখ দুটো শুধু বেদনায় ভরা। আস্তে আস্তে বলল, রয় মেলিণ্ডার ভাইপো নয়, ছেলে—মেলিণ্ডা আর আমার ছেলে।

— গ্র্যা-অ্যা-ণ্ডি !

— হ্যাঁ। তার জন্য আমি বা মেলিণ্ডা এতটুকু লজ্জিত নই। মিশনারি কাজে এসে আমার বিয়ে করা সম্ভব নয় জেনেও মেলিণ্ডা সন্তান চেয়েছিল, সে আমাকে ভালবাসতো।···চার মাসের সময় বিলেত চলে গেছে। ছেলের তিন বছর বয়েস হতে ভাইপো পরিচয় দিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে। আবার যখন বাইশ বছর বয়সে রয়কে জোর করে বিলেতে পাঠিয়েছে ততো দিনে মেলিণ্ডার বড় ভাইও মারা গেছে। তাই জানাজানির কোনো ভয় ছিল না।

আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছি। গ্র্যাণ্ডি বলে গেল, এই ছেলের জন্য মেলিণ্ডার সব সুখ শান্তি নষ্ট হয়েছে। তার বড় আশা ছিল ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে, তার থেকে বেশি ভালো তোকে কোনো সত্যি-কারের মা-ও বাসেনি।···কিন্তু ছেলের নষ্ট চরিত্র টের পেয়ে তার বুকে শেল বিঁধল।

আমার বুক দুরু দুরু। গ্র্যাণ্ডি কি এবার চৌদ্দ বছর আগের সেই এক ঝড়ের রাতের কথা বলবে আর সব দোষ রয়ের কাঁধে চাপাবে !

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গ্র্যাণ্ডি আস্তে আস্তে বলে গেল, মেলিণ্ডার আগেই সন্দেহ হয়েছিল, হঠাৎ এক দুপুরে বাড়ি ফিরে রয়ের ঘরে তাকে আর সেই মেয়েটাকে হাতে-নাতে ধরল···রয় কলকাতায় পড়তে যাওয়ার দিন কয়েক আগে·· তুই তখন ছুটিতে এখানে এই শালজুড়িতে।

আমার মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে এলো, তাহলে কোন মেয়েটার সঙ্গে হাতে নাতে ধরল ? 'তাহলে' শব্দটা বলে ফেলে ভিতরে ভিতরে নিজেই আমি ভয়ানক বিব্রত।

কিন্তু গ্র্যাণ্ডি খেয়াল করল না। জবাব দিল, মেলিণ্ডার আয়ার মেয়ে·· রুখ্মিণী-না কি নাম। ব্যাপারটা অনেক দিনই চলছিল, মেলিণ্ডার জেরায় মেয়েটা স্বীকারও করেছে···রয় চলে যাবার পরে মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বাও হয়েছিল, তার সব দায় আর খরচাপত্র মেলিণ্ডাকেই বইতে হয়েছে। রাগে আগুন হয়ে কলকাতার বদলে রয়কে

বিলেতে পাঠাবার পরেও মেলিণ্ডার মায়ের মন আশা করেছে যদি স্বভাব-চরিত্র ফেরে, যদি মানুষ হয়ে বড় হয়ে ফেরে তাহলেও একদিন তোকে ঘরে আনতে পারবে।···কিন্তু বছরের পর বছর সেখান থেকে খারাপ খবরই এসেছে। বড় ডিগ্রি আর নিতেই পারেনি, একটা হাসপাতালের চাকরিতে ঢুকেছে। প্রথমবার একটা নার্সকে বিয়ে করেছিল, তুটো ছেলেপুলে হবার পর তাদের ডিভোর্স হয়। রয় অন্য হাসপাতালের আর একটা নার্সকে বিয়ে করেছে। এখানেও তুটো ছেলে মেয়ে হয়েছে, এই নার্সও ওর চরিত্রের অভিযোগ এনে ক্ষতিপূরণ সুদ্ধ ডিভোর্সের মামলা করেছে। ওখানকার মিশনের এক পুরনো বন্ধুর কাছ থেকে আমরা রয়ের প্রতি মাসের খবর জানার ব্যবস্থা করেছিলাম।

আসার আগে খুব ঠাণ্ডা মুখে গ্র্যাণ্ডিকে বলে এসেছি, রয়কে বলে দিও আমি সব জেনেছি—এর পর সে যেন আমার আর খোঁজ না করে।

ক্ষোভের গলায় গ্র্যাণ্ডি জবাব দিয়েছে, বলব—নিশ্চয় বলব! আমি কারো পরোয়া করি নাকি!

বেরিয়ে এলাম। মাথাটা ভয়নক টলছে। পায়ের নিচে মাটি তুলছে। সর্বাঙ্গে একটা ক্লেদাক্ত স্পর্শ ছেঁকে ধরে আছে। বাড়ি গিয়ে আগে চান করতে হবে। আমার চারদিকে মেলিণ্ডা জারভিসের মুখ। হাসছে। সেই হাসিতে ব্যথা ঝরছে। যেন ফিসফিস গলা শুনতে পাচ্ছি, আমি কি অন্যায় করেছি রে?···আমি কি তোকে ইচ্ছে করে কষ্ট দিতে পারি?

···মা জারভিস! আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি আছ কোথাও? আগে তুমি আমাকে কেন কিচ্ছু জানালে না মা জারভিস—এখন আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ক্ষমা চাইলেও তুমি কি শুনতে পাবে?

একটা করে দিন যায় আর একটা দিন আসে। আমার পৃথিবী

ভেঙে গেছে। আশার সব মুকুল ঝরে গেছে। এই জীবনে আর কোনো প্রতীক্ষার সান্ত্বনাটুকুও নেই। আমার ভিতরের জ্বালায় সমস্ত শালজুড়ি ঝলসে যাবে।

...ছ'দিন আগে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি পেলাম। উল্টে পাল্টে দেখলাম শিলিগুড়ি থেকে আসছে। প্রেরক ডিকি ডেটন। মুহূর্তে রক্তে আগুন লাগল। সই করে নিলাম। না, যা ইচ্ছে করছিল তা করলাম না। ওটা নিয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করলাম না। অনবধানে এমন কিছু লিখে থাকতে পারে এতে যা ওকে আরো দ্রুত ফাঁসির দড়ির দিকে এগিয়ে দেবে।

খুললাম। পড়তে বসলাম।

—শীলা, একটাই অনুরোধ, চিঠিটা পড়ার আগে ছিঁড়ে ফেলো না, শুধু একটি বার প'ড়ো। আর দয়া ভিক্ষা করব না, এ-বিশ্বাস যাতে করো তাই আমার বিরুদ্ধে সব থেকে বড় অস্ত্রটা আগে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। সতীশ কাউলকে আমি হত্যা করতে চেয়েছি, হত্যা করেছি। সেই সঙ্গে নিজেও আত্মহত্যা করতে চেয়েছি। কিন্তু ঈশ্বরের মারে আমি বেঁচে গেলাম। আর ছ'তিন দিনের মধ্যে এরা আমাকে ছেড়ে দেবে। তার আগে তুমি এ চিঠি পুলিশের হাতে তুলে দিলেই তারা ব্যবস্থা নেবে।

...শীলা, ফাঁসির আসামীও নিজের ছুটো কথা বলার সুযোগ পায়। তুমি ঘৃণায় আমাকে সে-সুযোগও দাওনি। এবারে এটুকু শুধু দাও।

আমি ছ'বার আর্মি থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম আর শেষে এক সঙ্গীকে জখম করে পালিয়েছিলাম সতীশ কাউলের জন্য। দূরে বসে কলকতার লোকের মুখে খবর পাচ্ছিলাম সতীশ আমার সুন্দরী স্ত্রী রোহিনীর কান বিষিয়ে তুলেছে, তাকে ডিভোর্স সুট ফাইল করার প্ররোচনা দিচ্ছে। তখন বুঝেছিলাম, কেন সে আমাকে লোভের জাল বিছিয়ে আর্মির ট্রাক ড্রাইভারের কাজে ঢুকিয়েছিল। শেষে রোহিনী ডিভোর্স সুট ফাইল করেছে শুনে মরিয়া হয়ে পালিয়েছিলাম।

কারণ আমার খাওয়া ঘুম ঘুচে গেছল। আমার ফুটফুটে মেয়েটাকে আমি ভুলতে পারছিলাম না।

…কিন্তু আমার দেরি হয়ে গেছল ততদিনে ঝিয়ে ছিঁড়ে গেছে। রোহিনীকে সতীশ নষ্ট করেছে। তারপর তার মোহ কাটতে এক অনুগ্রহভাজনের হাতে ওকে সঁপে দিয়েছে। রোহিনী তার ভুল বুঝেছে। কিন্তু অনেক দেরিতে। যদি কখনো এই হতভাগার কথা যাচাই করতে চাও, নিচে রোহিনীর কলকাতার ঠিকানা দিলাম। যাচাই করে নিও।

…বুঝেছিলাম, কলকাতায় থাকলে সতীশই আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। তাই আবার পালালাম। এই শালজুড়িতে এসে তোমাকে দেখলাম। তোমাকে পেলাম। আমি পাগল হতে বসেছিলাম। তুমি আমাকে প্রাণ দিলে। বিশ্বাস করো, এই শালজুড়িতে এসে তোমাকে দেখার পর অন্য কোনো মেয়ের দিকে আমি তাকাইনি… রাঙ্কীকে নিয়ে অমন কুৎসিত সন্দেহ তোমার মাথায় কি করে এলো জানি না। হয়তো তুমি বিশ্বাস হারিয়েছ বলেই।…যাক, আমার অদৃষ্ট যাবে কোথায়। এখানেও সতীশ কাউল—আমার সেই রাহু এসে হাজির হল। আমি তক্ষুনি জানি আমার সুখের দিন ফুরালো। তখন থেকেই তুমি আমার বিকৃতি লক্ষ্য করেছ। তোমাকে নিয়ে আর বিলিকে নিয়ে আমি ওর কাছ থেকে অনেক-অনেক দূরে পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে পালাতে চেয়েছিলাম। তা-ও সম্ভব হয়নি। পাগলের মতো আমি কলকাতায় চলে এলাম। প্রথমে মনে ছিল আমি আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করব—পরে সব তোমাকে খোলাখুলি জানাবো। কিন্তু আমি কাপুরুষ, সংকল্প করেও তা পারলাম না। নিজের সঙ্গে অনেক যুঝেও পারলাম না, কারণ, তুমি আর বিলি। তোমাদের ছেড়ে আমি বাঁচব না বুঝেই ফিরে এলাম। আসার আগে রোহিনীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সে বলেছিল, যদি দরকার হয় তো শালজুড়িতে এসে তোমাকে আমার কথা বলবে, সতীশের মুখোশ খুলে দেবে।

ফিরে এসেই বুঝলাম আমার ভরাডুবি কেউ ঠেকাতে পারবে না। তোমরা 'গেট অফ কনসেন্স' আর 'আইডিয়াল কটেজ'এর স্বর্গ রচনায় মেতেছ। এ-স্বর্গ থেকে সে তোমাকে কোন্ নরকে নিয়ে যাবে। এবার আমি প্রতিশোধের প্ল্যান আঁটলাম, কারণ, দেড় মাস না যেতে সতীশ আমাকে মুক্তির শর্ত জানিয়ে দিয়েছে—বলেছে, শালজুড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আমি ওকে নিয়ে চির প্রস্থানের জন্য তৈরি হলাম। বিলির ভবিষ্যৎ ভেবে ইন্সিওর করলাম। জয়েণ্ট ইন্সিওরেন্স করার কারণ, একার নামে থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই নিজের জীবনে ছেদ টেনে দিলে সেটা সন্দেহের কারণ হতে পারে। দু'জনের নামে থাকলে কেউ সন্দেহ করবে না। মনে আছে বোধহয়, ইন্সিওরেন্স করব এই দরখাস্ত তোমার নামে ছিল এবং অ্যাপ্লিকেশনে তুমিই সই করেছিলে।

যাক, আর আমার কিছু বলার নেই। তুমি ভালো থেকো। বিলিকে ভালো রেখো। কেবল একটুই দুঃখ থেকে গেল। কেউ এসে হাত ধরে টেনে তুলবে, আমার জীবনে বেহাগ'-এর এই শর্ত মিলল না।—ডিকি ডেটন।

…এ কি হল! চোখে ঝাপসা দেখছি কেন? বুকের তলায় এত বড় কান্নার সমুদ্রটা কোথায়? জীবনের এমন মরুভূমির মাঝখানে বসেও যা দেখছি সে-কি মরীচিকা? কোথায় ঈশ্বর, আমাকে সত্য দেখাও, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোয় নিয়ে যাও!

চমকে উঠলাম। গ্র্যাণ্ডির গলা যেন স্পষ্ট শুনলাম। বলছে, আমার লোকচরিত্র চিনতে খুব একটা ভুল হয় না…আমার ধারণা ডিকি লোক খারাপ নয়…

আবার আবার আবার গ্র্যাণ্ডিরই গলা। বলছে, সতীশ কাউল নেই, তোর আইডিয়াল ভিলেজ আর হবে না…সে থাকলেও হত কিনা সন্দেহ, তাকে আমার খুব সহজ লোক বা অতটাই বদান্য বলে মনে হয়নি…

হঠাৎ কিছু মনে পড়ল। একটা স্পর্শ। গেট অফ কনসেন্সের ভিত-এর জায়গায় আমার গা ঘেঁষে বসে আছে সতীশ কাউল। সাহস আর সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এক হাতে আমার পিঠ বেষ্টন করে আছে, কাঁধে চাপ দিচ্ছে, বার বার কানের কাছে মুখ এনে বলছে, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, আমি তো আছি।...বুকে জড়ানো শাড়ির আঁচলটা খসে কখন কোলের ওপর পড়ে গেছল...ওটা আপনি পড়েছিল না মনের অবস্থা বুঝে ওটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

সমস্ত দিন ভেবেছি। রাতে মন স্থির।...তারপর ভিতরে সে-কি পুলকের ঢেউ, আনন্দের উত্তেজনা! আমার পৃথিবীতে আবার এত আলো, এত বাতাস, এত রঙ!...'গেট অফ কনসেন্স' আমি কোথায় খুঁজছি, আইডিয়াল কটেজই বা আর কোথায়? এখানেই—এখানেই তো সব। আমার ওই ছোট্ট গেটটাই তো 'গেট অফ কনসেন্স' আর এই বাংলোটাই তো সেই আইডিয়াল কটেজ! এখানে আমি আর বিলি আর ডিকি—ডিকি ডিকি ডিকি!

এটাই সত্য। এই সত্যের সঙ্গে আর কোনো আপোস নেই—কোনো আপোস নেই।

এর মধ্যে ওই হতভাগা ছেলেটা কি করে বসল। খাতা থেকে টিচারের নোট ছিঁড়ে ফেলে দিল। ক্লাসের বন্ধুর বাঁশি চুরি করল, আর মিথ্যে কথা বলে যীশুর নাম করে দিব্বি কাটল।

...আর তক্ষুনি ওর মধ্যে সেই ভয়ংকর কীটটাকে দেখলাম—এই 'গেট অফ কনসেন্স'এ এই আইডিয়াল কটেজে যার আর কোনো ঠাঁই নেই, ঠাঁই হতে পারে না। বিলিকে নয়, বেত মেরে মেরে আমি ওই কীটটাকেই ধ্বংস করতে চাইলাম।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।...ওই বিলি আসছে। এত দূর থেকে কি ছোট্ট আর কি অসহায়ই না দেখাচ্ছে ওকে। আমি কি ছুটে যাব? ওকে বুকে করে নিয়ে আসব?

প্রায় ছুটে বারান্দার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়েই আছি।

বিলি এলো। ওইটুকু গেটের নিচে ওর মাথা। আংটা খুলে গেট ঠেলে ভিতরে এলো। আমার মনে হল ওর লালচে কচি হাতে এখান থেকেও বেতের ফুলো দাগ দেখতে পাচ্ছি।

বিলি আসছে। কিন্তু পা যেন আর চলছে না। কোনরকমে ছোট্ট শরীরটাকে টেনে নিয়ে আসছে। সমস্ত মুখ লাল। ভয়ে ভয়ে আকুতি ভরা চোখ নিয়ে আমাকে এক একবার দেখছে। আমি ছুটে গিয়ে ওকে বুকে তুলে নিয়ে আসব এখনো ?

সিঁড়ি দিয়ে উঠল। ভয়ে কাঠ হয়ে আমার পাশ কাটাতে চেষ্টা করল।

—শোনো ! নিজের কঠিন গলা শুনে নিজেই চমকে উঠলাম।

বিলি সভয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

—…বাঁশি ফেরত দিয়েছ ?

মাথা নাড়ল। দিয়েছে।

—তাকে বলেছ তুমি চোর—তুমি চুরি করেছ—তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছ ?

ভয়ে কাঠ। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—যাও, বইয়ের ব্যাগ রেখে আগে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে এসো—তারপর খেতে পাবে।

…চলে যাচ্ছে।

—আর শোনো !

ফিরল।

—আজ থেকে তুমি আমার কাছে আর আসবে না, আমার সঙ্গে কথা বলবে না—তোমার যা কিছু দরকার রঙিলা আন্টিকে বলবে। কাল আমি তোমার বাবাকে আনতে শিলিগুড়ি যাচ্ছি—তুমি আমার সঙ্গে যাবে না, যাবার কথা বলবে না—আমার কাছে চোর আর মিথ্যেবাদীর জায়গা নেই ! যেদিন নিজে বুঝবে কত বড় অন্যায় করেছ, যে দিন এই দুঃখে খুব কান্না পাবে—সেদিন আমার কাছে আসবে। যাও—!

কোনো রকমে বিলি আমার চোখের আড়ালে সরে গেল।

…আমি না, আমার ভিতরের সেই একজন, যে 'গেট অফ কনসেন্স' রচনা করেছে, যে এই আইডিয়াল কটেজ গড়েছে, যার সঙ্গে আর কোনো কিছুর আপোস নেই—সে এই কাজ করল, সব সে বলল। আমি না।

আমি বিলির মা শীলা ডেটন নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে।